প্রথম প্রকাশ :
জানুয়ারী ১৯৯৩

প্রচ্ছদ :
প্রবীর সেন

মুদ্রক ও প্রকাশক :
অরুণকুমার দে
র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন
৪৩ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৯

উৎসর্গ

আমার মা-কে

বিষয় সূচী

সম্পাদকীয় ৯

পরিচালক সত্যজিৎ

সত্যজিৎ রায়ের ছোট ছবি : নবীনানন্দ সেন ১৯
সত্যজিৎ রায় : একজন সমাজ-সচেতন শিল্পী : বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত ২৮
রবীন্দ্র-সত্যজিতের যুগলবন্দী : পল্লব সেনগুপ্ত ৩৪
সত্যজিৎ রায় : ফিল্ম-টেক্সট ও একজন পাঠক
: পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৫
চিত্রনাট্য রচনায় সত্যজিৎ : অনিল চট্টোপাধ্যায় ৫৫
অভিনয়-শিক্ষাদানে সত্যজিৎ রায় : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ৬২
'ঘরে-বাইরে' : উপন্যাস ও চলচ্চিত্র : বিজিত ঘোষ ৬৮

সংগীত-ভাবনায় সত্যজিৎ

সত্যজিৎ রায়ের আবহসংগীত : গৌতম ঘোষ ৮৯
সত্যজিতের রবীন্দ্রসংগীত-ভাবনা : সুভাষ চৌধুরী ৯৬
রেকর্ড-সংগ্রাহক সত্যজিৎ রায় : কিশোর চট্টোপাধ্যায় ১০৫

চলচ্চিত্র-ভাবনায় সত্যজিৎ

সত্যজিতের চলচ্চিত্রচিন্তা : তিনখানি বই/আলোচনা
: দেবীপদ ভট্টাচার্য ১১৩

লেখক সত্যজিৎ

এ, বি, সি, ডি : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৫
তারিণী খুড়োর কীর্তিকলাপ : এক ভক্ত পাঠকের চোখে
: উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ১৩৭
বড়োদের গল্প না কি একালের গল্প : অলোক রায় ১৪৫

প্রাপ্তবয়স্কের জন্য লেখা দু'টি গল্প : ধ্রুব গুপ্ত   ১৫৩
বাস্তবে মুক্তি, অবাস্তবের বাস্তবতা : সত্যজিতের গল্প : ক্ষেত্র গুপ্ত   ১৫৯
সত্যজিৎ রায়ের গল্পের গদ্য : বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়   ১৭০
লাল খাতা, বহুরূপী কালি, ডেঁয়ো পিঁপড়ে এবং ইত্যাদি
: মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়   ১৭৮
সত্যজিৎ : ভূতের গল্প : গল্পের ভূত : মানস মজুমদার   ১৮৭

অঙ্কন-শিল্পে সত্যজিৎ

প্রচ্ছদশিল্পী সত্যজিৎ রায় : সন্দীপ সরকার   ১৯৫
মুদ্রণ সাধনায় সত্যজিৎ রায় : দীপঙ্কর সেন   ২০৪
অলঙ্করণে সত্যজিৎ : সুধীর মৈত্র   ২১০
গ্রন্থ-চিত্রক সত্যজিৎ রায় : বাদল বসু   ২১৯

সম্পাদক সত্যজিৎ

সন্দেশ সম্পাদক সত্যজিৎ রায় : নলিনী দাশ   ২২৭

অনুবাদক সত্যজিৎ

অনুবাদ-সাহিত্য : সত্যজিৎ রায় : স্বরাজ সেনগুপ্ত   ২৩৯

সত্যজিৎ রায় : তথ্যপঞ্জি   ২৪৯

লেখক-পরিচিতি   ২৬৯

সম্পাদকীয়

সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে সম্পাদকীয় লিখতে বসে কেবলই মনে হচ্ছে, কি লিখবো ? সূর্যকে দেখানোর জন্য দেশলাই বা মোমবাতি জ্বালানো যেমন হাস্যকর, আজ 'সম্পাদকীয়'-তে সত্যজিৎ সম্পর্কে দু'-চার কথা লেখাও তেমনই বাহুল্য-মাত্র।

বরং গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলিতে সত্যজিৎ-প্রতিভার বিভিন্ন দিককে লেখকগণ কিভাবে ধরতে চেয়েছেন, সে-সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে কিছু কথা বলার মাধ্যমেই সত্যজিতের প্রতি আমরা আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে পারি।

আজ আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সত্যজিৎ চলচ্চিত্র-পরিচালক হিসেবে বিশ্ববরেণ্য। এই শিল্প-মাধ্যমটিতে তাঁর সিদ্ধি গগনচুম্বী। কিন্তু চলচ্চিত্র-নির্মাণ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভার অনন্যতা বিস্ময়কর। কথাসাহিত্য-রচনায়, সঙ্গীত-সৃষ্টিতে, অঙ্কনে ও অলংকরণে, সম্পাদনায়, অনুবাদে, চলচ্চিত্র-সম্পর্কিত গ্রন্থ-রচনায়, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর প্রতিভার দ্যুতি পরিস্ফুট। সত্যজিৎ-প্রতিভার এই সামগ্রিক দিকের প্রতিই আলোকপাত করা হয়েছে গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলিতে। চেষ্টা করা হয়েছে তাঁর যাবতীয় সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষ, অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করার।

ব্যক্তি ও স্রষ্টা সত্যজিৎকে সমগ্রভাবে দেখার জন্য, তাঁর বহুমুখী প্রতিভার যথাযথ মূল্যায়নের চেষ্টায় আমরা প্রথমেই গ্রন্থটিকে কয়েকটি পরিচ্ছেদে ভাগ করে নিয়েছি : (১) পরিচালক সত্যজিৎ, (২) সঙ্গীত-ভাবনায় সত্যজিৎ, (৩) চলচ্চিত্র-ভাবনায় সত্যজিৎ, (৪) লেখক সত্যজিৎ, (৫) অঙ্কন-শিল্পী সত্যজিৎ, (৬) সম্পাদক সত্যজিৎ এবং (৭) অনুবাদক সত্যজিৎ।

২

"পরিচালক সত্যজিৎ" পরিচ্ছেদে সত্যজিতের কয়েকটি 'ছোট ছবি'-র আলোচনা করেছেন নবীনানন্দ সেন। সত্যজিৎ সর্বমোট আটটি 'ছোট ছবি' করেছেন। তার মধ্যে তথ্যচিত্র পাঁচটি,—'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' (১৯৬১ ; ৫৪ মিনিট), 'সিকিম' (১৯৭১), 'দি ইনার আই' (১৯৭২ ; ২০ মিনিট), 'বালা' (১৯৭৬ ; ৩৩ মিনিট) এবং 'সুকুমার রায়' (১৯৮৭ ; ৩০ মিনিট)। আর স্বল্পদৈর্ঘ্যের কাহিনী-চিত্র তিনটি,—'টু' (১৯৬৪), 'পিকু' (১৯৮০) ও 'সদগতি' (১৯৮১)। বলাবাহুল্য

এগুলি নামেই 'ছোট ছবি', কিন্তু বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তিতে ও সামাজিক অভিঘাতের নিরিখে এগুলির আভ্যন্তরিক গভীরতা বিস্ময়কর।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত সত্যজিৎকে একজন সমাজ-সচেতন শিল্পী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন; সত্যজিতের 'পথের পাঁচালি', 'অপরাজিত', 'অপুর সংসার', 'জলসাঘর', 'দেবী', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'সীমাবদ্ধ', 'জনঅরণ্য', 'মহানগর', 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী', 'সদগতি' প্রভৃতি বিশিষ্ট চলচ্চিত্রগুলিকে অবলম্বন করে।

রবীন্দ্রনাথের চারটি গল্প ও একটি উপন্যাস অবলম্বনে সত্যজিৎ তিনটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোট গল্প ('পোস্টমাস্টার'—১২৯৮, 'সমাপ্তি'—১৩০০, 'মণিহারা'—১৩০৫) অবলম্বনে সত্যজিৎ করেন 'তিনকন্যা' (১৯৬১)। রবীন্দ্রনাথের বড়ো গল্প 'নষ্টনীড়' (১৩০৮) অবলম্বনে 'চারুলতা', (১৯৬৪) নির্মিত হয়। এবং সবশেষে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাস অবলম্বনে তৈরী হয় সত্যজিতের 'ঘরে বাইরে' (১৯৮৪) ছবিটি।

মূল কাহিনীর গ্রহণ-বর্জন-সংযোজনের মধ্য দিয়ে সত্যজিৎ রবীন্দ্রনাথকে স্বীকরণ করেই, রবীন্দ্র-কাহিনীতে দিয়েছেন ভিন্ন মাত্রা। এ নিয়ে একটি মূল্যবান আলোচনা করেছেন পল্লব সেনগুপ্ত, 'রবীন্দ্র সত্যজিতের যুগলবন্দী' প্রবন্ধে।

আজকের 'রিয়্যাল-রীডার' যে ইতিহাসে সম্পৃক্ত তার মধ্যে কোন্ বিশেষ বার্তা বহন করে আনে সত্যজিতের ছবি? সত্যজিতের 'ফিল্ম-টেক্সট' নিয়ে এক নতুন ধরণের বিশ্লেষণী আলোচনা করেছেন পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর 'সত্যজিৎ রায় : ফিল্ম-টেক্সট ও একজন পাঠক' প্রবন্ধে।

১৯৫৭ সালে 'ভারতকোষ' গ্রন্থে চিত্রনাট্য সম্পর্কে সত্যজিৎ লিখেছিলেন, '...যে লিখিত নকশাটি অনুসরণ করিয়া একটি চলচ্চিত্র রচিত হয়, তাহাকে চিত্রনাট্য বলে। চিত্রনাট্য চলচ্চিত্রের ভিত্তিস্বরূপ; সুতরাং চিত্রনাট্যের পরিকল্পনা হইতেই চিত্রনির্মাণ কার্যের শুরু।...চিত্রনাট্য চলচ্চিত্রের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে।' অনিল চট্টোপাধ্যায় সত্যজিৎ-চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য বিষয়ে খুঁটিনাটি আলোচনা করেছেন : 'চিত্রনাট্য রচনায় সত্যজিৎ'।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে জানিয়েছেন, সত্যজিৎ তাঁর কুশীলবদের দিয়ে শ্রেষ্ঠতম অভিনয়টা কিভাবে বার করে আনতেন।

বিজিত ঘোষ সত্যজিতের বিতর্কিত ছবি 'ঘরে বাইরে' নিয়ে অনুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন, একজন সাহিত্য-পাঠকের দৃষ্টিতে। তাঁর প্রবন্ধ 'ঘরে-বাইরে : উপন্যাস ও চলচ্চিত্র'।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ "সংগীত-ভাবনায় সত্যজিৎ"। এ-প্রসঙ্গে সত্যজিৎ নিজেই বলেছেন : 'সত্যি কথা বলতে কী বড় দরের ক্ল্যাসিক্যাল শিল্পীরা কেউই ফিল্মের কম্পোজার নন।...এঁরা বাজনদার হিসেবে একেবারে প্রথম শ্রেণীর এবং অত্যন্ত

উঁচুদরের, কিন্তু ফিল্ম কম্পোজার হিশেবে এঁরা কেউই খুব একটা ওয়াকিবহাল বলে মনে হয়নি, তখনই সংগীত রচনার দায়িত্বটা নিজে নিলাম।' সত্যজিতের আবহসংগীতের বিশিষ্টতা, পরবর্তী প্রজন্মের চলচ্চিত্রকার ও আবহসংগীত রচয়িতাদের সত্যজিতের কাছ থেকে কি কি শিক্ষণীয়, এ-বিষয়ে ব্যাকরণসম্মত এক তথ্যসমৃদ্ধ রচনা গৌতম ঘোষের 'সত্যজিৎ রায়ের আবহসংগীত'।

রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে সত্যজিৎ নানা অসতর্ক মন্তব্য করেছেন বিভিন্ন সময়ে। এর কারণ সম্ভবতঃ সত্যজিৎ রবীন্দ্রসংগীতের সামগ্রিক-চর্চার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি। এ নিয়ে তথ্যনির্ভর, যুক্তিধর্মী আলোচনা করেছেন সুভাষ চৌধুরী 'সত্যজিতের রবীন্দ্রসংগীত-ভাবনা' প্রবন্ধে।

কিশোর চট্টোপাধ্যায় সত্যজিৎ বিষয়ে এযাবৎকাল অনালোচিত একটি বিষয় নিয়ে লিখেছেন : 'রেকর্ড-সংগ্রাহক সত্যজিৎ রায়'। পাশ্চাত্য সংগীতের ক্যাসেট সংগ্রহ করা ও শোনা সত্যজিতের দীর্ঘদিনের শখ। তিনি নিজেই বলেছেন : 'বাখ, আর বিটোফেন, সাইবেলিয়াস আর মোৎসার্ট ছাড়া আমি-মানুষটার অস্তিত্বের কি অর্থ থাকতে পারে ?'

গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদ "চলচ্চিত্র-ভাবনায় সত্যজিৎ"। 'Our Films Their Films' গ্রন্থের প্রস্তাবনায় সত্যজিৎ লিখেছেন : 'ফিল্মকরিয়েরা ফিল্ম বিষয়ে বড় একটা লেখে না। হয় তারা যে ফিল্মটি তৈরি করছে তাই নিয়ে বড় ব্যস্ত থাকে, অথবা কোনো ফিল্ম করার সুযোগ না পাওয়ায় অসুখী থাকে অথবা ঠিক আগের ছবিটার কাজের ক্লান্তিতে ডুবে থাকে।' বলা বাহুল্য সত্যজিৎ এ-জাতীয় 'ফিল্মকরিয়ে' আদৌ নন। এই তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেবীপদ ভট্টাচার্য সত্যজিতের চলচ্চিত্র-চিন্তা নিয়ে লেখা তিনখানি বইয়ের ('বিষয় চলচ্চিত্র'-১৯৭৬, 'Our Films Their-Films'-১৯৭৬ ও 'একেই বলে শুটিং'-১৯৭৯) অনুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ "লেখক সত্যজিৎ"। চল্লিশ বছর বয়সে কলম ধরেই সত্যজিৎ রায় আসর মাত করলেন। সত্যজিতের গল্পসাহিত্য সম্বন্ধে অনুপুঙ্খ আলোচনা ১৯৮৩-র ডিসেম্বর সংখ্যা 'মহানগর'-এ (সমরেশ বসু সম্পাদিত) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ই সর্বপ্রথম করেন। বাংলা গোয়েন্দা-গল্পের ধারায় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর আর এক উজ্জ্বল, ঝকঝকে, বুদ্ধিদীপ্ত কাহিনী উপহার দিলেন সত্যজিৎ রায়। সত্যজিতের গোয়েন্দা-গল্প 'ফেলুদা' বিষয়ে লিখেছেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'এ, বি, সি, ডি'।

ফেলুদার গোয়েন্দা কাহিনী ও প্রোফেসর শঙ্কুর কল্পবিজ্ঞান ছাড়াও ভিন্ন স্বাদের কিছু মজাদার গল্প পাওয়া যায় সত্যজিতের 'তারিণী খুড়োর কীর্তিকলাপ' গল্প-সংকলনে। এই গল্পগুলির অধিকাংশই অলৌকিক-রসের। সত্যজিতের এই তারিণী

খুড়ো বিষয়ক গল্পগুলিকে অবলম্বন করেই উজ্জ্বলকুমার মজুমদার লিখেছেন, 'তারিণী খুড়োর কীর্তিকলাপ : এক ভক্ত পাঠকের চোখে'।

সত্যজিৎ নিজেই 'পিকুর ডায়রি', 'পিকু' (চিত্রনাট্য), 'আর্যশেখরের জন্ম ও মৃত্যু', 'ময়ূরকণ্ঠী জেলি, সবুজ মানুষ', 'শাখাপ্রশাখা' (চিত্রনাট্য)—এই রচনা-গুলিকে 'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' অভিধা দিয়েছেন। সত্যজিতের 'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' লেখা এই রচনাগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন অলোক রায় ও ধ্রুব গুপ্ত যথাক্রমে 'বড়দের গল্প না কি একালের গল্প' ও 'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য লেখা দু'টি গল্প' প্রবন্ধদ্বয়ে।

গোয়েন্দা-কাহিনী (ফেলুদা), কল্পবিজ্ঞান (প্রোফেসর শঙ্কু), অলৌকিক গল্প (তারিণী খুড়ো), 'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' গল্পগুলির বাইরেও সত্যজিতের পাঁচটি গল্প-গ্রন্থে ('এক ডজন গপ্পো'-১৯৭০, 'আরো এক ডজন'-১৯৭৬, 'আরো বারো'-১৯৮১, এবারো বারো'-১৯৮৪, 'একের পিঠে দুই'-১৯৮৮) আরো ৬০-টি উল্লেখযোগ্য গল্প পাওয়া যায়। সেগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন ক্ষেত্র গুপ্ত, 'বাস্তবে মুক্তি, অবাস্তবের বাস্তবতা : সত্যজিতের গল্প' প্রবন্ধে।

লেখক-সত্যজিতের গল্প-উপন্যাসের কাহিনীতে এক বিশেষ চমৎকারিত্ব তো থাকেই। এর পাশাপাশি থাকে আর একটি বড় দিক ; তা হ'ল তাঁর বিশিষ্ট গদ্যনির্মাণ। দীর্ঘ, জটিল, ক্লান্তিকর, ফেনায়িত, নিরর্থক বাক্য-ধারার পরিবর্তে, ছোট ছোট সরলবাক্য সত্যজিতের গদ্যশৈলীতে এক বিশেষ গতিবেগ ও নাটকীয়তা সৃষ্টি করে। তরল আবেগের পরিবর্তে তাঁর গদ্যে পাই বুদ্ধির উজ্জ্বল্য। ভাষাও মেদহীন। তীক্ষ্ণ স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। যা যে কোনো বয়সের পাঠককে করে আকৃষ্ট। সত্যজিৎ রায়ের গদ্য ভাষার অনন্যতা বিষয়ে অনুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় : 'সত্যজিৎ রায়ের গল্পের গদ্য'।

১৯৬১-তে, চল্লিশ বছর বয়সে সত্যজিৎ প্রথম বাংলা গল্প লেখেন। সায়েন্স ফিকশন। প্রোফেসর শঙ্কুর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী : 'ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি'। 'সন্দেশ'-এ। সত্যজিৎ রায়ের কল্পবিজ্ঞান-আশ্রয়ী 'প্রোফেসর শঙ্কু'-র উপর এক বিশ্লেষণী আলোচনা করেছেন মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'লাল খাতা, বহুরূপী কালি, ডেঁয়ো পিঁপড়ে এবং ইত্যাদি'-তে।

সত্যজিতের 'ডজন' (১২)-গল্প সিরিজে আছে মোট ৬০-টি গল্প। তারিণী খুড়ো বিষয়ক গল্পের বাইরে এখানেও আছে বেশ কিছু ভূতের গল্প। সেগুলি নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন মানস মজুমদার, তাঁর 'সত্যজিৎ রায় : ভূতের গল্প : গল্পের ভূত' প্রবন্ধে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ "অঙ্কন-শিল্পে সত্যজিৎ"। সত্যজিৎ প্রথম কাজ শুরু করেছিলেন আঁকাআঁকি দিয়ে। বইয়ের প্রচ্ছদে, অঙ্গচিত্রণে তিনি বার বার নানা অভিনবত্বের

প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি 'রে রোমান' ও 'রে বিজার' টাইপের নকশা করেছেন ইংরাজি ভাষায়। এছাড়া বাংলা টাইপোগ্রাফি বা অক্ষর-বিন্যাসকে যুগোপযোগী করে তোলাও তাঁর এক অনন্যসাধারণ কীর্তি। তারই হাতে প্রথম বাংলা ছবির পোস্টার বদলালো। বদলালো বাংলা ছবির টাইটেল। গুরুত্ব পেল ছবির নামের 'লোগো'। বদলালো সিনেমার হোর্ডিং-ও। 'পথের পাঁচালি'-র পোস্টার থেকেই বাংলা সিনেমা-পোস্টারের ধারাটাকেই তিনি আমূল বদলে দিলেন। পোস্টার, হোর্ডিং, ছবির টাইটেল, ছবির লোগো—সবকিছুতেই এলো এক ঝকঝকে অনন্যতা। 'সন্দেশ', 'এক্ষণ'-এর প্রচ্ছদ, নিজের ও অন্যের অসংখ্য গ্রন্থের প্রচ্ছদ, নিজের ও অন্যের লেখায় অলংকরণ, সিনেমার পোস্টার, চিত্রনাট্যের খসড়া, মুদ্রণ-ব্যাপারে; এককথায় অঙ্কন-শিল্পে তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ-সব বিষয় নিয়ে লিখেছেন সন্দীপ সরকার, দীপঙ্কর সেন, সুধীর মৈত্র ও বাদল বসু; যথাক্রমে 'প্রচ্ছদশিল্পী সত্যজিৎ রায়', 'মুদ্রণ সাধনায় সত্যজিৎ রায়', 'অলঙ্করণে সত্যজিৎ রায়' এবং 'গ্রন্থ-চিত্রক সত্যজিৎ রায়' নামের প্রবন্ধ চারটিতে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ "সম্পাদক সত্যজিৎ"। ১৯৬১ সাল। উপেন্দ্রকিশোর-সুকুমারের 'সন্দেশ' আবার চালু করলেন সত্যজিৎ। তিনিই সম্পাদক। সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদক সুভাষ মুখোপাধ্যায়। 'সন্দেশ' পত্রিকার বিশিষ্ট স্থান ছোটদের বাংলা সাময়িক পত্রিকা জগতে আজ সুচিহ্নিত। এই 'সন্দেশ' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন স্বয়ং সত্যজিৎ রায়। এ-প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন নলিনী দাশ, তাঁর 'সন্দেশ সম্পাদক সত্যজিৎ রায়' প্রবন্ধে।

সপ্তম ও শেষ পরিচ্ছেদ "অনুবাদক সত্যজিৎ"। 'Nonsense Rhymes' (১৯৭০), 'মোল্লা নাসীরুদ্দীনের গল্প' (১৯৮৫), 'তোতায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম' (১৯৮৬) এবং 'ব্রেজিলের কালো বাঘ ও অন্যান্য' (১৯৮৭)—সর্বমোট এই চারটি গ্রন্থ অনুবাদ করেন সত্যজিৎ রায়। এ-গুলিকে নিয়ে এক সামগ্রিক আলোচনা করেছেন স্বরাজ সেনগুপ্ত: 'অনুবাদ-সাহিত্য : সত্যজিৎ রায়'।

৩

দীর্ঘকালব্যাপী কী অপরিসীম পরিশ্রমের বিনিময়ে এমন একটি সংকলন তুলে আনা সম্ভব হয়, তা কেবলমাত্র এই জাতীয় কাজ যাঁরা করেছেন বা করে থাকেন, সেই ভুক্তভোগীরাই টের পাবেন। কাজটা সম্পূর্ণ করতে অনেক সময় লেগে গেল। আসলে এ-জাতীয় কাজে এটাই অনিবার্য ভবিতব্য। এক-একজন লেখক থাকেন এক-এক প্রান্তে। এঁদের সঙ্গে শুধুমাত্র যোগাযোগ করতেই দীর্ঘসময় লেগে গেছে।

তারপর তাঁদের বাড়ীতেএকাধিকবার গিয়ে, চিঠি দিয়ে, ফোন করে ক্রমাগতই তাঁদের জ্বালাতন করতে হয়েছে। এই জ্বালাতন সহ্য করে, বিরক্ত না হয়ে অধিকাংশ লেখকই যথেষ্ট ব্যস্ততার মধ্যেও যথাসময়েই তাঁদের মূল্যবান লেখাগুলি দিয়েছেন। এর একমাত্র কারণ, আমার প্রতি এঁদের সস্নেহ প্রশ্রয়, আর নিজেদের মানসিক ঔদার্য।

এই সংকলনের অনেক লেখকই আমার মাস্টারমশাই বা মাস্টারমশাইতুল্য। তাঁদের জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আমার মাস্টার-মশাইদের মধ্যে আমি সবচেয়ে বেশি জ্বালাতন করেছি যাঁকে, তিনি শ্রদ্ধেয় উজ্জ্বল-কুমার মজুমদার। আমার জ্বালায় অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি নিজেই শুধু লেখা দেন নি; সেই সঙ্গে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ধ্রুব গুপ্ত মহাশয় যাতে লেখা দেন, সে-ব্যাপারে প্রাথমিক যোগাযোগটুকুও তিনিই করে দিয়েছেন। আজ নয়, অনেকদিন থেকেই তাঁর কাছে আমার ঋণের অবধি নেই। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

শ্রদ্ধেয় ক্ষেত্র গুপ্ত, অলোক রায়, পল্লব সেনগুপ্ত, বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, মানস মজুমদার মহাশয়, এঁদের সকলেরই স্নেহধন্য ছাত্র আমি। সেই অধিকারে/আবদারেই এঁরা যথেষ্ট ব্যস্ততার মধ্যেও যথাসময়ে আমাকে লেখা দিয়েছেন। এঁদের জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলার বিভাগীয় প্রধান, অধ্যাপক অরুণ ঘোষ নানা মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁকে আমার প্রণাম।

আমার সহকর্মী অধ্যাপক অরূপ সেনের প্রচেষ্টাতেই নবীনানন্দ সেনের মূল্যবান লেখাটি পাওয়া সম্ভব হয়েছে। অরূপদা-র সঙ্গে আমার সম্পর্ক ধন্যবাদ জানানোর প্রাথমিক পর্যায়ে থেমে নেই। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে প্রাথমিক পর্যায়ে আমাকে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়। পার্থদা-র সঙ্গে আমার সম্পর্কও ধন্যবাদের অপেক্ষা রাখে না।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায একজন ব্যস্ততম মানুষ। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে মুখোমুখি বসতেই কয়েক মাস ছোটাছুটি করতে হয়েছে। তবু শেষ পর্যন্ত যে কাজটা হয়েছে, তার মূলে আছেন আমার সহকর্মী অধ্যাপক অশোক পালিত এবং স্বয়ং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতা। এঁদের আমার শ্রদ্ধা জানাই। আমার সহকর্মী, অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য মহাশয় একটি অত্যন্ত পরিশ্রমলব্ধ মূল্যবান লেখা দিয়েছেন। তাঁকে প্রণাম। আমার সহকর্মী, অধ্যাপক নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের ইংরাজি লেখাটি বাংলায় অনুবাদ করে দিয়েছেন। নীলু আমার বন্ধু। আমাকে তাঁর সাহায্য না-করাটাই আশ্চর্যের। একদা সহকর্মী, অধ্যাপক রাধানাথ পাঁইনের চেষ্টাতেই সুধীর মৈত্রের গুরুত্বপূর্ণ লেখাটি পাওয়া

গেছে। রাধানাথ আমার বন্ধু। আপনজন। সে বন্ধুত্বের দায় বহন করেছে। এ তাঁর স্বভাব-ধর্ম।

আমার দুই বিশেষ কৃতী ছাত্রী অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শম্পা বসু (ভট্টাচার্য) ব্যস্ত অভিনেতা অনিল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগের দিনক্ষণ স্থির করে দেওয়াতেই তাঁর সাক্ষাৎকারটি নেওয়া সম্ভব হয়েছে। শম্পা, বিশেষ করে অপর্ণা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করতে চেষ্টা করেছে। মাস্টারমশায়ের জন্য এদের চেষ্টার আন্তরিকতা, ভেতরকার দায়বদ্ধতা, সর্বোপরি ঐকান্তিক নিষ্ঠা আজকের দিনের যে-কোনো শিক্ষকের পক্ষেই এক দুর্লভ প্রাপ্তি নিঃসন্দেহে। দীপঙ্কর সেনের মূল্যবান লেখাটিও পাওয়া গেছে অপর্ণারই বন্ধু দীপঙ্কর কুণ্ডুর চেষ্টাতেই। প্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার কাজে, কিছু বই ও কিছু লেখকের ঠিকানা সংগ্রহের ব্যাপারে আমার ছাত্র-ছাত্রী রুমা সরকার, অজন্তা চক্রবর্তী ও জয় রায়চৌধুরী আমাকে সাহায্য করেছে। এদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্নেহাশির্বাদ।

প্রুফ-সংশোধনের কাজে, প্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় ও কিছু লেখকদের কাছ থেকে লেখা সংগ্রহের ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করেছেন শিখা ঘোষ। তার সঙ্গে আমার ধন্যবাদ জানানোর সম্পর্ক নয়।

প্রকাশক অরুণকুমার দে ও 'র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন'-এর কর্মীভাইদের অক্লান্ত পরিশ্রমেই বইমেলাতে গ্রন্থটি প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল। এ তাঁদের নিজেদেরই কাজ, দায়িত্বও। কাজেই এজন্য পৃথকভাবে কৃতজ্ঞতা জানানোর প্রয়োজন দেখি না। তবে তাঁদের আন্তরিক ব্যবহার কখনো ভোলার নয়।

…এই কাজ যখন শুরু করেছিলাম, আমার জীবনের সবচেয়ে কাছের মানুষটি তখন বেঁচে ছিলেন। এই কাজ যখন শেষ হ'ল, তখন আমার সেই আপনজনটি আর নেই। বইটি উৎসর্গ করলাম তাঁকেই।

বিজিত ঘোষ

শ্রীরামপুর কলেজ, বাংলা বিভাগ
শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২০১
২১ জানুয়ারি, ১৯৯৩, বইমেলা

পরিচালক সত্যজিৎ

নবীনানন্দ সেন

সত্যজিৎ রায়ের ছোট ছবি

আমাদের দেশের চলচ্চিত্রকারদের অনেকেই ডকুমেণ্টারি বা শর্ট ফিল্মে হাতে-খড়ি করে ফিচার ফিল্মের জগতে এসেছেন। বিদেশেও এমন নজির খুব কম নয়। সেদিক থেকে সত্যজিৎ রায় ব্যতিক্রম। ১৯৫৫ সালে পূর্ণ দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'পথের পাঁচালি' দিয়ে আত্মপ্রকাশ। সে ছবিতেই হাতেখড়ি, সে ছবিতেই পরিপূর্ণতা এবং বিশ্বজোড়া খ্যাতি। পরের পাঁচ বছরে আরো পাঁচটা ছবি করেছেন, সবই ফিচার; কখনো বোধ হয় ভাবেনও নি কোন ডকুমেণ্টারি ছবি করার কথা। ফিচার ফিল্মেই নানান বৈচিত্র্যের সন্ধান করেছেন। আমরা পেয়েছি 'পরশ পাথর', 'জলসাঘর', 'দেবী'র মতো বিভিন্ন আদলের ছবি।

১৯৬১ সালে সত্যজিৎ বানালেন তাঁর প্রথম ডকুমেণ্টারি ছবি 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'। কিন্তু তা নিজের গরজে ততটা নয়, যতটা সরকারি তাগিদে। রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে দু'বছর আগেই ভারত সরকার উপযাচক হয়ে এই ছবি তৈরী করার দায়িত্ব দেন তাঁকে। তৈরি হয় এক অসামান্য ছবি। তাঁর চলচ্চিত্র নির্মাণের মোট ছত্রিশ বছরে আঠাশটি ফিচার ফিল্মের পাশাপাশি সত্যজিৎ ডকুমেণ্টারি তৈরি করেছেন সাকুল্যে পাঁচটি, স্বল্পদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র করেছেন তিনটি। প্রায় সবকটিই ফরমায়েশী ছবি।[১]

বলা বাহুল্য, সত্যজিৎ রায় নিজেকে মূলত ডকুমেণ্টারি বা স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবির পরিচালক হিসেবে কখনো ভাবেন নি। আর, এক 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' বাদ দিলে

---

১ ১৯৬১ সালে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' করেছিলেন তদানীন্তন ভারত সরকারের তাগিদে, ফিল্মস্ ডিভিশন-এর প্রযোজনায়। ১৯৭১ এ 'সিকিম' করেছিলেন তদানীন্তন সিকিমের চোগিয়ালের অনুরোধে। ১৯৭২ এ 'দি ইনার আই'-ও ফিল্মস্ ডিভিশন এর প্রস্তাবে ও প্রযোজনায় তৈরি হয়। ১৯৭৬ এ প্রখ্যাত ভরতনাট্যম নর্তকী বালা সরস্বতীকে নিয়ে 'বালা' তৈরি করেন ন্যাশনাল কাউন্সিল অব পারফরমিং আর্টস-এর উপরোধে। আর ১৯৮৭-তে 'সুকুমার রায়' তৈরি করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রস্তাব অনুসারে।
এই ডকুমেণ্টারি ছবিগুলি ছাড়া স্বল্পদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র 'টু' তৈরি করেন ১৯৬৪ সালে ইউ এস. পাবলিক টেলিভিশন সার্ভিস্-এর প্রস্তাবে "এসো" (ESSO) ওয়ার্ল্ড থিয়েটার"এর ব্যানারে ছোট ছবির একটি 'ট্রিলজির' দ্বিতীয় পর্ব হিসেবে। ১৯৮০-তে 'পিকু' তৈরি হয় এক ফরাসী টেলিভিশন কোম্পানীর ফরমায়েসে। আর পরের বছর ভারতীয় দূরদর্শনের প্রস্তাব মতো তাদের প্রযোজনায় করেন 'সদগতি'।

তাঁর অন্যান্য ডকুমেণ্টারি ছবিগুলি বিদেশে তো নয়ই, এদেশেও দেখানো হয়েছে কম ; দেখেছেন আরো কম মানুষ। কারণ এদেশে ডকুমেণ্টারি ছবির প্রচার, প্রদর্শন, মদৎদারি আজো নগণ্য, তাই তার জন্য সাধারণের আগ্রহ কম, কদরও কম। এবং সত্যজিৎ রাযের কাহিনীচিত্র নিয়ে যে প্রচুর লেখালিখি হয়েছে দেশে-বিদেশে সে তুলনায় তাঁর ডকুমেণ্টারি বা ছোট ছবির আলোচনা নিতান্তই নগণ্য।

অথচ প্রকৃতপক্ষে এই উপেক্ষিত স্বল্পালোচিত ছবিগুলিও চলচ্চিত্রানুরাগীদের গভীর অভিনিবেশ দাবি করে। কারণ, এগুলিতেও, তাঁর কাহিনী-চিত্রগুলির মতোই, প্রতিভার এবং প্রয়োগের অনণ্য স্বাক্ষর কম-বেশি ছড়িয়ে রয়েছে। এগুলির কোন কোনটিতে বিন্দুতে সিন্ধুদর্শন হয় বললে অত্যুক্তি হবে না। ভারতের তথ্যচিত্র এবং স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এগুলির অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে।

১৯৬১ সালে যখন সত্যজিৎ রায় তাঁর প্রথম ডকুমেণ্টারি ছবি উপহার দিলেন তখন ভারতীয় ডকুমেণ্টারির জগতে নিতান্তই মাঝারিপনা চলছে। ডকুমেণ্টারি বলতে তখন বোঝায় সরকারি 'ফিল্মস্ ডিভিশন'-এর ছবি। আর সেসব ছবি তখন অবধি মূলত সরকারি বিভিন্ন পরিকল্পনার ও কর্মসূচির প্রচারমূলক 'নিউজ রীল', কখনো-সখনো ভারতে কোন আঞ্চলিক সংস্কৃতির তথ্যবহুল ছোট ছোট ছবি ; কিন্তু সেসব ছবির মধ্যে না ছিল কোন তাত্ত্বিক বিশ্লেষণী গভীরতা, না ছিল কোন নান্দনিক ট্রিটমেণ্টের ছাপ।[২]

এই পটভূমিতে সত্যজিতের 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' তাঁর 'পথের পাঁচালি'র মতোই তথ্যচিত্রের জগতে শিল্পসুষমার নতুন দিগন্ত সূচিত করলো এবং সাবালকত্বের ছোঁয়া এনে দিল। এ ছবি অবশ্য বহু প্রদর্শিত এবং মোটামুটি আলোচিত।

এখানে সীমিত পরিসরে আমরা খুবই স্বল্প প্রদর্শিত এবং স্বল্পালোচিত দুটি দু'ধরণের ছবি নিয়ে আলোচনা করব। একটি ডকুমেণ্টারি—'দি ইনার আই' (১৯৭৪), অন্যটি স্বল্পদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র—'পিকু' (১৯৮১) ; শেষেরটি আলোচনা প্রসঙ্গে আরেকটি ছোট্ট কাহিনীচিত্রের অবতারণা করব, সেটি হল 'টু' (১৯৬৪)। অর্থাৎ আড়াইখানা ছবির আলোচনা। এই সবকটি ছবির মধ্যেই একটা সাধারণ থীম—একাকীত্ব। আর প্রত্যেকটিতেই এক অনণ্য "সত্যজিৎ-স্পর্শ" বিশেষভাবে অনুভব করা যায়।

শান্তিনিকেতনে আড়াই বছরের শিক্ষাপর্বে নন্দলাল বোস ছাড়া একমাত্র আরেকজন শিল্পগুরু তরুণ সত্যজিৎকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিলেন ; এই মানুষটি হলেন বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। এঁকে নিয়েই সত্যজিৎ রায়ের তৃতীয়

---

২ বর্ষীয়ান ভারতীয় তথ্যচিত্র নির্মাতা বি. ডি গর্গ এবং এন. ভি. কে. মূর্ত্তি-র লেখাতে এর সমর্থন মিলবে। দ্রষ্টব্য গ্রন্থ ; জগমোহন (সম্পাদিত) "ডকুমেণ্টারি ফিল্মস্ অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান অ্যাওয়েকনিং" পাবলিকেশনস্ ডিভিশন, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া, ১৯৯০।

ডকুমেণ্টারি ছবি 'দি ইনার আই' (ইতিপূর্বে '৭১ সালে করেছিলেন 'সিকিম' নামে একটি ডকুমেণ্টারি ছবি)।

জন্ম থেকেই প্রায়ান্ধ বিনোদবিহারী ওই জীবনী-চিত্র তৈরীর বছর পনের আগেই সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যান। তবু তাঁর শিল্প-সৃষ্টি অব্যাহত থাকে। আমাদের দেশে এ ধরণের জীবনী-চিত্র আজও সাধারণত গুণকীর্ত্তনমূলক বা ভাবালুতা-সর্বস্ব হয়ে ওঠে। সত্যজিৎ বিস্ময়করভাবে ওইসব নিশ্চিত গাড্ডা পরিহার করেছেন। 'দি ইনার আই'তে আগাগোড়া একটা stoic মেজাজ টানটান করে ধরা আছে, যা বিনোদবিহারীর ব্যক্তিজীবনের আচরণ ও আদর্শের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। এ ছবির ট্রিটমেণ্টে সত্যজিতের স্বভাবসিদ্ধ সংযম ও পরিমিতিবোধ বিশেষভাবে লক্ষণীয়—ছবির দৃশ্যপট থেকে শুরু করে সঙ্গীতের ব্যবহার, এমন কি ধারাভাষ্য পর্যন্ত।

সকালবেলার একটি দৃশ্য দিয়ে ছবি শুরু। মিড্ ক্লোজ-আপ-এ ধরা দুটি হাত, মেঝেতে রাখা পরপর অনেক cut outs এর ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে সরে সরে যায়, এই হাই-অ্যাঙ্গল শট্-এর পর ক্যামেরা একটু সরে এলে দেখা যায় ওই দুটি এক শিল্পীর হাত, তাঁর এক-পাশ থেকে নেওয়া ঝুঁকে-পড়া profile দেখতে পাওয়া যায়। ঘুণাক্ষরেও অনুমান হয় না যে এ-শিল্পী সম্পূর্ণ অন্ধ; অবলীলাক্রমে তিনি করে যান এক মিউর্যালের পরিকল্পনা। খানিক পরে শিল্পীর জীবনপঞ্জীর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দিতে গিয়ে ভাবাবেগ-নিয়ন্ত্রিত ধারাভাষ্যে নিছক উল্লেখ থাকে তাঁর অন্ধত্বের বিবর্তনের।

খুব তাৎপর্যপূর্ণভাবে এ ছবিতে 'হাত' ঘুরে ফিরে বার বার আসে মোটিফের মতো। সত্যজিতের সঙ্গে কথোপকথনে বিনোদবিহারী অন্ধত্বের অনুভূতি সম্বন্ধে বলেছিলেন, "...Spaceটা হয়ে যায় একটা ঘন বস্তু—যেটাকে হাত দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে সামনে এগোতে হয়। যে জিনিসটা স্পর্শ করছি সেটা ছাড়া আর কোন কিছুর অস্তিত্বই থাকে না।" Space সম্পর্কে এই 'নতুন চেতনা' সত্যজিৎ তুলে ধরেন একটি ছোট্ট কিন্তু অসামান্য দৃশ্যে। বিনোদবিহারীর শিল্পের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও বিবর্তন দেখাতে দেখাতে একসময় ক্যামেরা কিছুক্ষণ অনুসরণ করে শিল্পীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একটি প্রহর। 'দুপুরটা তাঁর বিশ্রামের সময়। এই সময়টা তিনি তাঁর বৈঠকখানায় বেতের চেয়ারে বসেন। চোখে কালো চশমা, সামনে বেতের টেবিলের উপর তাঁর সিগারেট, দেশলাই ও ছাইদান।' ক্যামেরা ঈষৎ নেমে এলে হঠাৎ আমরা লক্ষ্য করি মেঝেতে দু'পায়ের মাঝে একটি ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের মধ্যে ক্যাৎ করে রাখা ফ্লাস্কে ভরা raw tea। সত্যজিতের সঙ্গে কথোপকথনের ফাঁকে হঠাৎ 'বিনোদ-দা' ঈষৎ অনিশ্চিত হাত নামিয়ে দিয়ে ফ্লাস্ক তুলে আনেন সাবলীলভাবে, তারপর তা খুলে চা ঢেলে নিয়ে চুমুক দেন।

সত্যজিতের ঋজুকণ্ঠের ধারাভাষ্য বিনোদবিহারীর এই ছোট্ট নেশার কথা চকিতে একবার উল্লেখ করে প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। এই এক মুহূর্তের ডিটেল অন্ধত্বে-অভ্যস্ত হয়ে-ওঠা এক নতুন অনুভূতি ছুঁয়ে গিয়ে এক খোশমেজাজের আমেজ সৃষ্টি করে, অন্ধত্বের handicap-কে গৌণ করে দেয়। শেষের দিকে একটি সিকোয়েন্সে 'হাত' ফিরে আসে আরো দৃঢ়তায়। আঁকার টেবিলে কাগজ পেতে দু'হাত বুলিয়ে তার মাপজোক বুঝে নেন বিনোদবিহারী। Flowmaster কলমে ঘচ্‌ঘচ্‌ করে সুদক্ষ smart strokes-এ একের পর এক বলিষ্ঠ স্কেচ্‌—চারপাশে দেখা জীব-জন্তু, নারী-পুরুষ, ফুল ইত্যাদির। সে দৃশ্য অনবদ্য, অনির্বচনীয়। এমনই আরেক অসাধারণ মুহূর্ত আসে যখন সত্যজিৎ বিনোদবিহারীর পূর্ণ অন্ধত্বের কথা ধারাভাষ্যে প্রথম উল্লেখ করেন এবং পর্দায় তা তুলে ধরেন শিল্পীর কালো চশমার একটি কাঁচকে zoom out করে গোটা ফিল্ম ফ্রেমটা কালো করে দিয়ে এবং একমুহূর্ত তা 'ফ্রীজ' করে রেখে।

ছবিতে অন্ধত্বের প্রসঙ্গকে করুণা, সহানুভূতি বা ভাবাবেগে আপ্লুত না করে বিনোদবিহারীর সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে তাকে এক নতুনতর উপলব্ধির স্তরে নিয়ে গিয়ে সত্যজিৎ ছবির সমাপ্তি করেছেন। শেষ শটে দেখা যায় বিনোদবিহারীর মুখের একটা সামনাসামনি ক্লোজ-আপ, 'ফ্রীজ' করে দিয়ে তাঁরই একটা উদ্ধৃতি পর্দার একপাশে ভেসে ওঠে: 'Blindness is a new Feeling, a new experience, a new state of being', নেপথ্যে তখন নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতারে রিন্‌রিন্‌ করে বেজে উঠেছে প্রভাতী আশার রাগিনী 'আশাবরী'। আর ছবি ততক্ষণে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে একটা Sublime দার্শনিক গভীরতায়।

এরই মধ্যে কিন্তু ভারতীয় চিত্র-শিল্পে বিনোদবিহারীর স্থান, তাঁর চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য সমস্ত বর্ণিত হয়েছে, আর ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তাঁর এককত্ব তথা একাকীত্বের একটা ইম্প্রেশন—'খোয়াই'-এর সলিটারি একটা তালগাছের মতন।[৩] হয়তো বা সেজন্যেই বিনোদবিহারীর শিল্পীজীবনের সময়কাল ও বিবর্তন ধরতে গিয়ে এক নন্দলাল বোস ছাড়া আর কারুর নামোল্লেখও করেন নি সত্যজিৎ; যদিও সে-সময় রামকিঙ্কর, সোমনাথ হোড় প্রমুখ শিল্পীরা তাঁদের সৃজনশীলতার তুঙ্গে বিরাজ করছেন এবং সে সময় শান্তিনিকেতনে শিল্পীদের একটা পরিবারসুলভ পরিমণ্ডল ছিল, যদিও বিভিন্নজনের ছিল বিভিন্ন 'স্টাইল' (প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, সত্যজিতের অন্য জীবনী-চিত্রগুলিতেও মূলচরিত্রকে প্রায় এককভাবে, বড়জোর তার পরিবারের পটভূমিতে তুলে ধরা হয়েছে, সমসাময়িক শিল্পীদের

---

৩ দ্রষ্টব্য সত্যজিৎ রায়ের 'বিষয় চলচ্চিত্র' (আনন্দ প্রকাশন, ১৯৮২)-তে অন্তর্ভুক্ত নিবন্ধ 'বিনোদদা'; শেষ অনুচ্ছেদে সত্যজিতের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বিনোদবিহারী বলছেন, "...খোয়াই বাদ দিও না। খোয়াই আর তাতে একটি সলিটারি তালগাছ। ব্যস। আমার স্পিরিট, আমার জীবনের মূল ব্যাপারটা যদি কোথাও পেতে হয়, ওতেই পাবে। বলতে পার—ওটাই আমি।"

milieu-তে বা সামাজিক পরিমণ্ডলে তাকে দেখানো হয় নি। এটা সত্যজিতের individualist-আদর্শেরও প্রতিফলন হতে পারে)।

একাকীত্ব আরো অনেক স্পষ্ট ক'রে সংবেদনশীলতায় সত্যজিৎ ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর 'পিকু' চলচ্চিত্রে। ছাব্বিশ মিনিটের ছোট্ট ছবি 'পিকু' (১৯৮১)। মূলকাহিনী সত্যজিৎ রায়ের নিজেরই—কয়েক বছর আগে লেখা শারদীয় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত দু-তিন পাতার একটা খুদে লেখা। অবশ্য 'চিত্রনাট্যের সঙ্গে মূলের যত না মিল তার চেয়ে বেমিল বেশি', সেকথা সত্যজিৎ রায় নিজেই বলেছেন। তাই সরাসরি ফিল্মের আলোচনায় আসা যাক্।

স্কুলে-পড়া একটি ছোট্ট ছেলের জগৎ: তাদের বিরাট দালান, বাগান, তার বাবা, মা, দাদু, চাকর-বাকর আর জনৈক হিতেশ 'কাকু' (যে আসলে তার মার প্রণয়ী) এবং চারপাশের এই বড়দের জগতের বিবিধ সম্পর্ক। অথচ এই পরিমণ্ডলে পিকু 'একলা', নিঃসঙ্গ (তার অন্তরঙ্গ বলতে একমাত্র তার দাদু, হার্টের রুগী, থাকেন বারান্দার যে-প্রান্তে পিকুদের ঘর সেদিকে নয়, 'অপর প্রান্তে')। বড়দের জগতের নানারকম জটিলতার পটভূমিতে পিকুর একাকীত্ব—এই নিয়েই ছবি।

ছোট ছোট শট্, ছোট ছোট সংলাপের মধ্য দিয়ে এবং দৃশ্যপট (বা mis-en-scene)-এর খুঁটিনাটি এবং সংলাপের nuances-এর মাধ্যমে একটু একটু করে সত্যজিৎ ফুটিয়ে তোলেন পিকুর জগৎ। পিকুর একাকীত্বের কথা কখনোই কেউ স্পষ্ট করে উচ্চারণ করেন না, কিন্তু আভাসে-ইঙ্গিতে, অনুভূতিতে তা নিশ্চিতভাবে প্রতীয়মান হয়।

যেমন, প্রথম দৃশ্যেই পিকুর মা-বাবার শোবার ঘরে পিকুর বিভিন্ন বয়সের চারটে ফ্রেমে বাঁধানো ছবির ওপর দিয়ে ক্যামেরা এগিয়ে গিয়ে পঞ্চম ফ্রেমে এক নারী-পুরুষের যুগল ছবির ওপর গিয়ে থামে; নিঃশব্দে বুঝিয়ে দেওয়া হয় এটা একটা 'নিউক্লিয়াস ফ্যামিলি'—স্বামী-স্ত্রী ও তাদের একমাত্র সন্তানের পরিবার (অবশ্য আরেকটু পরে আমরা জানতে পারি এই পরিবারের আরেক সদস্য পিকুর দাদুর কথা, কিন্তু তিনি কার্যত নন্-এন্টিটি)। বাড়ীর একক শিশু-র ইঙ্গিতে একাকীত্বের প্রথম এবং প্রাথমিক আভাস।

ছবির প্রথম দৃশ্যে পিকুর বাবা-মা'র কথোপকথনের পর দ্বিতীয় দৃশ্যে নির্বাক কতগুলো শট্ পরপর সাজিয়ে পিকুর নিঃসঙ্গতা ফুটিয়ে তোলা হয়। পিকু গাড়ীবারান্দার রেলিং-এর উপর ঝুঁকে পড়ে দেখতে থাকে—প্রথমে বাবা গাড়ী করে বেরিয়ে যান; তারপর টিংটিং শব্দ তুলে একটা রিক্শা একজন ভীমবপু যাত্রীকে নিয়ে বাঁ থেকে ডাইনে চলে যায়; তারপর দশজন কুলির মাথায় একটি গ্র্যাণ্ড পিয়ানো যায় ডাইনে থেকে বাঁয়ে; তারপর এক বিশাল সেণ্ট বার্ণার্ড কুকুর সমেত এক ভদ্রলোক, তারপর একটা হাল্কা নীলরঙের রোল্স রয়েস টুরার। অতঃপর

পিকু দৃষ্টি ঘুরিয়ে পাশের বাড়ীর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে ওখান থেকেই একটি কুকুরের অবিরাম ঘেউ ঘেউ আওয়াজ আসছে এবং কিছুক্ষণ সেদিকে চেয়ে থেকে পিকু 'চোপ.' বলে পাল্টা আওয়াজ দিলে কুকুরের ডাক ম্যাজিকের মতো থেমে যায় (এই 'চোপ' কথাটাই পরে আবার ফিরে আসে তার মা আর হিতেশকাকুর রুদ্ধদ্বার প্রণয়ের দৃশ্যে, অনেক বেশী অভিঘাত নিয়ে, তাতে তখন যেন পিকুর অভিমান আর ক্ষোভ ধ্বনিত হয়)।

এই সব টুকরো টুকরো দৃশ্য পরপর সাজিয়ে একটি কথাও না বলে স্কুল ছুটির দিনে পিকুর একলা অলস সকালের কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যদিয়ে তার নিঃসঙ্গতার পরিচয় দেওয়া হয় (কারো কারো মনে পড়ে যেতে পারে 'চারুলতা' ছবিতে চারুর একাকীত্বের অনুরূপ দৃশ্যাবলী)।

আরেকটা দৃশ্যের কথা ধরা যাক্। বারান্দায় রাখা টেলিফোনের পাশে একটা প্যাডে লেখা কিছু "জরুরি" ফোন নাম্বার থেকে পিকু পরপর কয়েকটা নাম্বার রিং করে। প্রথম জবাব আসে ঈভ্‌স বিউটি পার্লার থেকে, তার পরেরটা ট্রিংকা রেস্টোরাণ্ট থেকে, তারপর টেলিফোন ভবনের ট্রাংক বুকিং পোজিশন ডেস্ক থেকে। বিলাসবহুল বিউটি পার্লার, ব্যয়বহুল রেস্টোরাণ্ট বা দূরপাল্লার যোগাযোগ—কোনটাই পিকুর নিজস্ব জগতের ব্যাপার নয়, এগুলো তার পক্ষে 'জরুরী'ও নয়, এ সবই তাই তার কাছে 'রং নাম্বার'। তাই অন্যপ্রান্ত থেকে "গুড্‌ আফটারনুন" শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঐ দুটি শব্দ উচ্চারণ করে সে বারে বারে ফোন নামিয়ে রাখে। এভাবে একটা আপাত মজার সিকোয়েন্সের মাধ্যমে সত্যজিৎ সৃষ্টি করেন এক গভীর 'irony' এবং বুঝিয়ে দেন পিকুর বাবা-মা'র 'জরুরী' পরিমণ্ডল থেকে তার alienation কতটা। বাড়ীর ভেতর থেকে বড়দের বাইরের জগৎকে সামনে নিয়ে আসেন তিনি এবং আভাসে ধরিয়ে দেন দুই জগতের সংঘাত।

কিংবা ধরা যাক্, ফুলের কথা। ছবি জুড়ে 'ফুল' ফিরে ফিরে এসেছে মোটিফ্‌ হয়ে। হিতেশের কাছ থেকে ছবি আঁকার খাতা আর রঙীন ব্রাশ-পেন পেয়ে পিকু নতুন খাতায় প্রথমেই যে-ছবি এঁকে মাকে দেখায় তা হল দুটো ফুলের ছবি। তাতে তখনই কোন অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। মা তাকে বাগানে গিয়ে সত্যিকারের ফুলের রঙ মিলিয়ে মিলিয়ে ছবি আঁকার খেলায় মাতিয়ে নিজেদের থেকে কিছুক্ষণের জন্য দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। মায়ের কাছে ফুল হয়ে ওঠে একটা ছল, একটা ফিকির। এরপর সরলমন পিকু-র কাছে ফুলের রঙ মিলিয়ে ছবি আঁকাটা একটা জমজমাট খেলার মত হয়ে দাঁড়ায়। এবার ফুলের রঙ আস্তে আস্তে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। আর গোটা ছবির mood এবং Complexionও আস্তে আস্তে পাল্টাতে থাকে। বাগানে অজস্র ফুলের গাছ থাকা সত্ত্বেও পিকুকে ফুল খুঁজে বেড়াতে হয় : 'এটা ফুলের সময় নয়'। হাই অ্যাঙ্গল

-শটে দেখা যায়, পিকু রঙ মিলিয়ে ছবি আঁকছে : প্রথমে উজ্জ্বল লাল পোর্টুলাকা, তারপর হল্‌দে লানটানা, গোলাপী শাপ্‌লা,···ফিকে লাল রঙের গোলাপ। একটু লক্ষ্য করলে আমাদের হুঁশ হয়, আপাতভাবে পরপর দেখা ফুলের রঙগুলো random মনে হলেও পরিচালক সেগুলোকে রেখেছেন এক বিশেষ ক্রমানুসারে—পিকুর দেখা (এবং আঁকা) ফুলের রঙ ক্রমাগত ফিকে হয়ে আসে। ইতিমধ্যে ইণ্টারকাট্ করে দেখানো হয় পশ্চিম কোণে কালো মেঘ। তারপরই পিকুর চোখে পড়ে সাদা শাপ্‌লা, তারপর সাদা কাঠচাঁপা, সাদা গন্ধরাজ এবং আরো অনেক অনেক রকম সাদা ফুল। আর ঠিক তখনই দর্শককে চম্‌কে দিয়ে এক নির্মম আয়রণির মুহূর্ত সৃষ্টি হয়। পিকু বাগান থেকে চীৎকার করে বলে "আমি সাদা ফুল কালো রঙ দিয়ে আঁকছি মা—সাদা রঙ নেই।" পিকু ওপর থেকে কোন জবাব পায় না। কাট করে সীমা (পিকুর মা) আর তার প্রণয়ী হিতেশের একটা বেড্‌সীন সংক্ষিপ্তভাবে দেখানো হয়—তাদের মধ্যেও বোঝাপড়ার গরমিল হয়েছে বোঝা যায় ; নেপথ্যে পিকুর কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায়, "সাদা ফুল কালো দিয়ে আঁকছি—হ্যাঁ ? কালো দিয়ে আঁকছি—বলে দিলাম।" এই শেষ কথাগুলিতে যেন পিকুর অভিমান (এক নিচুপর্দার প্রতিবাদের ঢঙ) আঁচ করা যায়। লিলিপুলের ধারে দাঁড়িয়ে পিকু কালো কলম দিয়ে সাদা শাপলা আঁকতে শুরু করেছে, এমন সময় এক ফোঁটা বৃষ্টি খাতার উপর পড়ে ছবিটাকে ভিজিয়ে নষ্ট করে দেয়। এসবই দর্শকের কাছে অদ্ভুত ব্যঞ্জনাময় ও প্রতীকী হয়ে ওঠে। এতক্ষণের একটা আপাত হাল্কা মেজাজের ছবি হঠাৎ পশ্চিমী মেঘের মতো dark হয়ে ওঠে ; সরল পিকুর নিঃসঙ্গতা তার মার ছলনার পরিপ্রেক্ষিতে আরো তীব্র হয়ে ওঠে।

এরপর পিকুর দাদুর মৃত্যুদৃশ্যের মধ্যদিয়ে ছবিতে কারুণ্য আরো ঘনীভূত হয়। ছবি শেষ হয়ে আসে আবার ফুলের অবতারণায়। এবার খাতার একটা নতুন পাতায়, চোখের জল মুছে, বেগুনী রঙ দিয়ে ঘরের টেবিলের উপর ফুলদানিতে-রাখা একটা বেগুনী ফুল আঁকতে শুরু করে পিকু। ক্যামেরা পিছিয়ে আসে। বাইরে বৃষ্টি। "বারান্দায় পিকু একা, ছবি আঁকছে।" বেগুনী রঙের অবতারণায় বেদনার বেশ তীব্র হয়ে ওঠে ; পিকুর ছবি এঁকে চলার মধ্যে এই নিঃসঙ্গতায় তার অভ্যস্ত হয়ে ওঠার ইঙ্গিতে ছবি শেষ হয়।

এতো গেল সত্যজিতের রঙের প্রয়োগ। সঙ্গীত, চিত্রগ্রহণ, চিত্রপট, সম্পাদনা সব কিছুই মুন্সীয়ানার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন সত্যজিৎ। যেমন ধোপা বাড়ী এসে কাপড় নিয়ে যাওয়া, পিতলের আসবাবপত্র, গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লক ইত্যাদির মাধ্যমে পিকুদের বাড়ীর পুরনো জমিদারী-বনেদিয়ানার পটভূমি সৃষ্টি করা হয়। আবার হিতেশের কোট-প্যাণ্ট-টাই এবং অ্যামবাসডর গাড়ী, ঈভ্‌স বিউটি পার্লার বা ট্রিংকা রেস্টোরাণ্টের অনুষঙ্গ দিয়ে ঐ পরিমণ্ডলে এক পরিবর্তনের বাহ্যিক ইঙ্গিত রাখা হয়। এই বৈপরীত্য একদিকে সীমার বেশভূষা, শ্বশুরকে ওষুধ খাওয়ানো, স্বামীর

জামার বোতাম সেলাই করে দেওয়া, পিকুর সরল বিশ্বাসের উপলব্ধিতে কান্না, আরেকদিকে হিতেশের সঙ্গে দিবালোকে প্রণয়ের মধ্যদিয়ে তুলে ধরা হয়। এইভাবে চরিত্রগুলিকে সাদা-কালোয় উপস্থাপিত না করে কিছু gray shades দেওয়াতে তাদের authenticity বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পিকুর নিঃসঙ্গতাকে এক জটিল প্রেক্ষিতে চিহ্নিত করেছে।

শিশুর নিঃসঙ্গতার ছবি হিসেবে 'পিকু'-র এক microcosm অবশ্য আমরা আরো অনেক আগেই পেয়েছি ১৯৬৪-তে করা 'টু' ছবিতে। মাত্র পনের মিনিটের এই ছবি সত্যজিতের সবচেয়ে ছোট ছবি, ১৬ মিলিমিটারে তোলা একমাত্র ছবি এবং নির্বাক ছবি। প্রযোজক আমেরিকার এক টেলিভিশন সংস্থা সত্যজিৎ রায়কে বাংলার পটভূমিতে ইংরেজী ভাষায় একটি ছোট্ট ছবি করতে অনুরোধ করলে সত্যজিৎ এই বৈপরীত্য পছন্দ করেন নি ; তাই ছবিটি নির্বাক করবেন ঠিক করেন। মাত্র তিন দিনে শুটিং করা এই ছবিতে দৃশ্যপট, সাজপোষাক, আবহসঙ্গীত এবং সম্পাদনা তথা অভিনয়ের অসামান্য নজির রয়েছে।

একটি ধনী ঘরের দুলাল এবং একটি কাঙালী ঘরের ছেলেকে নিয়ে এই ছবি। দুজনের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে তাদের সাজপোষাক, ঘরবাড়ী, খেলনা ইত্যাদির মাধ্যমে। ধনী ছেলেটির চেহারা, মাথায় মিকি-মাউজ-ক্যাপ, হাতের কোকাকোলা, মুখের চ্যুয়িংগাম তাকে শীর্ণ, উদোম গায়ে ইজের-পরা ছেলেটির থেকে স্পষ্টভাবে পৃথক করে দেয়। ধনী ছেলেটির ড্রয়িংরুমে সিলিং-এ ঝোলানো বেলুন, মেঝেতে পড়ে-থাকা বেলুন ইত্যাদি থেকে অনুমান করা যায় আগের দিন তার জন্মদিন পালিত হয়েছে। তার নিজের ঘরেও শেল্‌ফে, ডিভানে, মেঝেতে থরেথরে সাজানো রয়েছে নতুন নতুন খেলনা, একটা 'ড্রাম'-বাজানো বাঁদর, এক বাঁশি-বাজিয়ে, একটা বেহালাবাদক, একটা রোবট, অনেক মুখোশ ইত্যাদি। সব যান্ত্রিক খেলনা। গরীব ছেলেটির খেলনা বলতে আমরা দেখতে পাই একটা ঘুড়ি, একটা মুখোশ আর একটা বাঁশের বাঁশি।

এবার এই দুজনের মধ্যে খেলনা বা খেলা নিয়ে রেষারেষির মধ্যদিয়েই 'প্লট' সাজানো হয়। প্রথম দৃশ্যেই আমরা দেখি ধনী ছেলেটির মা-বাবা 'টা-টা' করে গাড়ী করে বেরিয়ে যান ছেলেটিকে একলা এক প্রকাণ্ড ফ্ল্যাটের মধ্যে রেখে। নীচে ঝুপড়িবাসী দরিদ্র ছেলেটির বাঁশির আওয়াজ শুনে ধনী ছেলেটি তার উপরতলার ফ্ল্যাটে বসে ক্ল্যারিয়নেট দিয়ে পাল্টা দেয়। দরিদ্র ছেলেটি ঢোলক বাজালে ধনী ছেলেটি ড্রাম-বাজানো বাঁদরকে চালু করে দেয়। এমনি রেষারেষির এক পর্যায়ে ধনী ছেলেটি দেখে দরিদ্র ছেলেটি একটা ঘুড়ি ওড়াচ্ছে ; সে একটা গুলতি দিয়ে ঐ ঘুড়ি ফাঁসাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে একটা এয়ারগান দিয়ে গুলি করে তা ছেঁদা করে দেয়। জয়ের আনন্দে ধনী ছেলেটি এবার সব দম-দেওয়া

বাজনা, খেলনা একসাথে চালু করে দিয়ে এক Cacophony সৃষ্টি করে। দম কমে এলে এই যৌথ আওয়াজ যখন একটু স্তিমিত হয়ে আসছে তখন সব শব্দ ছাপিয়ে আবার শোনা যায় সেই বাঁশের বাঁশির আওয়াজ। ধনী ছেলেটি বিমর্ষ হয়ে পড়ে। আর পর্দায় দেখা যায় বিকটাকার রোবট হেলে-দুলে উৎকট আওয়াজ করতে করতে এসে মেঝের ওপর প্লাস্টিকের ইঁট-সাজিয়ে-গড়া একটা মিনারে ধাক্কা দিয়ে চলে যায়; মিনারটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। চারপাশে মেঝে ভর্তি হাজারো রকম খেলনার মধ্যে ছত্রখান মিনারের সামনে ধনী ছেলেটি ধপাস্ করে বসে পড়ে; যেন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বসে আছে সে। ওদিকে বাঁশের বাঁশি বেজেই চলেছে। ছবি সমাপ্ত হয়।

এ ছবির স্বরচিত বলিষ্ঠ প্লট থেকে শুরু করে দৃশ্য-বিন্যাস এবং ফিল্ম ট্রিটমেণ্ট বিশেষভাবে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। শিশুমনস্তত্ত্বেরও গভীর প্রতিফলন এতে পাওয়া যায়। গোড়ার দিকের একটি দৃশ্যে দেখা যায় ধনী ছেলেটি ড্রয়িংরুমের ডিভানে বসে মেঝেতে পড়ে থাকা বেলুনগুলো দেশলাই জ্বেলে বিকট আওয়াজে ফাটিয়ে আনন্দ পায়—নিঃসঙ্গতার বিকার ধরা পড়ে 'ক্লোজ-আপ'-এ। এছাড়া এফেক্ট-সাউণ্ড এবং মিউজিকের বিশদ প্রয়োগ তো রয়েছেই।

ছবিতে শেষমেঃ দরিদ্র ছেলেটিই তার অকিঞ্চিৎকর খেলনাগুলি দিয়ে পারস্পরিক খেলার লড়াইয়ে জিতে যাচ্ছে এমন ইঙ্গিত থাকলেও এটাও স্পষ্ট যে দুজনেই ভিন্ন ভিন্ন অর্থে victim—একজন প্রাচুর্যের, অন্যজন অভাবের। এই একরত্তি নির্বাক ছবিতে সত্যজিৎ রায় বাঙ্ময় করে তুলেছেন এই সমাজের দুই মেরু, আর তার মাঝখানে শিশুদের অবস্থান।

এই ছোট্ট ছবিগুলি গভীর মনোনিবেশ করে দেখলে সত্যজিতের সৃজনী প্রতিভার এবং চলচ্চিত্র-শৈলীর সারবেত্তা অনুধাবন করা যায় এবং তাঁর পূর্ণ দৈর্ঘ্য চিত্রগুলির সম্যক উপলব্ধিতে এরা সহায়ক হয়। সেখানেই এগুলির গুরুত্ব।

গ্রন্থ নির্দেশ :

১। সত্যজিৎ রায়, 'বিষয় চলচ্চিত্র'।
২। মারী সীটন, 'পোর্টেট অব এ ডিরেক্টর : সত্যজিৎ রায়'।
৩। অ্যাণ্ড্রু রবিনসন, 'সত্যজিৎ রায় : দি ইনার আই'।
৪। সত্যজিৎ রায়, 'পিকুর ডায়রি ও অন্যান্য'।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

সত্যজিৎ রায় : একজন সমাজ-সচেতন শিল্পী

সত্যজিৎ রায়ের কাছে আমাদের ঋণ কখনো শোধ হওয়ার নয়। আজ থেকে সাঁইত্রিশ বছর আগে তাঁর সৃষ্ট 'পথের পাঁচালি' সমগ্র পৃথিবীর চলচ্চিত্র-নির্মাতাদের এখনো শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা দেয়। আমার এক বন্ধু আমাকে একবার বলেছিলেন, 'পথের পাঁচালি' ভারতীয় চলচ্চিত্রকে ব্যাকরণ এবং রচনার প্রথম পাঠ দিয়েছিল।

সত্যজিৎ নবজাগরণের অন্যতম অগ্রগামী ব্যক্তিত্ব, তাঁর প্রতিভার বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা এতো বিশাল যে, কোনো একটি দিক থেকে সেই বিশালতার মূল্যায়ণ অত্যন্ত দুরূহ কাজ। সত্যজিৎ-প্রতিভার সামুদ্রিক গভীরতার সঠিক মূল্যায়ন করতে হলে তাঁর শৈশব, কৈশোরের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা, তাঁর সহানুভূতিশীলতা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল তা জানতে হবে।

আমরা জানি যে, সত্যজিৎ এমন এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যেখানে পাশ্চাত্যের উদার মুক্ত-বায়ুর বহতী স্রোত নিজের পরিচয়ের উপর ছাপ রেখে গিয়েছিল সত্যজিতের জন্মের বেশ কিছুদিন আগেই। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, পাশ্চাত্যের প্রভাব তাঁদের পরিবারের বাঙালীত্বের শিকড় আলগা করে দেয় নি কখনোই। সত্যজিতের পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং পিতা সুকুমার রায় বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সঙ্গীত, রাজনীতি এবং বাঙালীয়ানার সঙ্গে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে জড়িয়ে রেখেছিলেন। এই পরিবার প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের কৃষ্টির নির্যাসটুকু নিজেদের মত করেই গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। সত্যজিতের ছবির উদার মানবিকতাবাদ বা ব্যাপ্তি আমার মতে তাঁর পরিবারের কাছ থেকে জন্মসূত্রে পাওয়া এক অমূল্য পুরস্কার।

রায়-বংশের কথা থাক; এবারে সত্যজিৎ সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। সত্যজিতের জন্ম এমন একটা সময়ে (১৯২১ সালে) যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রক্তাক্ত স্মৃতি মানুষের মন থেকে মুছে যায় নি, উদার মানবিকতাবাদের প্রভাবে গড়ে ওঠা উনিশ শতকের বাংলার চেতনার পাড়-ও ভেঙে যাচ্ছিল সেই সময়। বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশ মার্ক্সীয় মতবাদ ও বিপ্লবের ভাবনার আশ্রয়ে বাঁচতে চেষ্টা করছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে, যখন সত্যজিৎ একজন কৈশোরোত্তীর্ণ যুবক, তখন আমরা দেখতে পাই Indian People's Theatre Association (IPTA)-এর উন্মেষ, নতুন মতবাদের সাংস্কৃতিক হাতিয়ার হিসেবে। মার্কস্‌বাদী চিন্তাধারা বা সংস্কৃতিতে

সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না করলেও সত্যজিৎ তাঁর চারপাশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও পরক্ষে ভিন্নতর শৈল্পিক প্রভাবও তার মধ্যে কাজ করেছিল। এই দিক থেকে তিনি তৎকালীন অনেক সমাজ-সচেতন বুদ্ধিজীবীর একজন ছিলেন, যাঁরা কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে না থেকেও ছিলেন উদার মানবতাবাদী।

সত্যজিৎ যখন চলচ্চিত্র-নির্মাণকার্যে এলেন, স্বাধীনতা প্রাপ্তির রঙিন স্বপ্ন তখন সবার চোখে-মুখে। সকলের আশা এক সুন্দর, স্বচ্ছল জীবনের। সেই স্বপ্ন ভাঙতে অবশ্য বেশীদিন সময় লাগে নি। বাঙালী মধ্যবিত্ত এই বিশ্বাসভঙ্গের বিশ্বাসঘাতকতাকে সহজে মেনে নিতে পারে নি। এই অস্থির যুগের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ডামাডোল সত্যজিতের দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি এই আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিকে বুঝতে চেয়েছিলেন হৃদয় দিয়ে, গভীরভাবে। সে যুগের বাঙালীর মানসিকতায় বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি তিনি ধরতে চেয়েছেন ক্যামেরার লেন্সের মধ্যদিয়ে একটার পর একটা ফিল্মে।

আমাদের দুর্ভাগ্য, দেশী-বিদেশী চলচ্চিত্র সমালোচকেরা সত্যজিৎ রায়ের ছবিকে শুধুমাত্র উদার মানবিকতাবাদের দলিলরূপেই দেখেছেন। প্রায় কোনো সময়েই তার বাইরে যেতে পারেন নি। এই ধরণের অগভীর সমালোচনা আমাকে বিস্মিত ও ব্যথিত করে। বিশেষ করে এমন একজন শিল্পীর ক্ষেত্রে, যার হাতে শিল্পমাধ্যম বিভিন্ন স্তরের প্রতিফলন ঘটায়।

চলচ্চিত্র-নির্মাতাকে উদার মানবিকতাবাদে বিশ্বাসী হতেই হবে। একজন চলচ্চিত্র-নির্মাতার প্রধান গুণ এটাই হওয়া উচিৎ। আমাদের পণ্ডিত সমালোচকরা কেন আরো একটু এগিয়ে গিয়ে সত্যজিতের কাজকে দায়িত্বশীল সমাজ সচেতন শিল্পীর কাজ হিসেবে বিশ্লেষণ করেন না, এটা আমার বুদ্ধির অগম্য।

আমার কাছে সত্যজিৎ এমন একজন শিল্পী যিনি সবসময়ই মানুষের সমস্যার কথা বলতে চেয়েছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই প্রেক্ষিতে তার প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া হয় নি। সত্যজিৎ নিজেই বলেছেন : "I am interested in people, in human beings, in human character, in their interplay; in the relationship of characters. That fascinates me in itself." এই কথাগুলি শিল্পীর, তার সমাজের প্রতি গভীর দায়বদ্ধতাকেই ব্যক্ত করে। তবুও মানবিকতাবাদের একটা Orientation দরকার। কারণ অবিমিশ্র মানবতাবাদ বলে কিছু হয় না। বিভিন্ন শিল্পীর বিভিন্ন ধরণের বুদ্ধিগত ও শৈল্পিক orientation আছে। গোদারের ছবির মানবতা এবং সত্যজিতের ছবির মানবিক আবেদন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। সত্যজিতের ছবির আবেদনের প্রাসঙ্গিকতা তাঁর দেশবাসীর কাছে; তাঁর মানবিকতাবাদ তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ঘিরে-গড়ে উঠেছে.

যারা গোদারের ছবির দর্শকের থেকে অনেকাংশেই পৃথক। একথা আমাদের সবসময় মনে রাখা উচিৎ।

সত্যজিতের ছবির একটা ব্যাপার প্রায়শই সমালোচকদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। তাঁর ছবির মধ্যকার সমাজ-সচেতনতা কোনো image বা সশব্দ ঘটনার মাধ্যমে নিজের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি প্রচার করে না। তাঁর ছবিতে সর্বদাই সস্তা-চটকদারিতার অভাব বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীগত মানুষের অবস্থানকে বোঝাতে সত্যজিৎ Subtlety, Sophistication এবং understatement-কে ব্যবহার করেছেন। ছবিতে আবেগের দৃশ্যেও আবেগের আতিশয্যকে তিনি সযত্নে বর্জন করে গেছেন। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, কিছু চিত্র-সমালোচক সত্যজিৎকে ভারতের দুর্ভাগ্যজনক রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে উদ্বেগহীন বলে মনে করেন। এতে তাঁরা তাঁর প্রতি অবিচারই করেছেন। আমার মনে হয়, সত্যজিৎ সম্পর্কে এটা একটা ভুল ধারণা, যার জন্ম ভারতীয়দের আবেগের আতিশয্যের প্রতি ভালোবাসা থেকে। আমরা চড়া সুরে বাঁধা দুঃখ-আনন্দ, হাসি-কান্নার চিত্ররূপ দেখতে ভালোবাসি। সত্যজিতের শৈল্পিক চেতনার এটাই একমাত্র অ-ভারতীয়ত্ব বা অ-বাঙালীয়ানা যে তিনি চলচ্চিত্র-নির্মাণ কার্যে সবসময় The art of understatement-কে ব্যবহার করেছেন।

যেহেতু আমি সত্যজিতের ছবি সম্পর্কে নিজের বক্তব্যকে মাত্র কয়েকটা বিষয়ে সীমাবদ্ধ রাখবো.; তাই আমাকে 'চারুলতা', 'অরণ্যের দিনরাত্রি', 'পরশ পাথর', 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর মত কিছু চলচ্চিত্রকে আলোচনার বাইরে রাখতে হবে। তা এইজন্য নয় যে, এই ছবিগুলো কম ভালো। আসলে আমি আমার আলোচনার সীমা একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করছি।

'অপু-ট্রিলজি' সম্পর্কে আমি মাত্র কয়েকটা কথা বলবো। 'অপু-ট্রিলজি' সারা পৃথিবীর মানুষকে একটা চিরন্তন সত্য সবসময় মনে করিয়ে দেয়—জীবনে দুঃখ, কষ্ট, মৃত্যু, যন্ত্রণা আছে বলেই জীবন থেমে থাকে না। জীবন বহমান, সে তার নিজের গতিতে এগিয়ে চলে। এই ত্রয়ীতে সেলুলয়েডের শৃঙ্খলের মধ্যদিয়ে এক সত্য ঝক্‌মকিয়ে ওঠে। আমরা খোঁজ পাই এক সবল ইতিবাচকতার। অনেকে শ্রীরায় সম্পর্কে একটা বাজে কথা বলেন। তাঁরা বলেন যে সত্যজিৎ বিদেশের বাজারে ভারতের দারিদ্রকে ফেরি করেছেন। 'অপু-ট্রিলিজি' সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতারই পরিচায়ক এই মন্তব্য, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই চলচ্চিত্র মানুষকে শেখায় যে মানুষ প্রতিকূল পরিস্থিতিকে, তার ভাগ্যকে পরাস্ত করে জয়ী হবার শক্তি রাখে। যদিও অসহনীয় দারিদ্র ভারতীয় জীবনের এক নির্মম বাস্তবতা। এখানে গ্রামের পুরোহিত ও তার পরিবার এবং পরে তার ছেলে-বৌ এই দারিদ্রের অসহায় শিকার হয়েছে—তবুও সত্যজিৎ কখনো এই দারিদ্রকে সস্তা ভাবালুতায় আচ্ছন্ন করবার চেষ্টা করেন নি। তিনি তাঁর বিরুদ্ধ মন্তব্যকারীদের মত তৃতীয়

বিশ্বের অনেক চিত্র পরিচালকের মতও, কখনো ভারতের দারিদ্রকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করেন নি। তাঁর দারিদ্র-প্রদর্শন আমাদের শুধু জীবন এবং মৃত্যুর কথাই মনে পড়িয়ে দেয় না, দারিদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের অসহায়তা এবং একাকীত্বের দিকেও অঙ্গুলি-নির্দেশ করে।

আমার বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমি 'অপুর সংসার' থেকে একটা ঘটনা উল্লেখ করবো। আমার সেই রেস্তোরাঁর দৃশ্যটা মনে পড়ে, যেখানে অপু আর পুলু, পুলুর পয়সায় পেট ভরে খাচ্ছিল। খেতে খেতে অপু পুলুকে বলল যে, ও একটা চাকরী পেয়েও, সে চাকরীটা ছেড়ে দিয়েছে। পুলু তাকে জিজ্ঞেস করলো যে, তার চাকরীর এত দরকার সত্ত্বেও কেন চাকরীটা সে নিল না? জবাবে অপু তাকে বলল যে, চাকরীটা ধর্মঘটী কর্মচারীদের বরখাস্ত করে তাকে দেওয়া হচ্ছিল। সেই জন্য সে নেয় নি। এই কথাগুলোর মধ্যদিয়ে সত্যজিৎ এক অসাধারণ উচ্চতায় উঠে যান, যেখানে এক গরীব যুবক অন্য কারোর মুখের গ্রাস কেড়ে না খাবার মত সাহস ও মর্যাদাবোধ দেখাতে পারে। সামান্য কয়েকটা কথার মধ্য-দিয়ে সত্যজিৎ বুঝিয়ে দেন যে একজন গরীব লোক একটা বড় চাকার অংশমাত্র নয়; সেও একজন স্বতন্ত্র মানুষ, যে তার আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে।

সমাজ চেতনার ছবি হিসেবে চিহ্নিত করা চলে সত্যজিতের প্রথম দিকের তিনটি ছবি 'জলসাঘর', 'দেবী' ও 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'কে। আসলে আমার মনে হয় তিনটে ছবি-ই সমাজের বদলে যাবার সময়ের সঙ্গে যুক্ত। তিনটে ছবির-ই মূলে জড়িয়ে আছে সেইসব সমস্যা—ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র ও উদীয়মান ধনতন্ত্রের সংঘাতে যার জন্ম হয়। 'জলসাঘরে' আমরা দেখতে পাই একদিকে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের আভিজাত্যের অস্তগামীতা আর একদিকে সাম্রাজ্যবাদী সমাজে নব্যধনিক গোষ্ঠীর অভ্যুত্থান। 'দেবী'-তে আবার আমরা দেখতে পাই মূল্যবোধের সংঘাত। যেখানে বুর্জোয়া যুক্তিবাদ অন্ধ ধর্মীয় কুসংস্কার আর সামন্ততান্ত্রিক ভাবনার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'তে আমরা পাই এমন এক আভিজাত্যের প্রতীককে, যে ব্রিটিশ রাজাদের বদান্যতায় আজ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েও নতুন যুগে গড়ে ওঠা নতুন মুল্যবোধের ছুঁড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। তিনটি ছবিতেই সত্যজিৎ একই সঙ্গে দুটি জিনিষ করছেন। একদিকে তিনি যেমন তাঁরা ক্যানভাসে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ছবি এঁকেছেন; অপরদিকে, একই সঙ্গে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তাঁর মননশীল মন, যেখানে লুকিয়ে আছে প্রতিটি ছবির সঙ্গে যুক্ত সামাজিক বাস্তবতার প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা।

এরপর সত্যজিৎ দৃষ্টি দেন তাঁর সময়কার নগর সভ্যতার কিছু জলন্ত সমস্যার দিকে। বেকারত্ব, চরমপন্থী রাজনীতি, যুব-বিক্ষোভ, মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং আপাতদৃষ্টিতে প্রতিটি ভালো জিনেষের জন্য সেই ভয়ঙ্কর 'ইঁদুর দৌড়'।

এই ছবিগুলিতে সত্যজিৎ তাঁর সমসময়ে ফিরে আসেন। তিনি দৃষ্টি দেন

সমকালীন সমাজের গায়ে জোঁকের মতো লেগে থাকা সমস্যাগুলির প্রতি। ফলে, এবারে আমরা পরিচালককে আমাদের নিজেদের সমস্যার ও সময়ের কেন্দ্রবিন্দুতে পাই।

'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'সীমাবদ্ধ' এবং 'জনঅরণ্য'তে আমরা পাই এমন একজন চলচ্চিত্র-পরিচালককে যিনি ষাটের দশকের শেষের দিক, আর সত্তরের গোড়ার দিকের বিধ্বস্ত সময়কে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে চলচ্চিত্রায়িত করেছেন। প্রতিটি ছবির চরিত্ররা মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে উঠে এসেছে, উঠে এসেছে আমাদের মধ্য থেকেই। সেই জন্য আমরা এই ছবিগুলিতে পাই মধ্যবিত্তের শ্রেণী-চরিত্র। তার শক্তি ও দুর্বলতা। তার বিশ্বাসঘাতকতাও। মাঝে মধ্যে উর্ধতনের (superior) বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহসও অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে প্রকাশিত। 'মহানগরে'র আরতি সুব্রতর ইতিবাচক ভূমিকা যেমন আশাপ্রদ, তেমন-ই ভয় পাইয়ে দেয় 'জনঅরণ্যে'র সর্বাত্মক অবক্ষয়ের চিত্র। 'মহানগর', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'সীমাবদ্ধ'তে শ্রেণী-চরিত্র এবং তার সমস্যাকে প্রকটভাবে তুলে ধরা হয়েছে শ্রেণী-প্রতিনিধিদের কথা বা কাজের মাধ্যমে। কিন্তু এই ছবিগুলো দেখলে মনে হয় যে পরিচালক বেকার সুব্রত বা ডাক্তারী পডা ছেড়ে ছোট চাকরী নেওয়া সিদ্ধার্থ, এমনকি ভয়ঙ্কর উচ্চাকাঙ্খী অথচ সংবেদনশীল শ্যামলেন্দু সম্পর্কে সহানুভূতিশীল। কিন্তু 'জন-অরণ্য'তে পরিচালকের মানসিকতায় যেন আমূল পরিবর্তন এসেছে। তিনি চাবুক হাতে একটা পচা, দুর্গন্ধময় শ্রেণীকে চাবকেছেন। আমার মতে 'জনঅরণ্য' একটা ট্র্যাজিক ছবি। কারণ পরিচালক এই ছবিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে কোনো আশার বাণী শোনাতে চান নি।

'জনঅরণ্য'ত আবহ সঙ্গীতের ব্যবহারে কল্পনা এবং মুন্সিয়ানার যথেষ্ট ছাপ আছে। অবশ্য সঙ্গীতেব ব্যবহার সত্যজিতের ছবির একটা প্রধান বৈশিষ্ট্যও বটে। এই ছবিতে রবিঠাকুরের "ছায়া ঘনাইছে বনে বনে"র সঙ্গে পর্দায় ভেসে ওঠে এক বৃদ্ধ পিতার চিন্তাক্লিষ্ট মুখ। আগত ঝড়ের দিকে তাকিয়ে আছে সে। দ্বিতীয় সিকোয়েন্সে বিটোফেনের 'For Elise' ব্যবহারে চমৎকারিত্ব আছে। যাঁরা এটি শুনেছেন তাঁরা জানেন যে 'For Elise' একজন পুরুষের নারীর প্রতি প্রেমের স্মারক। এটা ব্যবহার করা হল যখন সোমনাথ নারীকে পণ্য করে একটা ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কনট্রাক্ট হাসিল করছে। এই sound montage-এর চমৎকার ব্যবহার আমাদের ভেতরকার মানুষটাকে নগ্ন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড করিয়ে দেয়।

এবারে যে চলচ্চিত্র দুটির কথা আমি বলতে চাই, তা হ'ল 'শতরঞ্জ কে খিলাডী' ও 'সদ্‌গতি'। 'শতরঞ্জ কে খিলাডী'র শেষে দুই জায়গীরদার, যাদের শরীরে নীল রক্ত আছে, বদলে যাওয়া বাস্তবের সঙ্গে তাদের সমঝোতা করতে ব্যস্ত দেখা যায় ; এমন একটা সময়ে যখন নবাব ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন এবং ব্রিটিশ ক্ষমতা

দখল করছে। তারা এটা বোঝবার মত বুদ্ধিমান যে প্রতিবাদ না করলে, তবেই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষিত হবে। শেষ দৃশ্যে আমরা দেখি গ্রামের বালক কাল্লুকে দুই জায়গীরদারের মধ্যে দাবার বোর্ডে ছায়া যুদ্ধের সাক্ষী হিসেবে। কাল্লুর চোখে আমরা দেখতে পাই নীরব ক্রোধ, নিরুক্ত প্রতিবাদ। যখন 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী' প্রথমে দেখানো হয় তখন অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন এই বলে যে, সত্যজিৎ ব্রিটিশের আউধ দখলের সময় সাধারণ মানুষের প্রতিবাদকে ছবির মধ্যে স্থান দেন নি। এই ক্ষোভের ইঙ্গিত মাত্র দিয়েছেন সত্যজিৎ একটা বালককে দর্শক হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু জায়গীরদারদের সুবিধাবাদী শ্রেণী হিসেবে সূক্ষ্মতার সঙ্গে চিত্রায়িত করে এবং রাজ্যদখলের সময়কালে একটা বালকের মধ্যে সঞ্চারিত ক্ষোভ দেখিয়ে সত্যজিৎ বাস্তবকে সম্মান জানিয়েছেন। প্রতিবাদের এই ধারা ১৮৪৭ সালের স্বাধীনতার যুদ্ধে রূপান্তরিত হবার চিহ্ন 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী'তে ছড়িয়ে আছে। বিদেশী শক্তির সঙ্গে উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর ও রাজতন্ত্রের সহযোগিতা এবং এই শ্রেণীর সুবিধাবাদী চরিত্র 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী'তে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান।

'শতরঞ্জ' থেকে 'সদ্‌গতি'তে এসে আমরা দেখি, সত্যজিৎ, ভারতের গ্রামের জাত-পাতের জ্বলন্ত সমস্যা কী অসাধারণ বাস্তববোধের সঙ্গে লেন্সে ধরেছেন। ভারতের গ্রামে এখনো সমস্ত ক্ষমতা সামন্ততান্ত্রিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ, যা কখনো গ্রামের পুরোহিতের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া সম্পূর্ণতা পায় না। এটা আজ-ও এই '৯০-র দশকেও সত্য। যেমন সত্য ছিল প্রেমচন্দ্র রচিত এই কাহিনীর সময়কালে। আজও, দেশের প্রত্যন্ত (remote) প্রান্তরে একজন সামন্ততান্ত্রিক জমিদার, ভূমিহীন চাষী বা bonded labourer-এর জীবন-মৃত্যুর প্রধান নিয়ামক। 'শতরঞ্জ' এবং 'সদ্‌গতি', সামন্ততন্ত্রের শয়তানী চরিত্র এবং সমাজের ওপর কর্তৃত্বের সীমানা বাড়িয়ে যাবার পরিকল্পনার চিত্ররূপ।

শেষ করবার আগে আমি বলতে চাই যে সত্যজিতের সমাজ-সচেতনতা তাঁর ছবির একেবারে মাঝখানে খুঁজে নাও পাওয়া যেতে পারে। তিনি কোনো অর্থে ই তাঁর ছবিতে শুধুমাত্র সমাজ-সচেনতাকে স্থান দেন নি। তাঁর সচেতনতা খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর details-এর অপূর্ব ব্যবহারে—কিছু frame-এ, কিছু snot-এ, কিছু Situation-এ এবং sound Montage-এর মুনশীয়ানায়। তাই সত্যজিৎ রায়কে সমাজ-সচেতন শিল্পী হিসেবে মূল্যায়ন করতে গেলে আমাদের তাঁর কাজকে যথেষ্ট আগ্রহ এবং বিনয় নিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। তবেই আমরা অন্ধকারের বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা আলোর ঝরণাধারা দেখতে পাবো।

অনুবাদক : নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

পল্লব সেনগুপ্ত

রবীন্দ্র-সত্যজিতের যুগলবন্দী

রবীন্দ্রনাথ ১৯২৬ সালের ২৬শে নভেম্বর তারিখে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন :

"আপন সৃষ্ট জগতে আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রত্যেক কলাবিদ্যার লক্ষ্য। নইলে তার আত্মমর্য্যাদার অভাবে আত্মপ্রকাশ ম্লান হয়। ছায়াচিত্র এখনো পর্যন্ত সাহিত্যের চাটুবৃত্তি করে চলেচে—তার কারণ কোনো রূপকার আপন প্রতিভার বলে তাকে এই দাসত্ব থেকে উদ্ধার করতে পারেনি।...ছায়াচিত্রের প্রধান জিনিষটা হচ্চে দৃশ্যের গতিপ্রবাহ। এই চলমান রূপের সৌন্দর্য্য বা মহিমা এমন করে পরিস্ফুট করা উচিত যা কোনো বাক্যের সাহায্য ব্যতীত আপনাকে সম্পূর্ণ সার্থক করতে পারে। তার নিজের ভাষার মাথার উপরে আর একটা ভাষা কেবলি চোখে আঙুল দিয়ে মানে যদি বুঝিয়ে দেয় তবে সেটাতে তাব পঙ্গুতা প্রকাশ পায়। সুরের চলমান ধারায় সঙ্গীত যেমন বিনা বাক্যেই আপন মাহাত্ম্য লাভ করতে পারে তেমনি রূপের চলৎপ্রবাহ কেন একটি স্বতন্ত্র রসসৃষ্টিরূপে উন্মেষিত হবে না?"

[শ্রী মুরারি ভাদুড়ীকে লেখা]

হয়ত বা কবির এই প্রশ্নের উত্তরই সত্যজিৎ দিয়েছেন তিনটি দশক পেরিয়ে যাবার পরে; রবীন্দ্রনাথেরই কতকগুলি অসামান্য গল্প-উপন্যাসকে চলচ্চিত্রে রূপ দিতে গিয়ে।

১

কবির জন্মশতাব্দী উপলক্ষে সত্যজিৎ তাঁকে নিয়ে যে তথ্যচিত্রটি তৈরী করেছিলেন, তার শুরু হয়েছিল এইভাবে : "১৯৪১ সালের আগস্ট মাসের সাতুই, কলকাতায় একজন মানুষ মারা যান। তাঁর নশ্বর দেহাবশেষ লুপ্ত হয়ে গেছে; কিন্তু এমন একটা ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার তিনি পিছনে ফেলে রেখে গেছেন, যা আগুনে পুড়ে ছাই হবার নয়।

সেই ঐতিহ্য শব্দের, সুরের এবং কবিতার; ভাবনার এবং ভাবাদর্শের—যা আজও আমাদেরকে সচকিত করে তোলার ক্ষমতা রাখে; আর অনাগত দিনগুলিতেও সেই ঐতিহ্য সক্ষম থাকবে ঠিক ঐ একই ভাবে..." [অনূদিত]

এই ধারাভাষ্য, সত্যজিতের নিজেরই জবানিতে। এর পটভূমিতেই রবীন্দ্র-

ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার সত্যজিতের সৃষ্টিতে কতখানি কিভাবে বর্তেছে সেইটি বিচার্য।

২

রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই সত্যজিৎ এমনকিছু মাত্রা আরোপ করেছেন ছবি তৈরীর সময়ে, যার ব্যঞ্জনা মূল কাহিনীতে হয়ত খুব মৃদুভাবে অনুভব করা যায়। আবার কোনও কোনও সময়ে তিনি সম্পূর্ণ নতুন-কিছু ভাবনার উন্মেষ ঘটিয়েছেন, কাহিনীর মূল চেহারাটাকে বাইরের দিকে মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রেখেই। প্রথম ক্ষেত্রের উল্লেখ্য উদাহরণ 'চারুলতা', দ্বিতীয়ের, 'ঘরে-বাইরে'। 'তিনকন্যা' সিরিজে স্বল্পতরভাবে দুয়েরই প্রতিফলন ঘটেছে।

ধরুন 'চারুলতা'-র কথাই। 'নষ্টনীড়' কাহিনীতে যে ত্রিকৌণিক জটিলতা রবীন্দ্রনাথ চিত্রিত করেছেন, সত্যজিৎ তাকেই রূপায়িত করেছেন মূলের পরিকাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখেই।

অমলের চরিত্রের গভীরতা তিনি কমিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু চারুর নৈঃসঙ্গ্যের যন্ত্রণাটুকু যেভাবে সত্যজিৎ 'হাইলাইট' করেছেন, তাতে তার সুগভীর অন্তর্দ্বন্দ্বটা অনেক বেশি বেড়েছে। ফলে সামগ্রিকভাবে মূল কাহিনীর ভরসমতা অক্ষুণ্ণই থেকেছে। পক্ষান্তরে, মূলে বর্ণিত বেশ কিছু ঘটনা সিনেমায় বাদ পড়েছে সঙ্গতভাবেই, কেননা দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমে সেগুলি বড় বেশি অতিনাটকীয় হয়ে উঠত : যেমন, ক্রুদ্ধ ভূপতির আকস্মিকভাবে নিজের লেখার খাতাগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া। প্রি-পেড টেলিগ্রামের জবাব হাতে পেয়ে চারু-অমলের সম্পর্কটার স্বরূপ সহসাই যেভাবে ভূপতির কাছে উদ্ভাসিত হয়েছিল, সাহিত্যিক-মাধ্যমে তার প্রয়োগ অত্যন্ত সুষ্ঠু হলেও সিনেমা-মাধ্যমে তার অভিব্যক্তি কিছু পরিমাণে অতি-নাটকীয় না হয়েই পারত না। অথচ সমগ্র কাহিনীর স্বরগ্রামই মন্দ্রসপ্তকে বাঁধা ; ভাবনার সেই মৃদু অথচ গম্ভীর আবেদন সিনেমার মূল উপজীব্যের মধ্যেও যথাযথ বজায় থেকেছে। সেখানে ঐ অতিনাটকীয়তা, শিল্পের প্রতীতিকে ক্ষুণ্ণ করত। সত্যজিৎ তা হতে দেন নি রবীন্দ্রনাথের ভাবনার পাঠবৃত্তকে নিটোল রাখার প্রয়োজনেই।

সাহিত্যে একটা বিশেষ সুবিধা আছে ; লেখক সেখানে একটা সূক্ষ্ম অনুভবকে, একটা জটিল গ্রন্থির মানসিকতাকে নানান উপমা-রূপক-সংকেত ইত্যাদির মাধ্যমে বাঙ্ময় করে তুলতে পারেন। কিন্তু চলচ্চিত্রে তো বর্ণনার অবকাশ নেই : তাৎক্ষণিকভাবে দেখবার এবং শোনবার মাধ্যমেই দর্শক-শ্রোতাকে নিজের মনের গভীরে (হয়ত অজান্তেই) অনুভব করতে হয় সবটুকু ভাবনার সংকেতকে।

অতএব ছবির মাধ্যমে নানান কোণ থেকে শট্‌ নিয়ে খুঁটিনাটি অজস্র বিষয়কে পরের-পর (অথবা, আপাত-অসংলগ্নভাবেও) না-দেখালে চলে না। তাই, 'চারুলতা'র প্রথম সাত-আট মিনিটে তার যে নিঃসঙ্গতা দেখানো হয়েছে, সেটা কাহিনীর প্রায় পাতাকুড়িক পরিমাণের বিবরণের সঙ্গে খাপ খাইয়েই : "প্রথম থেকেই আমি যা মুখ্য বলে বুঝেছিলাম, তা হল চারুর নৈঃসঙ্গ্য। সে নিঃসঙ্গতার রূপটা কী রকম? কোনো সঙ্গীর অভাব, অর্থাৎ কোনো-ধরণের মানসিক যোগাযোগের অনুপপত্তি। চারুলতার সেই নিঃসঙ্গতার চলচ্চিত্র রূপটা যদি ধারাবিবরণী-ব্যতিরেকে বোঝাতে হয়, তাহলে শুধু দেখানোব মাধ্যমেই কিন্তু সেটা করতে হবে। নিঃসঙ্গ একটি নারী কী-কী করতে পারে? সে তার সময় কাটায় কেমনভাবে? তখনও কী তার কোনো রকমের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে? নিঃসঙ্গতা দু-ধরণের : একটা হল বার্দ্ধক্যের আর একটা যৌবনের, যখন মানুষের মনে সঙ্গ পাবার আকাঙ্ক্ষাটা অটুট থাকে।"

['ফিল্ম আই'/সত্যজিৎ রায ; রুইযা কলেজ ফিল্ম সোসাইটি জুর্নাল ; অনূদিত]

সুতরাং গল্পের প্রথম কুড়িপাতার বিকল্পে যে-মিনিট সাতেকেব দৃশ্যায়ন করা হয়েছে, তার 'ডিটেইলিং'-টার মাধ্যমেই সত্যজিৎকে চারুর নৈঃসঙ্গ্য এবং সেটার অনুষঙ্গবাহী একটা অনচ্ছ-যন্ত্রণার অভিভবকে ফোটাতে হয়েছে। ঘটনার একটা সময়কাল সূচিত করা, চারুর চরিত্রের কতকগুলি বিশিষ্টতার ইঙ্গিত দেওয়া, ভূপতির সঙ্গে তার সম্পর্কের একটা হালকা-আভাস জানানো ইত্যাদি আরও নানারকম বিষয়কে ঐ সাত-আট মিনিটের মধ্যেই নিয়ে আসতে হয়েছে। আর আনতে হয়েছে কয়েকটি বিশেষ দ্যোতনাগর্ভ প্রতীক—যাদের মাধ্যমে ঐ সমস্ত ব্যাপারগুলিকে দৃঢ়সন্নদ্ধ করতে চেয়েছেন সত্যজিৎ।

রবীন্দ্রনাথ যেখানে "ফল-পরিণামহীন ফুল", "বাল্যকালের কল্পনা ভয় ঔৎসুক্য", "কুয়াশা কাটিবামাত্র পথিক যেন চমকিয়া দেখিল", "সহস্র হস্ত গভীর গহ্বর" ইত্যাদি আলঙ্কারিক কথার সংকেতে যেমন (যথাক্রমে) চারুর সন্তান-বিহীন যৌবন, তার মনের অন্তর্গূঢ় অভীপ্সা, অমলের ঘোর কেটে যাওয়া এবং তার মগ্নচৈতন্যে অবলীন সংরক্ত জৈব-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি ব্যঞ্জিত হয়েছে চলচ্চিত্রে সেটা আদৌ কৃতসাধ্য নয় যেহেতু, তাই সেখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু উপকরণের, ভিন্ন কিছু ঘটনার মাধ্যমে সেটা করতে হয়েছে। অতএব এসেছে চোখে অপেরা গ্লাস লাগিয়ে পাশের বাড়ির মা ও ছেলেকে দেখা, খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে পথের মানুষ-জনকে (এবং একবার বারান্দায় হেঁটে-যাওয়া ভূপতিকেও) নানান দিক দিয়ে দেখে সময় কাটানোর দৃশ্য ; অবসন্ন, শঙ্কিত-বিশুষ্ক মুখে চারুর শূন্যচোখে তাকানোর 'সেমি ক্লোজ আপ শট্‌' ; অমলের আচরণে একটু লোভী, একটু সতর্ক, একটু সন্দিগ্ধ অস্বস্তির ভাব ; এবং তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে মুহূর্তের জন্যেও এসে চারুর কান্নায় আচমকা ভেঙে-পড়া।

এখানে কয়েকটি সংকেতবহ মোটিফের ব্যবহারের কথা সত্যজিৎ নিজেই উল্লেখ করেছেন তাঁর সেই বক্তৃতায়। যেমন রুমালে ভূপতির নামের আদ্যক্ষর এমব্রয়ডারি করছে চারু : পর্দাজোড়া এই সেলাইয়ে ব্যস্ত মেয়েলি হাতদুটি নিয়ে ছবির শুরু। ছবির শেষে (সত্যজিতের ভাষায়) ভূপতি যে মুহূর্তে এক "মর্মন্তুদ আবিষ্কার" (চারুর অমলের প্রতি উচ্ছ্বসিত প্রেম), তখন তার কপালে, গালে একটু একটু করে জমে-ওঠা ঘাম মুছতে গিয়ে ঐ 'বি' লেখা রুমালটাই হাত থেকে পড়ে-যাওয়ার একটা সূক্ষ্ম-সাংকেতিক তাৎপর্য আছে, যার শুরু ঐ প্রথম দৃশ্যেই। সেকেলে একটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজছে ; ভৃত্যকে ডেকে প্রায় অকারণেই চারু বকছে ; বঙ্কিমের উপন্যাস নিয়ে ঘাটাঘাঁটি করে সে সময় কাটাচ্ছে ; এরই মধ্যে আবহ-সংগীত হিসেবে বাজছে "হাসি-কান্না, হীরা-পান্না দোলে-ভালে", তারই মধ্যে একবার ভূপতির মস্‌মস্‌ বুটের শব্দ—সব মিলিয়ে যে দৃশ্য-শ্রাব্য 'কোলাজ', ঐ সংকেতবহ মোটিফগুলি সুসংহত হয়ে উঠেছে তারই ভাবানুষঙ্গে।

ঠিক একই প্রক্রিয়ায় চারু-অমলের সম্পর্কের মধ্যে বাঙালীর মধ্যবিত্ত-সংস্কারের প্রথাসিদ্ধ দেওর-বৌদির নৈকট্য-ব্যবধানের দ্বান্দ্বিকতা অলক্ষ্যে কখন গাঢ়তর এক আবেগে রূপান্তরিত হয়ে গেছে—এমন জটিল একটি গ্রন্থির গূঢ়ৈষণাকে চলচ্চিত্রে বোঝাতে গিয়েও সত্যজিৎকে নানান দৃশ্য/শ্রাব্য উপকরণ ব্যবহার করতে হয়েছে। চারুর মনের অন্তর্বিলীন কৈশোরের বিলীয়মান সংকেতের দ্যোতনা বাগানে দোলনায় দুলতে-দুলতে তার মুখে "ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কি-বা মৃদু বায়" গানের মাধ্যমে সত্যজিৎ করেছেন। ঠিক তেমনই অমলের লঘুতা এবং আত্ম-সর্বস্বতাও "আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী" গানটির অনুষঙ্গে অত্যন্ত একটি সূক্ষ্ম দক্ষতায় তিনি দেখিয়েছেন। শেষ চরণে শব্দ পরিবর্তন করে "ওগো বৌদিমণি" বলার মধ্যে লঘুতার সেই ব্যঞ্জনা স্পষ্টতর। দোলনায়-বসা চারুর মুখটিকে কেন্দ্রে রেখে পিছনের পটভূমিটাকে দোলাচল দেখিয়েও সত্যজিৎ চারুর অন্তর্জীবনের অস্থির-প্রেক্ষিতটাকে সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। এই 'সিনেমাটিক টেকনিক' আবার লেখার মধ্যে অলভ্য ; অথচ কাহিনীর বক্ষ্যমাণ-প্রতীতি ঠিক সেইটাই। সত্যজিৎ তার মাত্রাটাকে গাঢ়তর করেছেন।

চলচ্চিত্র-নির্মাণের সময়ে এই সমস্ত মাত্রান্তরের চূড়ান্ত সাফল্য সত্যজিৎ দেখিয়েছেন শেষ দৃশ্যে। কাহিনীতে ভেঙে-যাওয়া 'নীড়'-এর যন্ত্রণা অভিব্যক্ত হয়েছে একটি মর্মান্তিক বর্ণনায় : "আরও কত বৎসর প্রত্যহ আমাকে এমনি করিয়া বাঁচিতে হইবে ! যে আশ্রয় চূর্ণ হইয়া ভাঙিয়া গেছে তাহার ভাঙা ইঁট-কাঠগুলা ফেলিয়া যাইতে পারিব না, কাঁধে করিয়া বহিয়া বেড়াইতে হইবে ?"... এই দুঃসহ, অনতিক্রম্য ব্যবধান সত্যজিৎ একটি 'ফ্রীজ্‌-শট'-এর সাহায্যে সূচিত করেছেন—চারু এবং ভূপতি পরস্পরের দিকে করুণভাবে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে,

কিন্তু ক্যামেরা রুদ্ধগতি হয়ে সেই হাত দুটিতে চিরন্তনভাবে ব্যবধানেই রেখে দিল। যে-জিজ্ঞাসা ভূপতির গল্পে একার ছিল, তাকে দুজনেরই প্রশ্ন করে তুলেছেন এভাবে সত্যজিৎ: ভাবনার গাঢ়বদ্ধতা যা রবীন্দ্রনাথ বর্ণনার মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন, ছবিতে সেটি এভাবেই অন্বিত।

৩

'নষ্টনীড'-এর তুলনায় 'ঘরে-বাইরে'-র ক্যানভাসটা অনেক বড : শুধুমাত্র অন্তর্লোকের দ্বন্দ্বটাকেই ফুটিযে তোলা নয়, সমকালের সামাজিক-রাজনৈতিক ক্রান্তিকালের প্রতিভাসও তার মধ্যে একটা খুব বড জায়গা জুড়েছে। বস্তুত, কাহিনীতে সন্দীপের উপস্থিতিও ঘটেছে তারই অনুসূত্রে। কিন্তু ঐ প্রেক্ষাপট, বিশেষত তাব অন্তর্গত রাজনৈতিক অংশটি, চলচ্চিত্রে তুলনামূলকভাবে অনেক কমই গুরুত্ব পেয়েছে। এর ফলে ছবিতে ত্রিকৌণিক দ্বন্দ্বের টানাপোডেনটা হযত বেশি তীব্র হযে উঠেছে, কিন্তু সবটা মিলিযে উপন্যাস এবং চলচ্চিত্রের ভরকেন্দ্র পৃথক হযে গেছে। সত্যজিৎ এখানে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করেছেন ঠিকই, কিন্তু তারপরে তিনি চলে গেছেন নিজস্ব-সৃষ্টির পরিমণ্ডলে।

সত্যজিতের ছবিতে বিমলা কিছুটা এবং নিখিলেশ মোটামুটিভাবে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বিশ্লেষণের সমধর্মী হলেও সন্দীপের ক্ষেত্রে সেটা ঘটে নি। তার অবচেতনার বিবেকবুদ্ধি উপন্যাসে শেষ অবধি যে-গভীর সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছে, ছবিতে সেটা দেখান নি সত্যজিৎ। উপন্যাসের সন্দীপের দ্বন্দ্ব, সিনেমায় প্রতিফলিত হয় নি। পরিণামে তাই বিমলার সঙ্গে তার দৈহিক ঘনিষ্ঠতাও অনায়াসে দেখানো সম্ভব হয়েছে সত্যজিতের পক্ষে।

ঠিক এই ব্যাপারটি নিযে সত্যজিতের কাছে সপ্রশ্ন আপত্তি যখনই তোলা হয়েছে—তখনই তিনি সেটার গুরুত্ব নিরূপণ করেছেন নিজের বিচারের তৌলদণ্ডে, রবীন্দ্র-কাহিনীর মাপকাঠিতে নয়। দু'চারজন নির্মম দর্শকের অভিমতে "Satyajit's Bimala seemed to somewhat of a sexbekitten!"—এটা কিঞ্চিৎ অতিকথন হলেও, এটাও ঠিক যে, উপন্যাসের বিমলার ভাবগত যে-বদলটা চলচ্চিত্রে ঘটেছে সেটা কিন্তু প্রায মৌলিক। নাযিকা-চরিত্রের এই ভাবগত রূপান্তর, উপন্যাসের সঙ্গে চলচ্চিত্রের তফাৎটা ব্যাপকভাবে ঘটিযে দিয়েছে।

এ কাহিনীর সাহিত্যরূপে বিমলার অন্তর্দ্বন্দ্বটা রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে ফুটিযেছেন; কিন্তু চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ সেটি একটি সুন্দর প্রতীকের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন: সন্দীপের স্বরূপ একটু-একটু করে উদ্‌ঘাটিত হতে আরম্ভ করেছে যখন বিমলার কাছে, তখন আযনার সামনে তার কান্নায় ভেঙে পডার দৃশ্যটা দারুণ ব্যঞ্জনাবহ একটি প্রতীকে পরিণত হয়েছে। পর্দার বুকে রোরুদ্যমান 'দুটি' বিমলা,

মুহূর্তের মধ্যে তার দ্বিধা হওয়া মানসিকতার প্রতিভায় ফুটিয়ে তোলে। বিমলার ক্ষেত্রে যতখানি অবধি সত্যজিৎ রবীন্দ্রনাথের মূল ভাবনার অনুসরণ করেছেন, তার মধ্যে এই দৃশ্য-উপাদানটি নিঃসন্দেহেই সেরা।

এ রকম আরেকটি প্রতীকও 'ঘরে-বাইরে'-র চলচ্চিত্র রূপায়ণে ব্যবহৃত হয়েছে। স্মৃতি হিসেবে বিমলার চুলের কাঁটাটি কোটের বুক পকেটে রেখে সন্দীপের সুখসায়র থেকে চলে যাবার দৃশ্যটিও নিঃসন্দেহে অত্যন্তই তাৎপর্যময়। মাত্র এই একটি ক্ষেত্রেই সন্দীপের চিত্রায়ণে সত্যজিৎ রবীন্দ্রাথের ভাবনার অনুবর্তী ; গোটা ছবিতে এই একবারই তাকে বিবেকপীড়িত প্রেমিকরূপে দেখা গেছে। গয়না-মোহর ইত্যাদি ফেরৎ দেবার ব্যাপারটা উপন্যাসের অনুসারী শুধুমাত্র বহিরঙ্গেই। যেখানে সন্দীপের জবানীতে রবীন্দ্রনাথ বিবেক-যন্ত্রণার একটা আভাস সৃষ্টি করেছেন, ছবিতে তার কোনও হদিশ নেই।

কাহিনীর শুরুতে-শেষে রবীন্দ্রনাথ বিমলার জবানিতে মায়ের সিঁথির সিঁদুরের স্মৃতির প্রতীকে তার বৈধব্যের সম্ভাবনা সূচিত করেছেন। ছবির শেষ দৃশ্যে তাকে বিধবার বেশে 'ক্লোজ-আপ' শটে দেখিয়ে সত্যজিৎ কোনও প্রতীকী সঙ্কেতের অবকাশ রাখেন নি। এতে ট্র্যাজিক আবেদন সরাসরি এসে পৌঁছুলেও, মূলের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাটুকু হারিয়ে গেছে যে, সেটি মানতেই হবে।

আসলে, 'ঘরে-বাইরে' যখন বই হিসেবে আমরা পড়ি, তখন এক-একবার এক-একজনের চোখ দিয়ে কাহিনীর সঞ্চরমান ঘটনাপ্রবাহকে আমরা দেখি। পক্ষান্তরে, ছবিতে সেইসব বিভিন্ন-মানসতা, বিভিন্ন-দৃষ্টিকোণকে অবলম্বন করে ভাবনাবিস্তারের কোনও অবকাশ মেলে না স্বাভাবিকভাবেই। দ্বিতীয়তঃ 'চারুলতা'/'নষ্টনীড'-কে সুনির্দিষ্ট একটা সময়কালের সীমায় বাঁধা হয়ত চলে, কিন্তু সে বাঁধনটা হবে নেহাৎই ঢিলে-ঢালা : ১৯শ শতকের শেষ দিকের যে-কোনও সময় হতে পারে এর পটভূমি। পক্ষান্তরে, 'ঘরে-বাইরে'-র সময়নির্দেশ অনেক বেশি সুনিশ্চিত : সরাসরি, সশস্ত্র সংগ্রাম-কেন্দ্রিত স্বাধীনতা-আন্দোলনের সেই সময়-কালটাই এর মধ্যে চিহ্নিত, যখন তার পাশাপাশি দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষও সামাজিক মননে বেশ খানিকটা ঢুকে গেছে।

এর ফলে 'ঘরে-বাইরে' সুনিশ্চিতভাবেই একটি 'পিরিয়ড্ স্টোরি'। এই কালসাপেক্ষতা, বইতে 'ঘরে' এবং 'বাইরে'—দু' জায়গাকেই অন্যোন্যনির্ভর করে বেঁধেছে। চলচ্চিত্রে এ-দুটো সমান্তরাল হয়ে হাজির, পারস্পরিক-অনিবার্যতা সেখানে উপন্যাসের মতন নয়। সন্দীপের ওজস্বিতা, তীব্রতা, দাবী জানানোর অকুণ্ঠ অসঙ্কোচ বিমলাকে এখানেও মোহাচ্ছন্ন করেছে ঠিকই, কিন্তু রাজনীতির অনবচ্ছিন্ন সূত্রে ছবিতে তা ঘটে নি। এখানে বারংবার আগুনের যে-মোটিফ এসেছে, একমাত্র তাকেই 'ঘর' এবং 'বাইরে', দুয়েরই মধ্যে সমানভাবে বিম্বিত হতে দেখি—কিন্তু ওটা ছাড়া আর কোনও অপরিহার্য যোগসূত্র সেখানে নেই।

সন্দীপের গলায় "বিধির বাঁধন কাটবে তুমি" গান এবং সুখসায়রের আশেপাশের গ্রামগুলির হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে নিজস্ব জোট বাঁধার ছবি, 'পিরিবডফিল্ম' হিসেবে একে উপকরণ জুগিয়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সেই পিরিয়ডের ঘটনা-পরিণামের অনুষঙ্গে এখানে ত্রিভুজ দ্বন্দ্বটা গড়ে ওঠে নি। বরং, একটা পাপবোধই এখানে বিমলাকে তাড়া করে বেড়িয়েছে ছবির শেষ দিকে।

হয়ত এমনটাই সম্ভাব্য। সুদীর্ঘ ৩৬ বছর ধরে যে কাহিনী সত্যজিৎকে "কাঁটা ফুটিয়ে এসেছে", সেটি সত্যিই ছবিতে পরিণতি পেল, তখন তাঁর নিজের মনের গভীরে জমিয়ে-রাখা অজস্র উপলব্ধি, অনুভূতি, অভীপ্সা এবং আরও অনেক কিছুই একত্রে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে; রবীন্দ্রনাথের কাহিনীটা এর ফলে 'ট্রানস্‌ক্রিয়েটেড' হয়ে গেছে আগেই। রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করেই সত্যজিৎ তাই অনায়াস-স্বাচ্ছন্দ্যে রবীন্দ্র-সৃষ্টির অভিপ্রেরণাকে অতিক্রম করে নতুন সৃষ্টির প্রেক্ষিতকে আত্মস্থ করেছেন।

৪

ছোটগল্পের ক্ষেত্রে কিন্তু সত্যজিৎ এভাবে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে অবলম্বন করে 'ট্রানস্‌ক্রিয়েট' করেন নি।

'মণিহারা' নিয়েই এই পর্বের আলোচনাটা শুরু করা যেতে পারে। সাহিত্যরূপে অতিপ্রাকৃত এক রসের যে-সংকেত কাহিনীর শেষের দিকে একটু একটু করে ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, তার ব্যঞ্জনা কতটা অলৌকিক, আর কতটা মগ্নচৈতন্যজাত 'হ্যালুসিনেশন'—সেটা সংশয়িত করেই রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ: এ-গল্পের শিল্পরূপ তাতেই ঋদ্ধিমান হয়েছে। কিন্তু ঠিক জিনিসটা চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষায় অনুবাদ করার সময় সত্যজিতের চেয়ে কম-প্রতিভাধর কোনও পরিচালক হলে হয় একটা পুরোদস্তুর ভূতের গল্প বানিয়ে ফেলতেন, কিংবা উদ্ভট একটা কিছু গড়ে তুলতেন। মূল গল্পে একটা 'জার্ক' বা ধাক্কা লাগে ফণি এবং মণির গার্হস্থ্য কাহিনীটায় হঠাৎ একটা অস্বস্তিকর-অতিলৌকিক অনুভূতি সঞ্জাত হবার ফলে। এই নাড়া দেওয়াটা, সত্যজিতের ছবিতে অনুপস্থিত, সেটাকে তিনি সযত্নে মুলতুবী রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ শেষ অবধি নিগূঢ় একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যঞ্জনা কাহিনীর পরিণামে সূচিত করেছেন তার ফলে স্বয়ং কথকই ফণিভূষণ হিসেবে হাজির হন; এবং তাঁর স্ত্রীর নাম মণিমালা নয়, নৃত্যকালী ছিল এটাও জানা যায়। অর্থাৎ সমস্ত ঘটনাই হল মনস্তত্ত্বের ভাষায় 'figments of eerie fantasy' যা মানুষের মগ্নচৈতন্য থেকে উঠে আসে। এটাকে সত্যজিৎ উপলব্ধি করিয়েছেন: সুমিষ্ট অথচ তীক্ষ্ণ সুরে "বাজে করুণ সুরে"-র মতো শ্রাব্য উপাদান কিংবা গহনা-সজ্জিত অস্থিকঙ্কালের হাতটি ঝন্ করে পর্দায় আবির্ভূত হবার মতো দৃশ্য উপকরণ ঐ স্তরের

গভীরে নিয়ে যায় শ্রোতা/দর্শকের অজ্ঞেয় অনুভূতিকে। সত্যজিৎ ভয়ের, অস্বস্তির আবহ তৈরি করেছেন, কিন্তু ভূতের গল্প করে তোলেন নি 'মণিহারা'কে; মনস্তাত্ত্বিক জটিল গ্রন্থির প্রতিভাস ঘটানোই তাঁর অভিপ্রেত ছিল। নানান বাড়ানো-কমানো সত্ত্বেও তাই তিনি রবীন্দ্র-কাহিনীর মৌল সত্তাটিকে নিটুট রেখেছেন; রাখতে চেয়েছেন, পেরেছেনও।

কিন্তু এই সবটুকু কথা মেনে নিয়েও, কিছু অসম্মত হবার মত ব্যাপার থেকেই যায়। সমস্ত ছবিটার আবহ সুর হিসেবে "বাজে করুণ সুরে" গানটির নানা অংশ, নানান সপ্তকে—অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার-সপ্তকে রণিত হয়েছে। মণিমালার মুখেও গানটা একবার শোনানো হয়েছে। এর ফলে, এর বিশেষ-সুরপ্রযুক্তির সূত্রে একটা হতাশ-হাহাকারের দ্যোতনা শ্রোতা/দর্শকের অবচেতনাকে স্পর্শ করে। তার ফলে ছবিটার মধ্যে একটা সংগোপন-ট্র্যাজেডির ভাবও এসে পড়ে নিঃসন্দেহে। বস্তুত, মূল কর্ণাটকী সুরটির মধ্যেই সে ভাবটার অবস্থিতি—রবীন্দ্রনাথ গানটিকে বাংলা করবার সময়েও যে, সেটাই বজায় রেখেছিলেন এ-গানের লিরিকই তার প্রমাণ। "হায়", "নিদারুণ বিচ্ছেদের নিশীথে" প্রভৃতি শব্দের ব্যঞ্জনা অবশ্যই নিষ্প্রয়োজন। গল্পটার অন্তর্লীন ট্র্যাজিক যে অনুভবটুকু আছে, সত্যজিৎ সেটিকেই মুখ্য বলে ধার্য করেছেন। কাহিনীর রবীন্দ্র-অভিপ্রেত মৌল সত্তাটি সত্যজিৎ তাহলে ততটা অবধি নিটুট রেখেছেন (যা ওপরে এখনি বলেছি), যতটা ঐ ট্র্যাজিক অনুভবে স্পন্দিত।

এতে আপত্তির কিছু নেই। এ স্বাধীনতা চলচ্চিত্রকারকে দিতেই হবে: স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই সেই সুদূর ১৯২৯ সালে লেখা একটি চিঠিতে তা দিয়ে গেছেন। সে-কথা এই নিবন্ধের প্রথমেই উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু, ট্র্যাজিক অনুভবের রসপ্রতীতি আচমকা থিতিয়ে যায়—ভূতের ভয় পাবার মতই এক অনির্দেশ্য আতঙ্কে স্কুল-মাস্টারকে যখন পালিয়ে যেতে দেখেন দর্শক, আর পড়ে থাকতে দেখেন তার খাতা, ছাতা এবং গাঁজার কল্‌কে! এখানে ঐ গাঁজার কলকের হাজিরাটা বোধহয় নেহাৎই অনভিপ্রেত: "বাজে করুণ সুরে"-র সবটুকু ব্যঞ্জনা এর ফলে হারিয়ে যেতেই পারে, হারিয়ে যায় অধিকাংশ দর্শকের অনুভূতি থেকে! গল্পটার মধ্যে চূড়ান্ত এক মোচড় যেভাবে রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন মণিমালিকাকে নৃত্যকালীতে পরিণত করে, তাও এখানে অপ্রাপ্ত: আর সত্যজিৎ নিজে যেমন করে রবীন্দ্র-ভাবনার একটি বিশেষ স্বরগ্রাম (ট্র্যাজেডি)-কে বেছে নিয়ে পুরো কাহিনীটা দাঁড় করালেন ছবিতে, সেটাও সহসা মিলিয়ে গেল। রসপ্রতীতির এই বাজে খরচ কিসের জন্যে যে, কেন যে—তার কোনও ব্যাখ্যা সত্যজিৎ দেন নি কোথাও।

৫

পক্ষান্তরে 'তিনকন্যা' সিরিজের যে-ছবিটি নিয়ে সত্যজিৎ প্রচুর কিছু বলেছেন, তা হল 'পোস্টমাস্টার'। 'পোস্টমাস্টার' কাহিনীতে সত্যজিৎ অবশ্য মূলের লিরিকটাকে প্রথমে রাখেন নি। ঘটনার তেমন কিছু প্রাচুর্য দেখান নি বটে, কিন্তু অনেকগুলি চরিত্র পর্দায় এনেছেন। ফলে রতন এবং পোস্টমাস্টার এরা দুজনে যে-একটা নিজস্ব-নির্জন পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকে গল্পের অনুভূতিপ্রবণ সংবেদনশীল দিকটিকে ফুটিয়ে তুলেছিল, সিনেমায় সেটা শেষ দৃশ্যের আগে অবধি গরহাজির। গল্পে ঐ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিময় বেদনাটি বাঙ্ময় রূপ অত্যন্ত বাস্তব হয়ে ব্যক্ত হয়েছে শেষ বর্ণনার ঠিক আগে: রতনের কান্না এবং বখশিস্ ফিরিয়ে দেবার চিত্রে। এটা সত্যজিৎ বাদ দিয়েছেন এবং নীরবে ম্লান, বিশীর্ণ মুখে বালতি হাতে রতনের চলে যাওয়ার ছবিটি সন্নিবিষ্ট করেছেন তার বিকল্পে। পোস্টমাস্টারের বেদনা এবং রতনের বেদনা একই সঙ্গে ব্যঞ্জিত হয়েছে দুই মূক হয়ে থাকা চরিত্রের পর্দায় উপস্থিতির মাধ্যমে। আর ঠিক তার তারই সঙ্গে, গল্পের শেষে রবীন্দ্রনাথ যে বেদনার সর্বন্ধর উপলব্ধিকে বর্ণিত করেছেন, সেটারও চকিতে দেখা মেলে সিনেমার পর্দায়। ...অনেক কিছুর বদল করেও মূলের যে ভাবপ্রতিমা শেষ অবধি সত্যজিৎ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন এখানে, সে-কথা না মেনে উপায় নেই।

এই বদল করার সপক্ষে সত্যজিৎ যে কারণগুলো দেখিয়েছেন, তা বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। তিনি লিখেছেন: "রবীন্দ্রনাথের কিছু গল্প আছে, যা অনুভূতির ক্ষেত্রে একান্তভাবেই ভিক্টোরীয় যুগের। ধরুন 'পোস্টমাস্টার' গল্পটির কথাই। এর সমাপ্তিটা...আমা। কাছে বড্ড আবেগপ্রবণ বলে মনে হয়েছে। সেটা আমার পক্ষে ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব, কেননা আমি তো বিংশ শতাব্দীর মানুষ, বিশেষ একটা পরিবেশে মানুষ হয়েছি, বিশেষ ধরণের কিছু প্রভাব আমার ওপর পড়েছে। কাজেকাজেই গল্পের পরিসমাপ্তিটা আমি ঘটালাম খানিকটা বিরসতা সৃষ্টি করে, তবে পরিণামটাকে নিজের পথেই আমি চলতে দিয়েছি। ছবিতে মেয়েটি তার বেদনাকে প্রকাশ করার বদলে বরং গোপনই করেছে।...শুধু কুয়ো থেকে জল তোলবার সময়ে তাকে আপনারা কাঁদতে দেখেছেন। কিন্তু যেই তার ডাক পড়েছে, অমনি সে চোখের জল মুছে ফেলেছে।... ১৯৬০ সালে দাঁড়িয়ে কাজ করছেন এমন একজন বিংশ শতকীয় শিল্পীর—আমার, এইটেই হল ব্যাখ্যা। গোঁড়ারা এসবে আপত্তি করবেন জানি, কিন্তু আমি এটা করেছি শিল্পী হিসেবে নিজের অনুভবকে ব্যক্ত করবার জন্যই। রবীন্দ্রনাথের গল্প আমি নিয়েছি সেটার প্রকাশমাধ্যম রূপেই; ব্যাখ্যা আমার নিজস্ব।" ['ফিল্ম আই'; অনূদিত]

এমন একটা কথা তাহলে হয়ত 'মণিহারা'-র সম্পর্কেও বুঝে নিতে হবে। কিন্তু সমস্যা একটা আছে তাতেও। 'পোস্টমাস্টার' গল্পের ক্ষেত্রে বিপরীত এক পথ দিয়ে হেঁটে এলেও, পরিণতিতে রবীন্দ্রনাথের অভীপ্সিত দিগন্তেই পৌঁছেছেন সত্যজিৎ। কিন্তু 'মণিহারা'-র ক্ষেত্রে জটিল মনস্তাত্ত্বিক গ্রন্থির প্রতিভাস এবং ট্র্যাজেডির স্পন্দন ঠিকই সৃষ্টি করেছেন তিনি রবীন্দ্রনাথকে 'ট্রানস্‌ক্রিয়েট' করে; কিন্তু খাতা এবং গাঁজার কলকের সমান্তরাল সহাবস্থান সেই নবনির্মিতির অনুভব-সংবেদ্যতাকে হঠাৎ এসে ধাক্কা মারে—যে 'জার্ক' মণিমালিকার নৃত্যকালীতে পরিণত হবার সঙ্গে আদপেই এক গোত্রবর্গের নয়। 'পোস্টমাস্টার' এবং 'মণিহারা'-র মধ্যে মূল পার্থক্যটা এখানেই। নতুন কিছু চরিত্র, ঘটনা এবং ব্যাখ্যান সংযুক্ত করা সত্ত্বেও সত্যজিৎ 'পোস্টমাস্টার' ছবিতে রবীন্দ্র-বলয়কে মান্য করেই ট্রান্‌সক্রিয়েট করেছেন : মোটামুটি তেমন কিছু না বাড়ানো সত্ত্বেও কিন্তু 'মণিহারা'-র ক্ষেত্রে ব্যাপারটা বিপ্রতীপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৬

'তিনকন্যা'-র তৃতীয় অর্থাৎ 'সমাপ্তি'-র ক্ষেত্রে সত্যজিৎ রবীন্দ্রকাহিনীর মোটামুটি মূলানুগত রূপায়ণই করে এসেছেন আগাগোড়া—একমাত্র শেষের মিলনদৃশ্যটি ছাড়া। গল্পের মৃন্ময়ীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সিনেমাতেও পুরোপুরি বজায় রয়েছে, অপূর্ব (সিনেমায়, অমূল্য)-র ক্ষেত্রেও তাই, তার মায়ের ক্ষেত্রেও। বাদ গেছে মৃন্ময়ীর স্বামীসহ বাবার কর্মস্থল কুশীগঞ্জে যাবার ব্যাপারটা। তাতে ক্ষতি হয় নি; গল্পের মূল বর্ণবিন্যাস আরও কেন্দ্রীভূত হয়েছে; শেষ দৃশ্যে, অপূর্বর বোনের বাড়ির পরিবেশের বদলে তার নিজের বাড়িতেই সমস্যার সমাপ্তি ঘটিয়েছেন যেভাবে, সে-সম্পর্কেও ঐ একই কথা। গল্পের মধ্যে মৃন্ময়ীর যে-রূপান্তরণ ঘটেছে, তার পরিপূর্ণতা সাধনের জন্য ননদ-নন্‌দাই প্রমুখের সহায়তার ব্যাপারটা সত্যজিৎ বজায় না রেখে সবটুকুই মৃন্ময়ীর নিজের ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন। 'হিউমার'—যা ছিল মূল কাহিনীর পরিসমাপ্তির অন্যতম প্রধান উপকরণ, তাকে সিরিয়াস অথচ স্নিগ্ধ একটি দ্যোতনায় রূপান্তরিত করে সত্যজিৎ প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্র-নাথের ভাবনাকে চলচ্চিত্রের ইডিয়মে সঠিকভাবেই ব্যক্ত করেছেন। বোন-ভগ্নীপতির মাধ্যমে স্ত্রীর সঙ্গে পুনর্মিলন যদি ঘটত অপূর্ব/অমূল্যর, তাহলে সেটা হয় অত্যন্ত-সিরিয়াস অথবা অত্যন্ত-হাল্‌কা ভঙ্গিতে করতে হত। যার কোনওটিই রবীন্দ্রনাথের কাহিনীতে সূচিত হয় নি। সিরিওকমিক এই ভাবটাকে সত্যজিৎ খেয়াল করেছিলেন বলেই খাবার হাতে নিয়ে ঘরে ঢোকবার মুখে মৃন্ময়ীর শাশুড়ি-ঠাকুরাণীর হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার দৃশ্যটা তিনি সংযোজন করেছেন। গল্পে

অবশ্য নেই এ ঘটনা : কিন্তু এই হতভম্বভাবটুকু জাগিয়ে তোলার আগ্রহটা একান্ত-ভাবেই ছিল তো তাঁর ; সেটা, সত্যজিৎ জাগাতে পেরেছেন সুষ্ঠুভাবেই।

'মোটিফ' ব্যবহারের যে প্রবণতা 'চারুলতা' ছবিতে খুব বেশী পরিমাণেই দেখা গেল পরবর্তীকালে, সমাপ্তি-র মধ্যেও তার প্রারম্ভিক কিছু ইঙ্গিত আছে। 'চরকি' নামে একটি কাঠবেড়ালি একটা বিশেষ প্রতীক হিসেবে নানা সময়ে হাজির হয়েছে। এই 'চরকি'-কে আসলে মৃন্ময়ীর নিজেরই অস্থির-কৈশোরের প্রতীক বলতে পারেন। হবু শাশুড়ি, তাকে একবার 'চরকি' বলে তিরস্কারও করেছেন। এই চরকিই একবার অমূল্যর 'মেয়ে-দেখা' ভণ্ডুল করে দেয় ; আবার শ্বশুরবাড়ির 'বন্দীদশা' থেকে 'পালিয়ে' মৃন্ময়ী সব আগে ঐ 'চরকি'-র কাছেই ফিরে যায়। আবার অন্তরের মধ্যে যখন সে প্রোষিতভর্তৃকার বেদনা অনুভব করছে, অর্থাৎ সে বড় হয়ে উঠছে—তার দুরন্ত, অবাধ্য কৈশোরের পরিসমাপ্তি ঘটছে, ঠিক সেই সময়েই আসে 'চরকি'-র মৃত্যুর সংবাদ। সে-খবরে তখন আর তার আগ্রহ নেই। তার 'স্বভাবের চরকি' আর 'খেলনা চরকি' এক সঙ্গেই বিদায় নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ওপর এই সংযোজনটুকু, রবীন্দ্রভাবনাকেই সার্থকভাবে ব্যক্ত করেছে নিঃসন্দেহে।

যখনই কোনও বিখ্যাত লেখা সিনেমায় রূপান্তরিত হয়, তখনই রসিক-জনেরা প্রত্যাশা এবং আশঙ্কায় দোদুল্যমান হন। বইয়ে যা আছে সিনেমায় তা হয় নি। হুবহু দেখানো হয়, লেখকের প্রতি প্রায়শই তার ফলে অবিচার ঘটবে। পরিচালকের স্বাধীনতারও একটা সীমানা রয়েছে, সেটাও ভুললে চলবে না। রবীন্দ্র-সত্যজিৎ যুগলবন্দী যখন চলচ্চিত্রের মধ্যে নিবেদিত হয়, তখন এই কথাগুলো আরও তাৎপর্যময় হয়ে উঠে, স্ব-স্ব ক্ষেত্রে দুজনের বিরাটত্বের কারণে। সত্যজিৎ চলচ্চিত্রের নিজস্ব দাবি মিটিয়েও রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির ওপর প্রায় সবসময়েই সুবিচার করেছেন। এ নিবন্ধের সেটাই মুখ্য প্রতীতি॥

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্যজিৎ রায় ঃ ফিল্ম-টেক্সট ও একজন পাঠক

ইদানীং-এর চলচ্চিত্র-তত্ত্বে ফিল্মকে একটি Specific Signifying Practice হিসাবে দেখার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় শব্দটিতে অর্থের সুসম্বদ্ধ স্পষ্ট উচ্চারণ হিসাবে চলচ্চিত্রের ভাষার স্বীকৃতি। আর প্র্যাকটিস-এ এই উচ্চারণের প্রক্রিয়া, অর্থের উৎপত্তির কাজ, কাজের মধ্যে সাবজেক্টের সম্পর্কাবলীর সমস্যার প্রসঙ্গগুলি আসে। বিশেষভাবে নির্দিষ্ট—এই বিশেষণে বিশেষ রূপবন্ধনে, নির্মাণে, আকারে চলচ্চিত্র প্র্যাকটিস কিভাবে গৃত তার বিশ্লেষণের ইঙ্গিত থাকে। সত্যজিৎ রায়ও শিল্প কথাটা গোলমেলে ভেবেছিলেন, তার জায়গায় ভাষা বললে চলচ্চিত্রের স্বরূপ আরও স্পষ্ট হয়, তর্কের অবকাশ কম থাকে। ছবি ও শব্দ নিয়ে এই ভাষা। তার প্রয়োগে মুনশীয়ানা না থাকলে, তার ব্যাকরণ রচয়িতার আয়ত্তে না এলে, সব মিলিয়ে ছবির বক্তব্যে জোর না থাকলে, সত্যজিতের মতে ভাল ছবি হয় না। সত্যজিৎ ইমেজকে বাঙ্ময় ছবি হিসাবে দেখেছেন : ছবির ছবিত্বেই ছবির শেষ ও শুরু নয়। মুখ্য ছবির অর্থ। বলাই বাহুল্য, সত্যজিৎ ফ্রান্সের রলাঁ বার্ত বা ইংলণ্ডের কলিন ম্যাকক্যাবের মত ভাবেন না। কিন্তু ঐ অর্থের ওপর গুরুত্ব দেওয়ায় Signifying-এর স্বীকৃতি তাঁর মধ্যে : বার্তের মত সত্যজিৎ নিশ্চয়ই "the death of the author" ঘোষণা করেন নি, বরঞ্চ বলেছেন, "শিল্পী আগে, তারপরে তো শিল্প। যেখানে শিল্পী নেই, সেখানে শিল্পের উপকরণ থাকলেও শিল্পের উদ্ভব সম্ভব নয়।" অথর বা শিল্পীস্রষ্টার অনন্য গুরুত্ব যিনি মানতেন তিনি বার্তের মত কখনোই বলতেন না, "Writing is the destruction of every voice, of every point of origin."

ছবির যে অর্থের কথা সত্যজিৎ বলেন, সেই অর্থ কিভাবে বিশ্লেষিত হবে? তিনি শিল্পী-ব্যক্তির ওপর যেরকম জোর দেন, তাতে তিনিই যে অর্থ নির্দিষ্ট করবেন, যদি করেন, তাহলে সেটিই চূড়ান্ত ও শেষ কথা। কিন্তু শিল্পের ইতিহাসে দেখা গেছে, এর ব্যত্যয় বারবার ঘটেছে। প্রাথমিক জেসচারে এই শিল্প—চিহ্নক ও চিহ্নের দ্বন্দ্বময় সম্পর্কে যে চিহ্নর দিকে এগিয়েছে, তার অর্থ সময় ও কালে, দেশভেদে পাল্টেছে। রলাঁ বার্তদের অথরের মৃত্যু ঘোষণা বা বালজাকের গল্পের তাঁরা যে বিনির্মাণ করেন সেই পদ্ধতি যে বাস্তব একথা মানা সম্ভব নয়, কিন্তু ঐ অথরের অর্থই একটি শৈল্পিক নির্মাণের শেষ কথা, এমন ভাবার

কোন কারণ নেই। তাৎপর্যপূর্ণ শিল্প ইতিহাসে সৃষ্ট ও ইতিহাসেই বাঁচে—এর সঙ্গে একজন ব্যক্তির নাম জড়িয়ে থাকে বটে, কিন্তু এটি একজন ব্যক্তিরই নির্মাণ নয়। তাঁর সময়, তাঁর শ্রেণী, তাঁর শৈল্পিক পরম্পরা, পরম্পরার চাপ ও তার থেকে বেরিয়ে আসার লড়াই—সব থাকে। সত্যজিতের ছবির মূল problematic বাঙালী মধ্যশ্রেণীর ইতিহাস। আলথ্যুসে যেমন বলেছিলেন, "there are different times in history", সমগ্রের বিভিন্ন স্তরের বিকাশের প্রক্রিয়াকে একই ঐতিহাসিক সময়ে ভাবা যায় না, বলেছিলেন এই বিভিন্ন ধাপ বা স্তরের একই ঐতিহাসিক অস্তিত্ব নেই, তেমনি শিল্পের, বিশেষ শিল্প-নির্মাণের অস্তিত্বও ভিন্ন কালে, ভিন্নরকম। সত্যজিৎ রায় যে শিল্প-মালা আমাদের জন্য রেখে গেছেন, তার অর্থ ভিন্ন দর্শক, অর্থাৎ তাঁর ফিল্ম-টেক্সটের ভিন্ন পাঠকের কাছে ভিন্নরকম, আবার তার অর্থ ভিন্ন সময়ে ভিন্ন : ঐ ছবিগুলি পুনরুৎপাদিত হয় নতুনভাবে, নতুন করে, ইতিহাসে। এই নতুন উৎপাদন ঘটে, যাকে এখন বলা হচ্ছে 'real readers'-এর চৈতন্যে, বিশ্লেষণের প্র্যাক্‌টিসে। এই পাঠক ইতিহাসের সাবজেক্ট বা বিষয়ী, একটি নির্দিষ্ট সমাজবাস্তবে সে বাস করে, সে একটিমাত্র টেক্সটের বিষয়ীমাত্র নয়। এই পাঠক একটি টেক্সট একইভাবে পড়ে না, পড়ে ভিন্নভাবে। সত্যজিতের ছবিও এই 'রিয়্যাল' পাঠকদের উপলব্ধি ও অনুধাবনে ইতিহাসে হাঁটবে : সত্যজিৎ প্রয়াত, কিন্তু তাঁর শিল্প-টেক্সট গতিময়, সময়ের তালে নতুন করে আবিষ্কৃত হবে।

এই সময়ের রিয়্যাল রিডার যে ইতিহাসে সম্পৃক্ত তার মধ্যে সত্যজিৎ রায়ের ছবি কোন্ বার্তা নিয়ে আসে? এই পাঠক মূলত মধ্যবিত্ত ইতিহাসে সংলগ্ন, মধ্যবিত্ত বাস্তবের ভয়াবহ চরিত্রহীন ভাঙনের মধ্যে সত্যজিতের ছবির টেক্সট কোন্ সত্যের স্বরকে স্পষ্ট করে তোলে? ১৯৫৫ থেকে ১৯৯২—এই চার দশকের কাছাকাছি সময়ে বঙ্গীয় মধ্যবিত্তের জীবনে পরপর দ্রুত এমন সব ঘটনা ঘটে গেছে, ক্ষণপ্রভা আশা ও গভীর হতাশা এমনভাবে ধ্বনিত হয়েছে, সর্বোপরি যে নৈতিক ও চারিত্রিক শূন্যতা এই শ্রেণীর চৈতন্যে মড়কের মত ছড়িয়েছে যাতে অদ্ভুত আঁধার এক সর্বব্যাপী হয়েছে। 'জলসাঘর', 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী' বা 'সদগতি' সত্ত্বেও সত্যজিৎ রায়ের ছবি প্রধানত এই মধ্যশ্রেণীকে নিয়েই। ফলে ঐ ক্রমপ্রসারিত চরিত্রহীন অন্ধকারকেই তিনি ক্রমশঃ তাঁর ছবির বিষয় করেছেন। শিল্পে যে অর্থের ওপর তিনি বিশেষ জোর দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় দু'একটি ছবি ছাড়া, তাঁর সব ছবিতেই ঐ অন্ধকার, ঐ শিকড়হীনতাকেই সামনে এনেছেন। এর প্রবল ব্যতিক্রম অবশ্যই 'অপুর সংসারে'র সমাপ্তি : কিন্তু এই ছবিতে অপু তার সামাজিক-ঐতিহাসিক পার্সোনা হারিয়ে ফেলেছে ; 'পথের পাঁচালি'র একটি বিশেষ পরিচয়ের বাস্তবে, 'অপরাজিত'র মা-ছেলের সম্পর্কে ও অপুর কলকাতা-যাত্রায় ইতিহাসের যে স্বর ধ্বনিত, 'অপুর সংসারে' তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এখানে অপু একেবারেই বিচ্ছিন্ন একজন ব্যক্তি যে স্ত্রীর মৃত্যুর শোক সহ্য করতে না পেরে শিকড়হীন হয়ে ঘুরে

বেড়ায়,অবশেষে যে পুত্রর জন্মের জন্য স্ত্রীর মৃত্যু, তার মধ্যেই ফিরে পেতে চায় তার ভালবাসাকে। সত্যজিৎ রায়ের ছবির অন্যতম বৈশিষ্ট্য কবিতাহীনতা : ব্যক্তি হিসেবেও তিনি কবিতায় নিমজ্জিত থাকতেন কিনা, তার প্রকাশ্য বিবরণ দেখি না ; যেমন থাকতেন সঙ্গীতে, চিত্রে, একসময় ফিল্ম দেখায়। 'অপুর সংসার'ই একমাত্র ছবি যেখানে সত্যজিৎ লিরিক্যাল, কবিতার স্পর্শে এ ছবির নানা মুহূর্ত স্পৃষ্ট। কিন্তু বিষয় ও বিষয়ীর খণ্ডীভবনে, শীর্ণকরণে এ কবিতাও তার শেষের প্রবহমান জীবনের স্রোতের ইঙ্গিতে ঈপ্সিত শৈল্পিক মুক্তি আসে না। মানবিক সম্পর্কের বুনন সত্যজিৎ চলচ্চিত্রের ভাষায় করেন, মানবিক উত্তাপ কিন্তু তাঁর অধিকাংশ ছবিতে সংঘাতেই তাৎপর্য পায়। সত্যজিৎ আসলে কনফ্লিক্ট বা দ্বন্দ্বর চিত্রণে, এক অন্ধকারকেই বড করে দেখান। 'মহানগরে'র সমাপ্তির যে দ্বিধান্বিত আশা, রাস্তার একটি আলোকোজ্জ্বল বাল্বের পাশাপাশি বাল্বহীন শূন্য হোল্ডার, তাতে কিছুটা শুভেচ্ছা থাকে। এত বড শহর, কত চাকরি, এখানে একজনের একটা কিছু জুটবেই— আরতির এই আশাকে জোর করে সত্যজিৎ চাপান তার সাহসী অগ্রপশ্চাৎ স্বার্থ বিবেচনাহীন প্রতিবাদ ও প্রত্যাখ্যানকে মর্যাদা দেবার জন্যই। অনেক পরে ১৯৮৯-এ 'গণশত্রু'তেও সার্বিক অন্ধকারের মধ্যেও, ডাক্তারের 'তবু আশা আছে'র বিশ্বাসও তাই সত্যজিতের শুভ ইচ্ছা মাত্র। নচেৎ বাইরে ইঁট-পাথরে ঘরের দরজা-জানলায় আঘাত লাগা, ভাঙ্গাই সত্য। এ বাস্তব। যুক্তিবাদী ও মানবিকতা-বাদী যে চৈতন্য ও প্রতিবাদের ধারা ঐ ডাক্তার বহন করছেন, তার অপমানিত, বিপর্যস্ত এমনকি নিহত হওয়াই এ বাস্তবে স্বাভাবিক। সত্যজিৎ তা জেনেও, ঐ অন্ধকার সম্পর্কে, চরিত্রহীন ভাঙ্গন সম্পর্কে অবহিত হয়েও এটা করেন, যদিও শেষে 'মহানগরে'র বাল্বের মত দ্বৈত রেখে দেন, "পবিত্র" জলের শিশি ও ডাক্তারের স্টেথিসকোপকে পাশাপাশি রেখে।

সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন, তিনি ছবিতে পুনরাবৃত্তি করেন না : এক অর্থে কোন বড শিল্পীই তা করেন না। কিন্ত একটি থিম, একটি বীক্ষা সারাজীবনের কাজে, নানামুখীনতার মধ্যেও থেকে যায় : এই বীক্ষা ভাঙ্গে, আবার গডে ওঠে। সত্যজিৎ যে বলেন, শিল্পী ছাডা শিল্প হয় না, তার অর্থ এদিক থেকেই বুঝতে হয়। এই বীক্ষায় লগ্ন থাকে ইতিহাস, সমাজ, শ্রেণী, সময়, অতীত ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন। সত্যজিতের শৈল্পিক অভিযানে যে কয়েকটি মূল মূল্যবোধ থাকে : নৈতিকতা, চরিত্র, প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক ভাবনা, তার ব্যত্যয়ই তিনি মধ্যবিত্ত ইতিহাসে দেখেন। এমনকি সামন্ততান্ত্রিক জগৎকেও তিনি যখন ধরেন, তখনও তার অবসন্ন ভেঙ্গে যাওয়া (যেমন 'জলসাঘরে') অথবা চরিত্রহীন ইতিহাস চেতনার অভাব, অবসন্নতা ও আত্মসমর্পণই দেখেছেন (যেমন 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী'তে)। ১৯৫৫ থেকে ১৯৬২ —এই আট বছর সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র-অথর জীবনের প্রথম পর্যায়, বোধ করি শ্রেষ্ঠ পর্যায়ও বটে। যে অপু-ত্রয়ীর কথা আমরা বলি, সত্যজিতের ভাবনায় তা

হয়তো প্রথমে ছিল না—'অপরাজিত'র পর তিনি 'জলসাঘর' করতে চান, সম্ভবতঃ ছবি বিশ্বাসের বার্লিন-এ পুরস্কার নিতে যাওয়ায়, ঐ ফাঁকে 'পরশপাথর' তৈরী করেন। 'অপুর সংসারে'র লিরিক্যাল ব্যতিক্রম ছাড়া এই পর্বেও কিন্তু সত্যজিৎ এক ভেঙ্গে যাওয়ার থিমকেই সামনে আনেন। 'পথের পাঁচালি'র চলচ্চিত্র টেক্সটে প্রকৃতি থাকে, কিন্তু প্রকৃতির উল্লাস কী ভয়ঙ্কর মৃত্যুকে নিয়ে আসে তাও থাকে, নির্জন প্রকৃতিতে ছোটছেলেদেব কলরবের শব্দের ছায়াতেই নিঃসঙ্গ ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যু, ঘটিটা গড়িয়ে পড়ে যাওয়া, দুই মানবকের বাস্তবের সামনে স্তম্ভিত হওয়ায় প্রকৃতির তাৎপর্যই অন্য হয়ে যায়। রেলগাড়ী দূরাগত জগতের আভাস আনে না শুধু, তাৎপর্যপূর্ণ শর্টে দেখান হয় গাড়ীর তলা দিয়ে কাশফুলগুলি কিভাবে ট্রেনের প্রচণ্ড উপস্থিতিতে নুয়ে যাচ্ছে। এ উভবলি বাস্তব : ট্রেন, চলমানতা, শিশুর স্বপ্নে, কিশোরের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় হাতছানি দেওয়া, আবার এই ট্রেন ঔপনিবেশিক শোষণের, এ দেশের অর্থনীতিকের সাম্রাজ্যবাদী বাণিজ্যকরণের মাধ্যম, ঐ প্রকৃতিকে তার বিশুদ্ধতাকে ধ্বংস করার উপায়। বিদেশী সমালোচকরা এদিকটা উপেক্ষা করেন : পুকুরের বদ্ধতাও ট্রেনের চলমানতার বৈপরীত্য নয়। ঔপনিবেশিক শাসনের সাঁড়াশিতে গ্রামীণ বাস্তবের যে বিকার আসে, তার ধাক্কায় মানুষ, যেমন হরিহরের পরিবার উৎসন্ন হয়, ট্রেন তারও বাহক। প্রায় আইজেনস্টানীয় স্মৃতিতে গ্রামের উচ্চবর্গীয় মানুষদের যে মুখগুলি সত্যজিৎ দেখান এ ছবিতে, পরে 'পোস্টমাস্টারে', তাতেই ধরা পড়ে ঐ অবসন্নতার বোধে সত্যজিৎ কেমন ঐতিহাসক ছিলেন। আর 'অপরাজিত'তে এসে সত্যজিৎ বহুমাত্রিক, বহুস্বরিক, বাখতিন যাকে বলেন পলি-ফণিক হয়ে ওঠেন : এ ছবি সর্বজয়ার। অপু পুরোহিত থাকতে চায় না, পড়তে চায়, শিক্ষার মূলধনে কেরিয়ার করতে চায়। সবজয়া ছেলের বাঁচা চায় : কোন প্রতীক, রূপকের আরোপ ছাড়াই সে হয়ে ওঠে দেশের প্রতিমূর্তি। স্বার্থপর মধ্যবিত্ত উত্থানের ইতিহাসে যথার্থ হিগেমনি সৃষ্টির ব্যর্থতায় পঙ্গু, এই শ্রেণীর "উন্নতি"র ঔপনিবেশিক তত্ত্বের তীব্র সমালোচক সত্যজিৎ : একে একেবারে নগ্ন করে দেখিয়েছেন 'সীমাবদ্ধ' ছবিতে। 'পথের পাঁচালি'র নিরুদ্দেশ যাত্রার পরেও থাকে অপরাজিতর গ্রামে প্রত্যাবর্তন : মা ও ছেলের সম্পর্কের বিন্যাসে, টানা-পোড়েনে শ্রেণীর ইতিহাসই কথা বলে। কলকাতা থেকে বাড়ী আসা অপুর সঙ্গে সর্বজয়ার সেলাই করতে করতে কথা বলা অন্য ডায়ালগ : এ প্রত্যক্ষতঃ অপুর উদ্দেশ্যে বলা, কিন্তু আসলে নিজের সঙ্গে, 'রিয়্যাল রিডার' বুঝতে পারে এ ইতিহাস ও সময়ের সঙ্গে। অসুখ হলে পড়া ছেড়ে অপু কি সর্বজয়ার কাছে আসবে, তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করাবে—এ প্রশ্নর addressivity বৃহত্তর প্রক্রিয়ার দিকে, এ শুধু অপুর কাছে জিজ্ঞাসা নয়। শিকড়হীন মধ্যশ্রেণী, তথাকথিত নবজাগরণের আলোড়নের মধ্যশ্রেণী, পঙ্গু ঔপনিবেশিক ভাবনায় তাড়িত জাতীয় আন্দোলনের মধ্যশ্রেণীর কাছে স্বদেশের জিজ্ঞাসা। অপু এ প্রশ্নই শুনতে পায় না, ঘুমিয়ে পড়ে।

সর্বজয়ার ক্লান্ত, ধ্বস্ত মূর্তিতে ধরা দেয় লক্ষ গ্রামীণ বাস্তবের বলিরেখা—সত্যজিৎ এভাবেই এক দায়বদ্ধ প্রশ্নকে সামনে আনেন। সর্বজয়ার মৃত্যু অনিবার্য : এ মৃত্যুর সময় ঐ উন্নতিকামী শ্রেণী আসে না, এ মৃত্যুর চৈতন্যই তার নেই; সত্যজিৎ ঐ মৃত্যুর পটভূমিতেই অপুর অশৌচ অবস্থায় নিরুদ্দেশ যাত্রা, ভ্রান্ত আইডেন্টিটির সন্ধান দেখান। সতর্কভাবে, নৈর্ব্যক্তিক ঐতিহাসিক বোধে ঐ অশৌচের ছবিটি নিয়ে আসেন, এ অশুদ্ধ যাত্রা, এ ইতিহাসের প্রক্রিয়াকে না বুঝে, না বুঝতে চেয়ে এক সর্বনাশের দিকে এগোন। সর্বনাশ কি হল, এটা কিন্তু সত্যজিৎ আবার দেখান তাঁর চলচ্চিত্র জীবনের তৃতীয় পর্বে : ১৯৭০ থেকে ১৯৮১-র মধ্যে। তার মধ্যে বাস্তবকে তিনি নানাভাবে ধরতে চাইলেন।

'দেবী' ও 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র মতো প্রধান ছবিতে সত্যজিৎ এটাই বলতে চাইলেন, মানুষকে মানুষ হিসাবেই গ্রহণ করতে হবে। 'দেবী'তে মাত্রাতিরিক্ত মহিমা দেবত্ব বা দেবীত্ব আরোপের ট্র্যাজেডি স্পষ্টভাবেই সত্যজিৎ দেখালেন : এর পাশাপাশি কলকাতায়-শিক্ষিত উমাপ্রসাদের ব্যর্থতা। দেবীত্বর পার্সোনা ছিন্নভিন্ন করে সেই আবছা জগতে অলঙ্কারভূষিতা দয়ামথীর মৃত্যু এবং যে দেবীত্বে সেও মোহগ্রস্ত হয়েছিল তাকে অস্বীকার, একদিকে যেমন সত্যজিতের বুদ্ধিভিত্তিক মানবিকতাবাদী দীক্ষার প্রকাশ, অন্যদিকে উমাপ্রসাদের অসহায় 'দয়া দয়া' ডাকে সমগ্র মধ্যবিত্ত জাগরণের পঙ্গুত্ব-ব্যর্থতাই ধ্বনিত। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'তেও যে চাপ কেটে যাওয়ার, এক স্বৈরাচারী কর্তৃত্বের ভেঙ্গে যাওয়ার চিত্রবাণী দেখি, তাতেও এই সংশয় থেকে যায়, সমতলে, দৈনন্দিন জীবনপ্রবাহে এটা অটুট থাকবে তো? ঐ মধ্যবিত্ত যুবকটির সঙ্গে মণীষার আর কি দেখা হবে—না কী এ 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র কল্পস্বর্গ? পরবাস ও সংশয় ভেঙ্গে নিজ নিজ সত্তার যে উন্মোচন ঘটল, আর সে উন্মোচনেই যেন প্রকৃতিও মুক্তি পায়, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র চূড়ায় আলোর হাসি জাগে, তা তো কল্পনার ঐ বিশেষ স্থান-কালের। 'দেবী'তে যে কুসংস্কারকে সত্যজিৎ আক্রমণ করেন, তারই আরেকপিঠ 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র বাবার কুসংস্কার : উভয়েই স্বৈরতন্ত্রী মনের, ছবি বিশ্বাসের চিত্রকল্পে যা প্রবলভাবে ধরা দেয়। সত্যজিৎ দেখান, পরম্পরাগত সমাজেই নয়, তথাকথিত আধুনিক বৃটিশ-অনুসারী সমাজেও একই অন্ধকার : কুসংস্কারের বাইরের চেহারাটা পৃথক, কিন্তু মূলে তারা একই। কালীকিঙ্কর দয়াময়ীতে দেবীকে দেখে, আর 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য় বৃটিশভক্তি-অর্থ-স্ট্যাটাসজনিত অহংকারই 'দেবী'। ইতিমধ্যে 'পরশপাথরে' মজা-হাসি ও কারুণ্যের মধ্যদিয়ে মধ্যবিত্তর অর্থলোভ, বড়লোক হবার বাসনাকে ব্যঙ্গ করেন সত্যজিৎ; ককটেল পার্টিতে চাবুক মারেন—তুলসী চক্রবর্তীর অনবদ্য অভিনয়ে এই ব্যঙ্গ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অর্থাৎ মধ্যবিত্ত ইতিহাসের অন্ধকারকে সত্যজিৎ তাঁর প্রথম পর্যায় থেকেই আনছেন : তবে এই আনার মধ্যেও ১৯৪৭-এর পরের পনেরো বছরের উজ্জীবনের ভ্রান্ত আশার পরিমণ্ডল থাকাতে, এ অন্ধকার তাঁর তৃতীয় ও চতুর্থ

পর্যায়ের মত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশাজড়িত নয়—মানবিক একটা পুনরুজ্জীবনের অন্তঃস্রোত তাঁর উনভাষিতায় থেকে যায়।

১৯৬২ থেকে '৬৮-র মধ্যে সত্যজিৎ, এমন কয়েকটি ছবি করেন, যা মূলত নারীর দিক থেকে : '৬২-র 'অভিযানে' সত্যজিৎ 'ম্যাসকুলিন' নায়কের উপস্থাপনা করেন, ঐ একবারই করেন, তারপর 'মহানগর' থেকে পরপর নারীকে কেন্দ্র করে ছবি। নারীর প্রেমের সমস্যাই মূলত চিত্রিত, ব্যতিক্রম 'মহানগর'। চাকুরি, আর্থিক-স্বাধীনতা নারীর ক্ষেত্রে এসব প্রশ্ন একবারই সত্যজিৎ ছুঁয়েছেন এই ছবিতে। এসব ছবিগুলি দেখায় নারীর প্রেমের, ব্যক্তিত্বের প্রবল প্রকাশের সামনে পুরুষের দ্বিধা, দুর্বলতা : দৃপ্ত পুরুষচরিত্র 'অভিযান'-এ এক পাই আমরা, আর জলসাঘর-কাঞ্চনজঙ্ঘা-দেবীতে, ছবি বিশ্বাসে। সৌমিত্র অভিনীত অধিকাংশ চরিত্রই পুরুষের প্রবল ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত নয় (প্রতিভার বিনোদন ফেলুদার প্রসঙ্গ আসছে না।), একমাত্র 'গণশত্রু'র ডাক্তার এবং 'শাখাপ্রশাখা'র ঐ স্মৃতিভ্রষ্ট যুবক। '৬২-'৬৮-র দ্বিতীয় পর্যায়ে নায়ক-চিড়িয়াখানায় বোঝা যাচ্ছিল শিল্পী হিসাবে সত্যজিৎ এক সংকটের মধ্যে : যদিও এই পর্যায়ে তাঁর অন্যতম মেজর ছবি ১৫ মিনিটের 'টু' নির্মিত; 'তিনকন্যা'র রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উদযাপনের ৫৬ মিনিটের ছবি 'পোস্টমাস্টারে'র মতই এই ছবিটাও দেখায়, বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর বিশালতা কেমন আসে। সত্যজিৎ তো এটাই ভারতীয় প্রতিভার লক্ষণ বলেও মনে করতেন।

১৯৬৮-র 'গুপী গাইন'-এ বোঝা গেল প্রাণবান ও গতিময় শিল্পীর মতই সত্যজিৎ তাঁর সংকট পেরিয়ে যাচ্ছেন। '৬৭'-৭১-এর রাজনৈতিক বসন্তগর্জন, তার আগে ভোটভিত্তিক '৬৭-র নড়াচড়া এই দায়বদ্ধ শিল্পীর উত্তরণে সাহায্য করেছিল কি? ১৯৮১ পর্যন্ত আবার এক সৃষ্টিময় পর্যায় : সৃষ্টিময়তার স্রোতস্বিনীতে 'সোনারকেল্লা'-ফেলুনাথের প্রতিভার অবসার যাপনও ধাক্কা দেয় না। আর এই পর্যায়েই সত্যজিৎ যেমন আমাদের বাস্তবের অন্ধকারের শব ব্যবচ্ছেদ করলেন নিরাসক্তভাবে, চরিত্রহীন যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে তাকে হাজির করলেন, শ্রেণীগত নৈতিক অধঃপতনকে নগ্ন করে দিলেন, তেমনি সত্তরের আলোড়নে, স্বপ্নময়তায় এর কাউন্টার পয়েন্ট হিসাবে তার থেকে মুক্তির একটা পথ, রাজনৈতিক পথের কথাও বললেন। কিন্তু তাঁর শেষ দশকে অর্থাৎ চতুর্থ পর্যায়ে ঐ অন্ধকারই প্রবল হয়ে উঠল : যে অভ্যুত্থানের স্বপ্নে অন্ধকার কাটানোর কথা তিনি ভেবে-ছিলেন, তা আর বাস্তবে নেই। অন্ধকারকে চিনিয়ে দেওয়াটাই তখন বড় কাজ : দায়বদ্ধ শিল্পীর বার্তা।

রিয়্যাল রীডার ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৭তে এসে, ইতিহাসের ঝাপটায় সত্যজিতের ছবিতে যা আবিষ্কার করে, সাবজেক্টকে যেভাবে দেখে তাতে হয়তো অথরের দৃষ্টিকোণ থাকে না : অথরের মৃত্যু ঘটে হয়তো। তার মনে হয়,

'অপরাজিত'তে যে অপু অশৌচ অবস্থায় চলে যায়, তাকে আবার এই রীডার খুঁজে পায় কলকাতায় : সিদ্ধার্থের মধ্যে। যে শিক্ষায় অপরাজিত হতে অপু গিয়েছিল, তার ব্যর্থতা, তাৎপর্যহীনতাই সিদ্ধার্থর নিষ্পাপ মুখে স্পষ্ট হয়। সত্যজিতের দৃষ্টি-ভঙ্গীও পাল্টেছে : 'অপরাজিত'তে পিতার মৃত্যুতে পাখীর উড়ে যাওয়ার ব্যঞ্জনায় তাঁর ছবির বিরল যে কবিতার মুহূর্ত আসে, তা উধাও ১৯৭০-এর সিদ্ধার্থর মৃত্যুতে : নেগেটিভে বাবার মৃত্যু, শবদেহ ঘরের বাইরে আনা হচ্ছে, নিষ্ক্রিয় হতাশ মায়ের বুকফাটা কান্না। ইতিহাসের বোধে সত্যজিৎ দেখান অপুর শিক্ষার সুযোগ এ বাস্তবে চাকরি, শুধু চাকরি : মধ্যবিত্তর সামনে এ পঙ্গুতা সাতচল্লিশ-উত্তর পর্বেও অবাধ, যে শিল্পায়ন, অর্থনৈতিক বিপ্লবে এই বদ্ধতা কাটে, সত্যজিৎ সেই পুনরু-জ্জীবন যে ঔপনিবেশিক ও সাতচল্লিশ-উত্তর পরোক্ষ-উপনিবেশে অনুপস্থিত, এই সত্যকে ধরে নিয়েই এগিয়েছেন। তাই সংকটটা তিনি চাকুরি-নির্ভর করে দেখান। ব্যবস্থাটা কত নির্মম ও হাস্যকর ইণ্টারভিয়্যুর দৃশ্যতে দেখিয়ে দেন : একদা চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্র সিদ্ধার্থর চোখে সব কঙ্কাল মনে হয়। মানুষের এই কঙ্কাল হয়ে যাওয়াই, এই বাস্তবের বদ্ধ চরিত্রহীন অন্ধকারে সত্যজিৎ দেখান। তবু এ ছবির শেষে পাখীর শিসের শব্দে দ্বৈত অর্থ ধরে রাখেন, কিন্তু ১৯৭৫-এর 'জনঅরণ্যে' অন্ধকারকে চূড়ান্ত করে তোলেন। সোমনাথের মুখচ্ছবিতেও অপুর শুদ্ধতা। শিক্ষার চরম অবনমন ও নৈরাজ্য দেখিয়ে ঐ নিষ্পাপ যুবকটিকে সত্যজিৎ ছুঁড়ে দেন অন্য জগতে : ইতিমধ্যে 'সীমাবদ্ধে' মধ্যবিত্তর চাকুরিগত কেরিয়ারের সফলতার পেছনে কুৎসিত প্রক্রিয়াটিও উপস্থিত করেছেন। সোমনাথ অর্থাৎ আরেক অপু ব্যবসার জগতে সংলগ্ন : অর্ডার-সাপ্লায়ার হতে চায়। বন্ধুর বোনকে ভেট দিয়ে এটা পেতে হয় : 'অপরাজিত'র কলকাতা-যাত্রা এভাবেই এক অন্ধকারে, অনৈতিক পরিণতিতে আসে। 'জনঅরণ্যে'র বাবা—এ ছবির সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ চরিত্রটি বলেছিলেন, এ সময়ে ছেলেদের সামনে হয় বিপ্লব, নয় নষ্ট হওয়া, এর বাইরে আর কিছু নেই। সত্যজিৎ সিদ্ধার্থ বা সোমনাথকে বাছেন, কারণ তারা ঐ অপুর মত শিক্ষার মূলধনে বাঁচতে চায়, সিদ্ধার্থর ভাই এ ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে, ঐ সাহসের শরিক সিদ্ধার্থ-সোমনাথ নয়। এ ব্যবস্থাতেই তাঁরা বাঁচতে চায় : সত্যজিৎ দেখান এ বাঁচা কত কুৎসিত, কত অনৈতিক। 'মহানগরে'র আরতির পাশাপাশি সিদ্ধার্থর বোন বা সোমনাথের বন্ধুর বোনকে যদি রাখা যায়, তাহলে বোঝা যায় আরতির স্বাধীন অর্থনৈতিক জীবন ও দৃপ্ত প্রতিবাদ আর নেই, শরীর বেচে, অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে এ মেয়েরা অর্থ উপার্জান করতে চায়, আর সে বিষয়ে তারা অকপট, দ্বিধাহীন। চারুলতা বা করুণার প্রেমের সংকট-সত্তা নয়, শরীরীমাধ্যমে বাঁচার আকাঙ্ক্ষাই কেবল থাকে। এ জগতে রবীন্দ্রনাথের গানের এস্থেটিক শুদ্ধতা—ছায়া ঘনাবার বনে বনে ছড়িয়ে যাওয়ার আকাশ চাপা পড়ে যায় : সোমনাথ অর্ডার পাবার সফলতায় ছায়ার জগতে ঢোকে, তাঁর মানবিক

সত্তা ভ্রষ্ট। নৈতিক উচ্চারণে বিচলিত বাবা হাতজোড় করে একে স্বাগত জানানোর মধ্যে সমগ্র মধ্যবিত্ত ইতিহাসের ক্রমপ্রসারমান অদ্ভুত অন্ধকার বুকচাপা বদ্ধতা নিয়ে উঠে আসে।

১৯৬৮ ও ১৯৮০-৮১তে এই অন্ধকারের বিরোধী শক্তির কথা সত্যজিৎ বলেছিলেন। 'গুপী গাইন বাঘা বাইনে'র আকাঁড়া মানুষের প্রত্ন-প্রতিমায় ফেরার যে ইঙ্গিত তিনি দেন, তা আজকের সংকটে বিশেষ প্রাসঙ্গিক : মার্কস যেমন বলেছিলেন মানুষের কাছেই ফিরতে হবে, সত্যজিৎও ঐ মানুষের কাছেই ফিরতে বলেন। আর ফিরতে বলাটা আরও অন্যমাত্রিক হয়ে ওঠে, ১৯৮০-র 'হীরকরাজার দেশে'তে। ঐ দুটি আদি মানবের প্রত্ন-প্রতিমাকে সামনে রেখেই এক শ্রেণীজোটের অভ্যুত্থানের কথা বলেন তিনি। রূপকথার খোলশ ছিঁড়ে অ্যালিগরিতে যান : পাহাড় থেকে নেতৃত্ব দেওয়া, ছাত্র-শ্রমিকের জোট, সামরিক বাহিনীকে অকেজো করা—এসবের মধ্যেই একটা রাজনৈতিক কর্ম-পরিকল্পনাই পাওয়া যায়। 'গুপী গাইনে'ই যে ক্ষুধা ও ক্ষুধার্তর কথা বলেছিলেন, ১৯৮০-তে তা দূর করতে, স্বৈরাচারী অত্যাচার ভাঙ্গার জন্য এক জোটবদ্ধ দড়ি ধরে মার টানের ডাক দেন, যাতে রাজা খান খান হয়। পিতৃতান্ত্রিক স্বৈরাচার তাঁর প্রথম পর্যায়ের ছবিতে দেখেছি, এখন রাজনৈতিক তথা অর্থ নৈতিক স্বৈরাচার। ১৯৮১-তেই এর এক জাতিবর্ণভিত্তিক শোষণ ও তার বিরুদ্ধে জলন্ত কুঠারের প্রসঙ্গ আনেন। মধ্যবিত্ত চরিত্রহীন অন্ধকারের বিপরীতে এই শক্তিসমূহের, শ্রেণী ও বর্ণগত অভ্যুত্থানের স্বপ্ন তিনি ১৯৮০-৮১র মুহূর্তে দেখেছেন।

কিন্তু তাঁর জীবনের শেষ দশকে, চলচ্চিত্র-জীবনের চতুর্থ পর্যায়ে এই স্বপ্ন অন্ধকারে মিলিয়ে যায় : 'জনঅরণ্য'র চরিত্রহীন অন্ধকারকেই তিনি আরও ভয়াবহভাবে চেপে বসতে দেখেন। 'চারুলতা'র তীব্র প্রেমের জায়গায়, সত্যজিৎ এ পর্যায়ে ধরেন 'ঘরে বাইরে'র ট্র্যাজেডিকে, যাতে সবই খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে। সমাপ্তিতে উপন্যাসের দ্ব্যর্থকতা আর থাকে না, বিমলার বৈধব্যের মধ্যদিয়ে এক সর্বনাশের কথাই স্পষ্ট ঘোষিত হয়—এ ছবি সম্পর্কে সত্যজিৎ যে বলেছিলেন, "You know everything is going to fall apart." সেটাই তিনি তাঁর চতুষ্পার্শ্বের বাস্তবে দেখেছিলেন। সৎ মানবিক যুক্তিবাদীর কি ভয়াবহ অবস্থা হয় এই বাস্তবে, সেটা বোঝাবার জন্যই কি বিদেশী উৎসে গেলেন—ইবসেনের নাটকে ? ইঁটে-পাথরে বিপর্যস্ত এই মানুষটির গৃহ তো বাইরেরই প্রতিরূপ : নেহাতই একটা শুভেচ্ছার আরোপে শেষের 'আশা আছে'র উক্তি। আশা যে নেই, তা সত্যজিৎও জানতেন : 'শাখা-প্রশাখা'য় ঐ নৈরাশ্যের বিষাদই ঘনিয়ে এল। তিনি গোটা যুগটাকেই চিহ্নিত করলেন নৈতিক অধঃপতনের যুগ হিসাবে। এ বাস্তবে দুর্নীতি কেবলই মাথা তুলছে, আর লোকে তাতে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ সমগ্র System-টাই দুর্নীতিগ্রস্থ। তাঁর মনে হয়েছে, "রাস্কেলরাই এখন জীবনে সাফল্য লাভ

করছে।" এক অতলান্ত অন্ধকারের সামনে রিয়্যাল রীডারকে দাঁড় করিয়ে দেন : এমনকি যে ভাই দুর্নীতি সহ্য করে চাকরি ছাড়ছে, সেও নৈতিকতা দেখালেও, কোনো লড়াই না করেই পালিয়ে যাচ্ছে। 'শাখা-প্রশাখা'য় অপ্রকৃতিস্থই একমাত্র শুদ্ধ। 'অপরাজিতে' অপু, 'জনঅরণ্যে' সোমনাথের ছায়ায়, অন্ধকারে হারিয়ে যাবার পর, সত্যজিৎ ঐ অপ্রকৃতিস্থর মধ্যেই পেতে চান শুদ্ধতাকে। প্রায় ভ্রষ্টস্মৃতির অন্ধকারে এই যুবক সেই অন্ধকারকে পায়, যা আলোর অধিক। সেই বলেছিল, দেশে ফিরে বাবার কাছে থাকবে : "কাজ" শব্দটি প্রশান্ত এই যুবকের উচ্চারণে নানাভাবে আসে। তার ভাইয়েরা সবাই "কাজ" করে, এ যেন এক ব্যঙ্গোক্তি, সে কাজ করে না। চোখের সামনে দেখে, বটগাছে বাজ পড়ে। সঙ্গীতে সে বাঁচে—আজকের মানুষ কোথায় নেমেছে? প্রশান্ত বলে—'জানি! জানি! জানি! অমাবস্যা, অন্ধকূপ! কালো! Black—Black—Black—Black!" এই অন্ধকূপের অন্ধকারের সামনেই এসে দাঁড়াতে হয় : সত্যজিৎ এই বার্তাই পাঠান, অন্ধকার গ্রাস করছে, বটগাছ ঝলসে যাচ্ছে। অন্ধকারকে চিনিয়ে দিয়ে, তার নিজের মত ব্যবচ্ছেদ করে দায়বদ্ধ শিল্পীর মতই তিনি এক বৈপ্লবিক কাজ করেন : যে মড়ক চৈতন্যকে ধ্বংস করছে, তার বিরুদ্ধেই তাঁর আহ্বান—যে দু'রকম টাকার কথা, এক নম্বরি ও দু'নম্বরি, বাবা প্রশান্তকে ছবির প্রথমে জানান, সেটাই তিনি শোনেন নিষ্পাপ পৌত্রের কণ্ঠে, শেষে। সমগ্র ছবিতে ঐ নৈতিকতার মৃত্যুটাই দেখানো হয় : দূরাগত স্বর শিশুর, ভবিষ্যতের : "আমার দু'নম্বরি আছে—এক নম্বরি আছে—আমি শুনেছি।" আর্তনাদে, সততাই কাজের মন্ত্রধ্বনির মানুষ বাবা কেঁপে যান : এসব পেরিয়েই প্রশান্তর শুদ্ধ জগতের ডাক, বাবা, উদ্ভাসিত দৃষ্টি। বাবা তাকেই অবলম্বন করে বাঁচতে চান, শান্তি, শান্তি, শান্তি। রিয়াল রীডার 'অপরাজিত'র অপুকেই প্রশান্তর মধ্যে পেতে চায়—পাবে কি? মধ্যবিত্ত ইতিহাসকে বিস্মরণে ছুঁড়ে ফেলা কি সম্ভব হবে?

আমাদের ব্যাখ্যায় হয়তো ছায়া ফেলেন জাক দেরিদা : একটি টেক্সট কেমন-ভাবে অথর/রাইটার-এর সচেতন ইচ্ছাকে উল্টে দেয়, সেটা এই বিশ্লেষণে সত্যজিৎ রায়ের ছবির সূত্রে বলার চেষ্টা আছে। সত্যজিৎ যে বলতেন, তিনি কখনও নিজেকে পুনরাবৃত্ত করেন নি, নানারকম বিন্দু থেকে এগিয়েছেন, তাতেও হয়তো পাওয়া যায় স্ট্রাকচারের কেন্দ্রবিন্দুর সংগঠন ক্রিয়া নয়, তার অবাধ স্বাধীন ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত। আমরা সত্যজিতের ছবির "বর্তমানে" অতীত ও ভবিষ্যতের চিহ্ন দেখি : আবিষ্কার করতে চাই সেই অনুপস্থিতকে, যা তাঁর ছবির উপস্থিতে প্রচ্ছন্ন আছে। মিখাইল বাখতিন, একেবারে ভিন্ন প্রস্থান থেকে প্রায় এক সিদ্ধান্তে পৌঁছান : **"the utterance is also on the border between what is said and what is not said"**…বাখতিন বিশেষজ্ঞ এভাবেই বলেন। সত্যজিতের অন্ধকারের ব্যবচ্ছেদে যে বিনির্মাণ থাকে, মধ্যবিত্ত ইতিহাস, তথাকথিত বঙ্গীয় রেনেসাঁস

এ সবকেই যে উল্টে দেন তার অর্থ নৈতিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে যে গ্রহণ করতে চান না, সেটা স্পষ্টভাবে, প্রত্যক্ষত বলার প্রযোজন বোধ করেন না, কারণ সামাজিক ঘটনা হিসাবে তাঁর ছবির utterance নির্মিত হয় এমনভাবে যাতে ধরেই নেওয়া হয় একটি বিশেষ কমিউনিটি এসব ভাবে : ১৯৬৭ পরবর্তী সময়ে এই ক্রিটিক মধ্যশ্রেণীর এক অংশে প্রবলভাবে নির্মিত, ১৯৪০-এর দশকেও এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কথিত ও অ-কথিত যুগপৎ সে কারণেই, তাঁর ছবির প্রত্যক্ষ উচ্চারণ যে সামাজিক অবস্থায় এটা উচ্চারিত তার সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত হয়। তাঁর ছবির intonation, "pumps energy from a life situation in to verbal discourse" ত্রিশ-চল্লিশ দশকের অতীত ও তার স্বপ্ন, '৬৭ উত্তর স্বপ্ন ও বর্তমান, সত্যজিতের বর্তমানের ব্যবচ্ছেদে থেকে যায়—আর এ কারণেই তাঁর ছবি চরিত্রহীন অন্ধকারকে প্রত্যক্ষত বিশ্লেষণ করলেও, এক অ-কথিত স্বপ্ন, উজ্জীবনের মায়ায় মানবিক থাকেই।*

---

* আলোচনাটি যখন লিখিত হয়, তখন 'আগন্তুক' মুক্তি পায় নি : তাই 'আগন্তুকে'র সভ্যতাগত প্রশ্নর বিবেচনা এখানে নেই। তবে মধ্যবিত্ত অন্ধকারকেই চাবকান হয়েছে এখানেও— আদি-উৎসে, সেই অকপট Savage-mind-কে অন্বিত করায় হয়তো মুক্তি, এমন কথাই বলা যায়।

অনিল চট্টোপাধ্যায়

চিত্রনাট্য রচনায় সত্যজিৎ

সত্যজিৎ মনে করতেন বাংলা ছবির দুর্বলতার মূলে আছে ভালো চিত্রনাট্য লেখার অভাব। ভালো চিত্রনাট্য না থাকায় তিনি নিজেই চিত্রনাট্য লেখার সিদ্ধান্ত নেন। উনি বিশ্বাস করতেন চিত্রনাট্যটা পরিচালকদেরই করা দরকার। যদিও পৃথিবীর বড়ো বড়ো পরিচালকদের অনেকেই নিজেরা চিত্রনাট্য লিখতেন না। পরিচালক চলচ্চিত্রায়িত করার জন্য প্রথমেই নির্বাচিত গল্প থেকে কাহিনী নিয়ে ছবির উপযোগী একটা গল্প বানান। চিত্রনাট্যে সাহিত্যের গল্প থেকে কিছুটা সরে আসতেই হয়। নতুন ভিন্ন মাধ্যমে সাহিত্যের কিছুটা পরিবর্তন ঘটতেই পারে। সেটা মোটেও দোষের নয়। বরং অনেক সময়ই তা হয়ে ওঠে একান্ত প্রযোজনীয়। প্রথমে ছবি তৈরীর ব্যাপারে একটা খসড়া করা হয়। সেটা Final নয়। ঐটাকে তারপর বাড়ানো হয়। তাতে সংলাপ বসিয়ে একটা কিউ ধরিয়ে দেওয়া হয়। তার পরের পর্যায়ে ক্যামেরা মুভমেণ্ট কি হবে, আর্টিস্টরা কি করবে, না করবে, সেট্‌টা কি ধরণের তৈরী হবে, লোকেশনে কোন্ সময় বা কোন্ বিশেষ সময়ে (শীত বা গ্রীষ্ম), কখন শ্যুটিং হবে, সূর্যের আলো কতক্ষণ পাওয়া যাবে—এসব চিন্তা-ভাবনা করা হয়। ফলে চিত্রনাট্যটা তখন অত্যন্ত ইলাবরেট হয়ে শেষ পর্যন্ত শ্যুটিং স্ক্রিপ্ট হয়ে যায়। ঐ স্ক্রিপ্ট থেকে সম্পাদনার কাজ পর্যন্ত পরিচালক-মশাই নিজেই করেন। ঐ স্ক্রিপ্ট থেকেই আর্ট-ডিরেক্টরকে বলা হয় কি-কি দরকার। অর্থাৎ সেট্-টা কেমন হবে। লোকেশনে কি কি জিনিস নিয়ে যেতে হবে ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। সত্যজিৎবাবু তখন 'জলসাঘর'-এর জন্য জমিদারবাড়ী খুঁজছেন। পছন্দমতো বাড়ী পাচ্ছেন না। একটা চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, পছন্দমতো একটা জমিদারবাড়ী পাওয়া গেল না। মুশকিল হলো। কোথায় যে পাওয়া যাবে? এমন সময় এক ভদ্রলোক ঐ দোকানেই চা খাচ্ছিলেন, তিনি বললেন—আপনি নিমতিতার জমিদারবাড়ী দেখেছেন? একবার দেখে আসতে পারেন। তখন সত্যজিৎবাবু সেই বাড়ীটা দেখতে যান। দেখে তো মহা খুশী। শেষ পর্যন্ত সেখানেই শ্যুটিং হয়।

চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে শ্যুটিং-স্ক্রিপ্টটাই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। গল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেক সময় গল্পের সামান্য আবেদন বা ইঙ্গিতকে ভিত্তি করেই পরিচালক একটা পূর্ণাঙ্গ দৃশ্য তৈরী করে ফেলেন। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি, রবীন্দ্র-

নাথের 'নষ্টনীড়'-এর কয়েকটা জায়গা সত্যজিৎবাবুকে ভীষণভাবে ইমপ্রেস করেছিল। সেটা হচ্ছে চারুর নিঃসঙ্গতা। একটা অতোবড়ো বাড়ীতে সে একা একা থাকে। স্বামী সর্বদা নিজের কাজে সময় কাটায়। তার নিঃসঙ্গতা, স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং এর মাঝখানে অমল এসে যাওয়া—এই তিনটে ব্যাপারের গভীরতা ও জটিলতা সত্যজিৎবাবুর কাছে বিশেষ একটা আবেদন সৃষ্টি করে। আর সেই কারণে উনি 'নষ্টনীড়' নির্বাচন করেন, তা করতে গিয়ে উনি গল্পের নানারকম পরিবর্তন করেছেন, করতে হয়েছে। এটা কিন্তু মেনে নেওয়াই ভালো। পৃথিবীময় দেখা গেছে, মহৎ সাহিত্য যখন রূপান্তরিত হয়েছে চলচ্চিত্রে, তখন এ ধরণের অদল-বদল করাটা একেবারে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। তা না হলে সত্যিকথা বলতে কি, রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়'কে উনি বেছে নেবেনই বা কেন? কেননা ঐ মেটিরিয়ালসগুলো ওঁর দরকার। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রতি পূর্ণমাত্রায় শ্রদ্ধাশীল থেকেই উনি 'চারুলতা' করেছেন বলেই আমার মত। 'নষ্টনীড়ে' রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ বাইশ পাতা ধরে চারুর নিঃসঙ্গতা বর্ণনা করেছেন। চারুর নিঃসঙ্গতা দেখাবার জন্য সত্যজিৎ কিন্তু চলচ্চিত্রে সময় নিয়েছেন মাত্র ৫/৬ মিনিট। চারু তার নিঃসঙ্গতা কাটাতে সর্বদা নিজেকে ব্যস্ত রাখে। কিভাবে? —সে রাস্তা দিয়ে কে যাচ্ছে দেখবার চেষ্টা করে। একা একা ঘুরে বেড়ায়। গুনগুন করে গান গায়। এমব্রয়ডারীর কাজ করে ইত্যাদি। এই যে সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্রে transformation, সেখানে এইগুলো করার সুযোগ-সুবিধা আছে। আবার এমনও দেখা যায়, অনেকসময় চলচ্চিত্রের ভাষায় বাক্‌সংযমী হয়ে কিছু express করতে গিয়ে অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। শ্যুটিং-এর সময় সত্যজিৎবাবুও মাঝে মাঝে এটা উপলব্ধি করেছেন। তেমন তেমন ক্ষেত্রে তিনি দু'চারটি কথা বসিয়ে দিয়েছেন। তা না হলে হয়তো দর্শক অঙ্গভঙ্গি বা বিশেষ expression থেকে গোটা ব্যাপারটা বুঝতে পারবে না। অথচ সেই গোটা ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সেখানে তিনি সংলাপের আশ্রয় নিয়েছেন। প্রয়োজনে দু'চারটে কথা নিজেই লিখে দিয়েছেন। শ্যুটিং-স্ক্রিপ্ট-এর আগে পর্যন্ত কিন্তু পুরো ডায়ালগ লেখা হয় না। মোটামুটি ঠিক করা থাকে এই ধরণের কথাবার্তা বলবে চরিত্রগুলো। কিন্তু শ্যুটিং-স্ক্রিপ্ট-এ সত্যিই কি বলবে বা কতখানি বলবে ইত্যাদি সমস্ত লেখা হয়। আর তাছাড়া উনি ছবি আঁকতে পারতেন বলে প্রতিটা ফ্রেম-এর ছবিও এঁকে ফেলতেন, তারপর ক্যামেরা movement যা হবে তা arrow মত করে ক্যামেরাকে এই frame থেকে ওই frame-এ নিয়ে যাওয়া হ'ত। তারপরে final একটা frame—সেটাও সত্যজিৎবাবু এঁকে রাখতেন তাঁর চিত্রনাট্যে, যে ঐরকম একটা composition-এ দৃশ্যটি শেষ হবে।

আবার অনেক সময় দেখা গেছে সত্যজিৎবাবু চিত্রনাট্যের Margin-এ Musical notes-ও রেখেছেন। অনেক সময়ই থাকতো রবীন্দ্রসঙ্গীত। গান

হিসেবে নয়, সেটা আমরা পাবো বাজনা শুনে। একটা বিশেষ মুহূর্তে। তারও নোট করা থাকতো ওঁর চিত্রনাট্যে। এইভাবে উনি শট্ টেকিং করতেন। একটু বেশি সময় যদি কখনো চরিত্র বা আসবাবপত্রকে ধরে রাখতে হয়, তখন হয়তো ঐ সংগীতটা সেখানে কাজে লাগাতেন। অন্যান্য পরিচালকদের ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায় যে, চিত্রনাট্য শেষ হয়ে যাবার পরই তারা সঙ্গীত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন। কিন্তু আমরা সকলেই জানি সত্যজিৎবাবুর সঙ্গীতের ওপর একটা বিশেষ দখল ছিল—পাশ্চাত্য, ভারতীয় মার্গসংগীত ও লোকসংগীতের ওপর। আর সেজন্যই তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'ত দু'টো কাজ একসঙ্গে করা। এই চিত্রনাট্য লেখা আর সেই চিত্রনাট্য অনুযায়ী শট্ নিতে যাবার সময় একটা ব্যাকরণ মানা হ'ত। যেমন,—একটা Long শট্-এ দেখা গেল একটা চরিত্র যেন কি বলছে বা ভাবছে। আগে নিয়ম ছিল যে Long শটের থেকে Big close-এ ক্যামেরা যেতে পারবে না। এখন আর সেই নিয়মকানুন নেই। বরং এখন এই ব্যাকরণ ভাঙাটাই একটা শিল্পকর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা অবিশ্যি পরের দিকে সত্যজিৎবাবুর মধ্যেও দেখেছি, উনিও ঠিক সে অর্থে ব্যাকরণ মানছেন না। বরং ভাঙছেন। বেরিয়ে আসছেন। চিত্রনাট্যেই এমন একটা কিছু করছেন যেটা রসোত্তীর্ণ হচ্ছে এবং সেটাই তখন টেক্‌নিক্ হিসেবে accepted হয়ে যাচ্ছে।

আমি বরাবরই বলি, আজও বলছি সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের কোনো বিরোধ বা বিবাদ নেই। একটা আর একটার পরিপূরক। আমরা দেখেছি, চিত্রনাট্য লেখার গুণে, একটা ভালো সাহিত্যের উপর নির্ভর করে অসাধারণ চলচ্চিত্র সৃষ্টি হতে। আবার উল্টোটাও দেখেছি। ভালো কাহিনী কিভাবে তছনছ হয়ে গেছে। তাঁরা সব অ-পটু পরিচালক। তবে সত্যজিৎ, ঋত্বিকের মতো পরিচালকের হাতে চিত্রনাট্য লেখার অ-সাধারণ দক্ষতায় মূল কাহিনী আরো রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে। এ কারণে বহুক্ষেত্রে সাহিত্য ও সাহিত্যিকও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জনপ্রিয় হয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে আমি বলতে পারি, 'পথের পাঁচালি' মুক্তি পাবার পর এমন কোনো পরিবার নেই, যেখানে 'পথের পাঁচালি' না পড়া হয়েছে। কিন্তু ছবি তৈরীর আগে এমন বহু পরিবারই ছিল যেখানে বইটি আগে এভাবে পঠিত বা সমাদৃত হয় নি। তাই আমার মনে হয় যাঁরা চিত্রনাট্যকার এবং পরিচালক তাঁদের সর্বদা সচেতন থাকা উচিত। বিশেষ করে ক্লাসিক সাহিত্য নিয়ে ছবি করার সময়। যতটা সম্ভব সাহিত্যের প্রতি তাদের আনুগত্য বজায় রাখাটা অবশ্য কর্তব্য। সত্যজিৎবাবু চলচ্চিত্রের প্রায় ৯০ ভাগ কাজ চিত্রনাট্যেই করে রাখতেন। আবার দেখেছি পরিচালক গ্রিফিথ চিত্রনাট্য লিখতেন না, গোটা ব্যাপারটাই অদ্ভুতভাবে তাঁর মাথার মধ্যেই থাকতো। ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে কাজ করতে গিয়েও আমার এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে। তিনি চিত্রনাট্য বলতে তেমন কিছুই লিখতেন না। কিছু কিছু Point লেখা থাকতো মাত্র। ডায়ালগ কি বলবো জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, আরে

বল্ না। এই তো Situation। এই বলে তৎক্ষণাৎ ডায়ালগ বলে দিতেন। আবার কখনো কখনো বলতেন, এমন Situation-এ যেমন সংলাপ স্বাভাবিক তেমন একটা কিছু বল্। এইরকম সুযোগ, স্বাধীনতা অভিনেতাদের তিনি দিতেন। আবার নিজেও একেবারে তাৎক্ষণিক সংলাপ তৈরী করে দিতেন। প্রথমে ক্যামেরা মুভমেণ্ট সম্বন্ধে সবকিছু ঠিক করে নিতেন, তারপর ক্যামেরার চিন্তা যখন মাথা থেকে গেল, তখন আর্টিস্টদের বলতেন—এই Situation, তোরা রেডি হয়ে একটু ভেবে নে। এ কাজে এক ধরণের মজা আছে। তাই সত্যজিৎ আর ঋত্বিকের কথা এলে আমার মনে হয়, একজন আনন্দ পান ডিসিপ্লিন গড়ে, আর একজন ভেঙে।

চিত্রনাট্য ব্যাপারে আর একটা কথা। মানিকদা ইদানীং উল্লেখ করতেন যে, 'পথের পাঁচালি' এবং 'অপরাজিত'র চিত্রনাট্যে কিছু দুর্বলতা ছিল। তা ছিল বলেই 'এডিটিং টেবিল'-এ অনেক দৃশ্য ফেলে বাদ দিতে হয়েছে। অনেক বেশি Film expose করতে হয়েছে, তাতে খরচও বেশি হয়েছে। কিন্তু এই দুটো ছবির পর আর কখনো এই ভুলগুলো ওঁর চিত্রনাট্যে থাকে নি। নতুন বিষয়বস্তু নিয়ে কাজ করেছেন। নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। স্টাইল অন্যরকম হয়েছে। হয়তো কখনো-সখনো কনটেণ্ট এবং ফর্ম দর্শকদের ততটা প্রীত করতে পারে নি। কিন্তু কাজের দিক থেকে বিচার করলে ওঁর চিত্রনাট্যে সেরকম ত্রুটি ছিল না। চিত্রনাট্য লেখার ব্যাপারে ওঁর একটা বিচিত্র কায়দা ছিল। উনি চিত্রনাট্য লিখতে দূরে কোথাও পালিয়ে যেতেন। সাধারণত কোনো সমুদ্রের ধারে। গোপালপুর বা পুরীতে। একেবারে একা, স্ত্রী-পুত্রকেও সঙ্গে রাখতেন না। ১৭/১৮ ঘণ্টা একটানা কাজ করতে পারতেন। বারবার গল্প পড়া। খসড়া তৈরী করা। তারপর চিত্রনাট্য লেখা। প্রায় ডায়ালগ সমেতই চিত্রনাট্য লিখে ফেলতেন। অথচ অবিশ্বাস্য ব্যাপার, এসব করতে তার ১০/১২ দিনের বেশি সময় লাগতো না। ১০/১২ দিন একটানা কাজ করে উনি সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য লিখে ফেলতেন। এই বাইরে এসে চিত্রনাট্য লিখতে গিয়েই অনেক পরিবর্তন ঘটতো। যেমন 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবিটা প্রথমে হবার কথা ছিল ঠাকুরদের বাড়ী। তার চিত্রনাট্য লেখার জন্য তিনি গেলেন দার্জিলিং। সেখানে গিয়ে মেঘ আর কুয়াশার অবিরাম খেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। মেঘ আসে। মাঝে মাঝে আবার তারা সরে যায়। তখন নীলাকাশ দেখা যায়। আর হাসিখুশী কাঞ্চনজঙ্ঘা। তখনই ঠিক করলেন দার্জিলিংয়েই 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবির শুটিং হবে। রঙিন ছবি। সেই তার প্রথম তৈরী রঙিন ছবি। রঙিন ছবি সম্বন্ধে ওঁর কিছু রিজার্ভেশন ছিল বরাবর। উনি মনে করতেন সব Subject রঙের জন্য ঠিক নয়, যেখানে-সেখানে তিনি রঙের ব্যবহার একদম পছন্দ করতেন না। উনি বলতেন, আমি কল্পনা করতে পারি না, 'অপরাজিত' রঙিন ছবি হতে পারে। বেনারসের পটভূমিকায়, সেখানে ছোট্টো ছোট্টো রঙও ভীষণভাবে বিষয়বস্তুকে, চরিত্রগুলোকে বিরক্ত করবে। তাতে

সামগ্রিকভাবে ছবির ক্ষতি হত। কাজেই তাঁর মতে, 'অপরাজিত'র বিষয় রঙিন নয়। কিন্তু 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র ক্ষেত্রে উনি বেছে নিলেন রঙ। তার সুফল আমরা ছবিতে দেখলামও। মেঘ-কুয়াশার মধ্যে কোথায় চরিত্রগুলো হারিয়ে যায়। আবার বেরিয়ে আসে। তাদের বসন-ভূষণ কখনো অতিরঞ্জিত হয়ে যায় না। বরং ডিফিউজড্‌ হয়ে যাব ঐ পরিবেশে। মেঘের নিত্য পরিবর্তনশীল রঙ তাদের মানসিকতার সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিশে যাচ্ছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার গল্প। চিত্রনাট্য অনুযায়ী একই বেশভূষায় থাকতাম আমরা সবাই। আমাদের বেশভূষা পরিবর্তনের কোনো অবকাশ ছিল না। একদল মোটামুটি ভালো বেশভূষা পড়ে আছেন। তারা রায়বাহাদুরের বংশধর। আবার মধ্যবিত্ত পরিবারের চরিত্রদের দেখে তাদের তফাৎটা চোখে পড়ে। গোটা ব্যাপারটাই ঘটছে মেঘ-কুয়াশাঘন দার্জিলিং পাহাড়ের বুকে। যেখানে ঐ প্রকৃতি সমস্ত উজ্জ্বল্যকে ম্লান করছে। সামঞ্জস্য এনে দিচ্ছে চরিত্রগুলোর মানসিকতার সঙ্গে। গোটা ঘটনাটা ঘটেছিল একটা আধ-মাইল রেডিয়াসের মধ্যে। একটা পাহাড়। অবজারভেশন হিল। সবকিছু হয়েছে আধমাইল গণ্ডীর মধ্যে। এগুলো ভীষণভাবে ক্যালকুলেট করেই চিত্রনাট্যটা লেখা।

সত্যজিৎবাবু চিত্রনাট্য লেখার সময় সবরকম দর্শকের কথা মাথায় রাখতেন। সেই গ্রামের নিরক্ষর দর্শক থেকে শুরু করে চলচ্চিত্র-উৎসবের বিচারকমণ্ডলী পর্যন্ত। বারবার বলতেন, আমি ছবি তৈরী করি দর্শকের জন্যে। যদিও আমি জানি দু'একটা বই ছাড়া আমার ছবির দর্শক সংখ্যা একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমি বাংলায় ছবি করি। ছোট্টো বাজারের মধ্যে ছবি করতে হয়। সব কিছুর দাম বেড়ে যাচ্ছে। যিনি প্রযোজক, আমার ছবিতে অর্থ দেন—তার টাকাটা ফিরিয়ে আনার দায়িত্বও তো আমার (পরিচালকের)। সে কারণে আমি চেষ্টা করি এমন ছবি করতে, যাতে সব শ্রেণীর দর্শক মনোযোগ সহকারে আমার ছবিটা দেখে, তা থেকে রসাস্বাদন করতে পারে। তাহলে তাতে প্রযোজকের টাকাও উঠে আসবে। এমন কিছু দুর্বোধ্য কাজ আমি করি না। করতাম, যদি আমার এসব চিন্তাভাবনা না থাকতো। কাজেই তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবে ছবি করেছেন। দর্শকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেই। গ্রামীণ দর্শকদেরও ওঁর ছবি দেখার অধিকার আছে এবং দেখলে তারা যাতে খুশী হয়—এই মানসিকতাটা বরাবর তাঁর মধ্যে কাজ করেছে। চিত্রনাট্য লেখার সময়, গল্প নির্বাচনের সময়, অত্যন্ত সচেতনভাবে এ সবকিছু মাথায় রেখে তিনি কাজ করেছেন। চিত্রনাট্য লেখার সময়েই সত্যজিৎ সব-কিছুর নোটেশন তৈরী করে রাখতেন। তবু শেষ মুহূর্তে Improvisation-এর প্রয়োজন হলে উনি দ্বিধাবোধ করতেন না। সে স্বাধীনতা অভিনেতাদের উনি দিতেন। আমি দেখেছি, অনেক সময় সঠিক কোনো শব্দ উচ্চারণ করতে কোনো আর্টিস্ট হয়তো কনশাস্‌ হয়ে যাচ্ছে। তাতে তার স্বাভাবিকতা নষ্ট হচ্ছে। তখন উনি সঙ্গে সঙ্গে শব্দ পরিবর্তন করে দিতেন বা পুরো বাক্য বদলে দিতেন। 'পোস্ট-

মাস্টারে'র সময় দেখেছিলাম, সেখানে গ্রামের বুড়োরা সংলাপ বলতে পারছেন না। তখন তিনি ব্যাপারটা তাদের বুঝিয়ে বললেন। গ্রামে একজন নতুন মানুষ এসেছে। আপনারা তার সঙ্গে পরিচিত হতে চান। আপনাদের মধ্যে একজন গানও জানেন। এভাবে সবকিছু বুঝিয়ে বল্লেন। তখন বুড়োরা বল্লেন—ইনি আপনাকে একটা গান শোনাবেন ইচ্ছা প্রকাশ করছেন। মানিকদা শুনে বল্লেন, বেশ তো, এভাবেই বলুন না। তখন বুড়োরা গ্রাম্য কায়দায় দু'একটা শুদ্ধ শব্দচয়নে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। সে কি শ্রুতিমধুর ও স্বাভাবিক সংলাপ।

চিত্রনাট্য অনুযায়ী সংলাপ বলতে বলতে হাঁটা-চলা করতে হয়তো কোনো অভিনেতার অসুবিধা হচ্ছে। এমন এমন ক্ষেত্রে তিনি সামান্য পরিবর্তন করতে বাধ্য হতেন। শুনলে অবাক লাগবে, কোন্ সীজন্-এ সংলাপ বলা হবে, সেই অনুযায়ী সত্যজিৎবাবু চিত্রনাট্যে সংলাপ লিখতেন। শীতকালে লোকেরা একভাবে কথাবার্তা বলে। আবার গরমে মানুষের কথা বলার মধ্যে একটা বিরক্তি ভাব থাকে। চিত্রনাট্য লেখার সময় এতসব খুঁটিনাটি ভাবনা ওঁর মাথায় থাকতো। ওঁর চারটে ছবিতে কাজ করতে গিয়ে চিত্রনাট্যে এমন একটা লাইনও আমি পাই নি যেটা বলতে আমার কষ্ট বা অসুবিধা হয়েছে। বরং মনে হয়েছে যেন আমার কথাই উনি লিখে দিয়েছেন। সংলাপ চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এমনই হওয়া দরকার। তা না হলে কিন্তু শিল্পীদের কাছ থেকে স্বাভাবিক অভিনয় বার করে আনা খুবই কষ্টকর ব্যাপার।

সত্যজিৎ রায় যখনই চিত্রনাট্য লিখতেন তখনই সেইসব দৃশ্য কিভাবে পর্দায় আসবে তা তাঁর ভাবা হয়ে যেত। সকলেই জানেন যে একটা লাল খেরোর খাতায় তিনি চিত্রনাট্য লিখতেন। ওখানেই পাশাপাশি স্কেচ করতেন। ওই স্কেচগুলির মধ্যে যেমন চরিত্রগুলি একটা আকৃতি পেত, তেমনি শট্ ডিভিশনটাও করা হয়ে যেত। ছবি তোলার সময় সর্বক্ষণ ওই খেরোর খাতাটা তাঁর হাতে থাকতো। অঙ্কের এক একটা ধাপের মতো শট্গুলো তার নিয়ম মেনে চলেছে। কিন্তু যতই চিত্রনাট্যে যা আছে, তার বাইরে না যাবার কথা ভাবুন না কেন, যেহেতু এটা সিনেমা, **improvisation**-এর ব্যাপারটা এখানে থেকেই যায়। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র পাহাড়ী ছেলেটিকে তো দার্জিলিং-এই পাওয়া গিয়েছিল। চরিত্র-গুলো যখন ম্যালে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন যেমন করে বিকেলের মেঘ-রোদ-ছায়া-কুয়াশা এসেছে, তেমনি করেই কুয়াশার মতো ছেলেটিও হঠাৎ হঠাৎ দেখা দিয়েছে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'অবতরণিকা' গল্প থেকে কাহিনী নিয়ে চিত্রনাট্য লেখার সময় সত্যজিৎ কিছুটা মূলের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। চিত্রনাট্যে এই মূল কাহিনী থেকে সরে আসাটা সিনেমারই প্রয়োজনে। গল্পলেখক প্রধান চরিত্র করেছিলেন স্বামীকে। সত্যজিৎ করেছেন স্ত্রীকে। একটা দৃশ্যে আমার স্ত্রী আরতি প্রথম কাজে বেরোচ্ছে। ছেলে কান্নাকাটি করছে। স্ত্রী তাকে ভোলাবার চেষ্টা করছে। ফেরার সময় ওর জন্য একটা জিনিস নিয়ে আসবে। পুরো দৃশ্যটাই নেওয়া হয়েছে

একটা শটে। ক্যামেরা একই জায়গায় ছিল। আমাকেও একই জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। এই দৃশ্যে ক্যামেরায় আমাকে প্রাধান্য দেবার কোনো কারণই নেই। শুধু কি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবো? শট্ নেবার আগে কী খেয়াল হ'ল হঠাৎ বলে ফেললাম, "মানিকদা আমি তো খাওয়া-দাওয়ার পরে পান খাই, আমি কি একটা দেশলাই কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটতে পারি?" উনি একটু হেসে বল্লেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই; করো, ভালোই হবে।" এত methodical হওয়া সত্ত্বেও এ ধরণের সাধারণ জিনিসগুলোকে তিনি অ্যালাউ করতেন। এতে চরিত্রের স্বাভাবিক আচরণ কোথাও ব্যাহত হত না। সত্যজিতের চিত্রনাট্যই অনেকখানি অভিনয় করে রাখতো। চোখের সামনে দেখেছি, তিনি নিজের হাতে অভিনেতার চুল আঁচড়ে দিয়ে একটা মুখকে কিভাবে অন্যরকম করে দিতে পারেন, যেরকম মুখটা চায় তাঁর চিত্রনাট্য।

সত্যজিৎ রায় যখন চিত্রনাট্য লেখেন তখন তিনি তাঁর নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে তার চরিত্রের অন্তরে প্রবেশ করে সেই চরিত্রের সত্তাটিকেই সংলাপের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। ওঁর ছবিতে শুধু সংলাপের গুণেই একটা চরিত্র চেহারা পেয়ে যায়। শট্-ডিভিশন, ক্যামেরা, এডিটিং, এসবের ভেতর দিয়েই চিত্রভাষা তৈরী হয়ে যায়। সিনেমার ভাষা হচ্ছে যন্ত্রের ওপর নির্ভর করা একালের শিল্পের সবচেয়ে জোরালো ভাষা। এ ভাষা অভিনেতার চোখে, মুখে, উচ্চারণ-ভঙ্গিতে কোথায় আছে তা মানিকদা জানতেন।

আমার মনে হয় মানিকদা যে মুহূর্তে চিত্রনাট্য লিখতে আরম্ভ করতেন, শিল্পীটিকে ভেবেই লিখতেন। যেমন, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র অনিল। লেখার পর শিল্পী খুঁজতেন না। মানে আপনার চেহারাটা তাঁর মনে আছে। আপনার চালচলন তাঁর মনে আছে। সেই অনুযায়ী চরিত্রের সংলাপ, চরিত্রের সামাজিক ব্যাকগ্রাউণ্ড, এডুকেশন্যাল ব্যাকগ্রাউণ্ড, কথা বলার স্টাইল সেগুলো ভেবে নিয়েই সংলাপ রচনা করতেন। সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকা হয়ে যেত। পরপর কি আসছে অর্থাৎ গোটা Film-টা সেটে যাওয়ার আগে তার মাথায় থাকতো। এটা তো আমি আর কারো ক্ষেত্রেই দেখি নি। প্রথম দিকে তিনি খুবই ব্যাকরণ মেনে কাজ করতেন। অর্থাৎ চিত্রনাট্য যেভাবে সাজানো থাকতো, একের পর দুই, দুইয়ের পরে তিন—সেভাবেই ছবি তুলতেন। পরে চলচ্চিত্র মাধ্যমের উপর তাঁর এতো দখল বেড়ে গিয়েছিল, যে এই ধরণের ব্যাকরণ মানবার আর দরকার হয় নি। পুরো ছবিটাই তাঁর মাথার মধ্যে থাকতো। ছবি করার ক্ষেত্রে তাঁর মতো গোছানো স্বভাবের পরিচালক আমি দ্বিতীয় কাউকে দেখি নি।

সাক্ষাৎকার : বিজিত ঘোষ

অনুলিখন : শিখা রায়

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

অভিনয়-শিক্ষাদানে সত্যজিৎ রায়

সত্যজিৎ রায় সাধারণত তাঁর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কোন শট বা দৃশ্যের অভিনয় নিয়ে নির্দেশ দেবার সময় নিজে অভিনয় করে দেখাতেন না। প্রথমে যখন দৃশ্যটি পড়ে দিতেন তখনই তার পড়া থেকে সংলাপগুলি কেমনভাবে বলা দরকার তার একটা ধারণা তৈরী হয়ে যেত আমার। তারপরেও কিছু-কিছু নির্দেশ তিনি আচার-আচরণ, কার্যকলাপ বা অভিব্যক্তি সম্বন্ধে দিতেন রিহার্সালের সময়। কদাচিৎ সবটা নিজে অভিনয় করে দেখাতেন। কিন্তু যখন সেটা করতেন, অর্থাৎ নিজে অভিনেতার করনীয় অংশটা অভিনয় করে অভিনেতার চোখের সামনে স্পষ্ট করে তুলতে চাইতেন তখন তা ছিল মুগ্ধ হয়ে দেখার জিনিস এবং শেখার জিনিস। যখন দৃশ্য পড়ে শোনাতেন তখন তাঁর কোন ইন্‌হিবিশন থাকত না চোখ-মুখের অভিব্যক্তি নিয়ে। সেটাই অভিনয়ের পথনির্দেশ হতে পারত এবং তাঁর অভিব্যক্তি যে কত বিচিত্র ও বাঙ্ময় হতে পারত তা তো তার অসংখ্য ফোটোগ্রাফ থেকেই বোঝা যায়। কিন্তু যখন সবটা অভিনয় করে দেখাতেন তখন চলাফেরা, বিশেষ করে হাতের ব্যবহারও চমৎকার করতেন। সেটা থেকে অনেক কিছু দেখা যেত।

সত্যজিৎ রায় অন্য অনেক পরিচালকের মতো অভিনেতাদের সামনে দীর্ঘ বক্তৃতা, মাস্টারি বা ডিসকার্সন করতেন না। আলাদা করে তেমন কোনো নির্দেশও তিনি দিতেন না। কোনো অভিনেতা নিজে থেকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে এবং সে প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক ও যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হলে অবশ্যই তার উত্তর দিতেন। অনেক অভিনেতাদের সামান্যই নির্দেশ দিতেন। আবার কোনো কোনো অভিনেতাদের ক্ষেত্রে দেখেছি, যারা ঠিক-ঠিক অভিনয়টা করতে পারছেন না, সত্যজিৎ যেমনটি চাইছেন ; সেক্ষেত্রে তিনি তাদের পুতুলের মতো প্রতিটি খুঁটিনাটি নির্দেশ দিয়ে অভিনয় করিয়ে নিতেন। তাঁকে শুধু বলতেন—তুমি এই কথাগুলো বলো, বলার সময় একটু বাঁদিকে তাকাও, একটু ডান দিকে তাকাও। এখানে আপনি হাতটা একটু উঁচুতে তুলুন, তুলে ঐ কথাটা বলুন। কি, নীচের দিকে তাকিয়ে বলুন। এইরকম একদম প্রত্যেকটি ডিটেলের ব্যাপার বলে দিতেও শুনেছি।

প্রথমে তিনি সকলকে চিত্রনাট্যটা পড়ে শোনাতেন। সেই পাঠের কণ্ঠস্বরের ওঠানামায় এমন সূক্ষ্ম অভিনয়ের কাজ থাকতো যে, অভিনেতাদের চরিত্রটা বুঝতে একটুও অসুবিধা হ'ত না।

শিল্পী নির্বাচনে তার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল না। অনেক সময়ে অনেককে তাঁর ছবিতে তিনি নির্বাচন করেছেন শুধুমাত্র তার মুখটা হয়তো সেই চরিত্রের ধারণার সঙ্গে মেলে বলে। অথবা তার কণ্ঠস্বরটা ভালো বলে। কেবল পুরনো দক্ষ অভিনেতাদেরই নেব, নতুনদের নয়, এমনটি কখনোই করেন নি। আবার কেবলই নতুনদের নেব, পুরনোদের নয়, এমন কোনো গোঁড়ামিও তাঁর ছিল না। সে-কারণে প্রথম ছবি 'পথের পাঁচালি'-তেই পুরনো প্রতিষ্ঠিত কানু বন্দ্যোপাধ্যেয়র পাশাপাশি করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নতুন মুখ এনেছেন, ছবিতে যার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে চরিত্রে অভিনয়ের জন্য যেমন মুখের প্রয়োজন তেমন মুখই তিনি খুঁজে আনতেন, তা তার জন্য পুরনো, নতুন যাকেই দরকার হোক্ না কেন। তাকে দিয়েই শ্রেষ্ঠ অভিনয়টা করিয়ে নিয়েছেন। এক্ষেত্রে পুরনো-নতুন এই ভেদ তিনি কখনোই করেন নি বা মানেন নি। তবে শেষের দিকে শারীরিক অসুস্থতার কারণে নতুন মুখ নিয়ে কাজ করানোর পরিশ্রম বা ঝুঁকি আর নিতে চাইতেন না।

তাই বলে ছবিতে শেষ পর্যন্ত উতরোবে না, ক্যামেরার সামনে আড়ষ্ট হয়ে থাকবে এমন কাউকে নির্বাচন করতেন না। কতকগুলো ব্যাপারে খুব জোর দিতেন। যাকে নেবেন সে বাংলাটা পরিষ্কার বলতে পারে কিনা এটা দেখে নিতেন। কোনরকম মুদ্রাদোষ আছে বা বিশেষ ঢং-এ ছাড়া বাংলা বলতে পারে না এমন কাউকে বাছতেন না। সর্বোপরি যেটা বুঝতে চাইতেন যে যাকে নিতে চাইছেন তার অভিনয় করতে আগ্রহ আছে কিনা।

সাধারণভাবে অভিনেতাদের এটা পড় ওটা পড় বলে অ্যাকটিং বিষয়ে বা সিনেমার তত্ত্ব বিষয়ে বই পড়ার নির্দেশ দিতেন না। কিন্তু যেখানে প্রয়োজনীয় কোন জিনিস জানতে হবে সেটা জেনে নিতে বা আয়ত্ব করতে বলতেন।

আমার ক্ষেত্রে একেবারে প্রথমে 'বিন্দুর সংসারে'র শ্যুটিং-এর অনেক আগে আমাকে নির্বাচন করে বলেছিলেন, মূল উপন্যাসটা আর একবার যেন খুঁটিয়ে পড়ে নিই। তাছাড়া আমাকে তৈরী করে নেওয়ার জন্যে অভিনয় বা সিনেমা সংক্রান্ত অনেক আলোচনা যেমন করেছেন তেমনি আমার পড়া ছিল না এমন অনেক বইও পড়িয়েছিলেন। আমাকে তৈরী করে নেবার জন্যে বা ক্যামেরার সামনে যাতে আমি স্বচ্ছন্দ বোধ করি তার জন্যে আমাকে শ্যুটিং দেখতে আসতে বল্‌তেন—তখন তিনি 'পরশ পাথর' ও 'জলসাঘর' ছবি দুটির শ্যুটিং করছেন।

এছাড়া অপু চরিত্রের ধারণা স্পষ্ট করার জন্যে তিনি দু'তিন পৃষ্ঠার একটি কুঞ্চিকা লিখে দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে শ্যুটিং আরম্ভ হওয়ার আগে চিত্রনাট্যের প্রথম খসড়াটি উনি যখন আমাকে দিলেন তখন আমি তার একটি subtext তৈরী

করেছিলাম। চিত্রনাট্যের দুটি দৃশ্যের মাঝখানে যে দৃশ্যগুলি নেই আমি তাদের কল্পনা করে সেই সময় অপুর ক্রিয়াকলাপ, আচার-আচরণের ভিত্তিতে একটা ডায়রি মত তৈরী করেছিলাম। সেসব তাঁকে দেখাতাম। তিনি নিরুৎসাহিত তো করেনই নি, এমনকি তার খুঁটিনাটি নিয়ে আলাচনাও করতেন। এই সবের মধ্যে দিয়ে আমার মধ্যে অপু চরিত্রের একটা সমগ্র ধারণা তৈরী হয়েছিল।

আগের দিকে সত্যজিৎ সকলকে স্ক্রীপ্ট দিতেন না। 'অপুর সংসারে'র সময়ই সেটা বোধহয় শুরু হয়। পরে প্রধান চরিত্রদের জন্য একটা স্ক্রীপ্টের কপি নির্দিষ্ট থাকত। অভিনেতার মৌলিক ভাবনা-চিন্তাকে যখনই তার গ্রহণযোগ্য বা যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়েছে, তখনই তিনি তাঁকে সাদরে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। আমি সবসময় ওর কাছ থেকে প্রচুর স্বাধীনতা পেয়েছি, নিজের মত অভিনয়ের ব্যাপারে। উনি যেটা চাইছেন সেটা আমি বুঝতে পারতাম। আমার ধারণা উনিও অবশ্যই বুঝতেন আমার কাছে উনি কি পেতে পারেন, আর কি পেতে পারেন না। আমার মনে এই নির্ভরতাও ছিল যে, আমার যদি কোন ভুল হয় ঠিক করে দেওয়ার মত লোক তো সবসময় রয়েইছেন। ওঁর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে আমার মতোই অনেক অভিনেতা অনেক কিছু ক্রিয়েটিভ কাজ করার স্বাধীনতা পেয়েছেন। সেটাই তো একটা বড় শিল্পীর লক্ষণ। যা অন্যের সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করতে পারে। এ-প্রসঙ্গে 'অভিযান'-এর কথা বলতে পারি। 'অভিযানে'র 'নরসিংহ'-র ভাঙা-ভাঙা বাংলা-হিন্দী সংলাপের কথা আমিই বলেছিলাম। প্রথমে চিত্রনাট্যে তেমনটি ছিল না। পরে তিনি আমার মতামতকে গ্রহণ করে চিত্রনাট্যে সে-ভাবেই সংলাপ লিখে দিয়েছিলেন।

'শাখাপ্রশাখা' সম্পর্কে আমাকে বলেছিলেন, এই চরিত্রটায় বেশি কথা নেই। শক্ত চরিত্র এই ছবিতে ওই একটিই। সেজন্যই তোমাকে দরকার। যাদের মন ও ব্যবহার অস্বাভাবিক তাদের চরিত্রে নানাভাবেই অভিনয় করা যায়। সেদিক থেকে যে কোন ব্যবহারই জাস্টিফায়েড। কিন্তু সেরকমভাবে ভাবলে তো হয় না। যেটা সবথেকে বেশি যুক্তিপূর্ণ হতে পারে বা সবথেকে বেশি সংবেদনশীল হতে পারে সেইরকম ব্যবহারগুলোই আমাকে খুঁজে বের করতে হবে। এইটুকু মাত্র তিনি বললেন। ঐ চরিত্রের মেকআপটা আমার অভিনীত অন্য কোন চরিত্রের মত নয়। এই ছবিতে প্রথম মেক-আপটা আবার পাল্টানো হয়েছিল। উনি প্রথমে যে মেক-আপটা এঁকেছিলেন সেটা আমার পছন্দ হয় নি। আমি ওঁকে বলেছিলাম, মেক-আপটা 'ঘরে-বাইরে'র সন্দীপের মতো লাগছে। এটা বলার পর আবার উনি নতুন করে আঁকলেন। এই রকমভাবে তিনবার বদলের পর ওই মেক-আপ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়। তবে সত্যজিতের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধা ছিল, তিনি যেমন মুখ চাইতেন, চিত্রনাট্যে ঠিক তেমন মুখের ছবি এঁকে ফেলতেন।

ফলে মেক আপ নিয়ে মেক-আপ-ম্যানের বেশ একটু সুবিধে হত। 'শাখাপ্রশাখা'য় উনি বহু সাজেশান দিয়েছেন। যেমন, ঐ হাত-চাপড়ানোর ব্যাপারটা, ওটা কিন্তু সম্পূর্ণ ওঁরই ভাবনা। টেবিল চাপড়ানোর সময় ঐ জিনিসটা একটা ক্লাইম্যাক্স-এ ওঠে। উনি সঠিকভাবেই পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে, এই ধরণের যাদের নিউরো-লজিক্যাল গণ্ডগোল থাকে তাদের কিন্তু নানারকমের কাঁপুনি বা খিঁচুনী হয়। সেইটেরই একটা এক্সটেনশন্ হিসেবে ঐ ম্যানারিজম্ উনি করেছিলেন। মাঝে মাঝে হাত দিয়ে সোফা চাপড়ানো। আবার কখনো ঐ হাতেই তাল দেওয়া। যখন সে মিউজিক শুনছে। এই জিনিসটা সম্পূর্ণ ওঁরই ভাবনা।

ডিটেইলের ওপর বিশেষ ঝোঁকের কারণেই তিনি অত্যন্ত খুঁটিয়ে কাজ করতেন। সেই ডিটেইলের দিকে নজর দেওয়ার ভেতর দিয়েই তাঁর সত্যিকারের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতো। সেটা একটা শিল্পদৃষ্টি। পৃথিবীতে অনেক বড়ো বড়ো ডিরেক্টর আছেন, যাঁরা অসামান্য চলচ্চিত্র তৈরী করেছেন। কিন্তু ওঁর ছবির মধ্যে যে মানবিকতা, মানুষের প্রতি দরদ ফুটে উঠতো তার মধ্যে একটি কবিতার ভাব ছিল। ছিল একটা লিরিক্যাল মেজাজ। সেইটাকেই ফুটিয়ে তোলার জন্য নানাভাবে তিনি ডিটেইলের আশ্রয় নিতেন। প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি নিয়ন্ত্রণ করতেন। অভিনয়ের খুঁটিনাটি অনেকসময় তিনি নিজেই বলে দিতেন। কিভাবে করতে হবে, কতটা কি করতে হবে। কিন্তু এই সঙ্গে বলা ভালো তাঁর অভিনেতাদের নিয়ে যে কর্মপদ্ধতি সেটা অত্যন্ত নমনীয় ছিল।

একটা কাজকে নিখুঁত করার জন্য, একটা ছোট শট্‌কেও চূড়ান্ত বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে তিনি যে কী অপরিসীম পরিশ্রম করতেন, কী ভীষণ ভাবনা-চিন্তা করতেন তা বলে বোঝানোর নয়। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে 'চারুলতা'-র অমলের হস্তাক্ষরের কথা উল্লেখ করতে পারি। রবীন্দ্র-পরবর্তী আমাদের অনেকের হস্তাক্ষরের মধ্যেই রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরের অনুকরণ অনায়াসলক্ষ্য। তাই অমলের হস্তাক্ষরের 'টাইপ'-কে যাতে রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী যুগের হাতের লেখা বলে মনে হয়, সেজন্য উনি আমাকে প্রাক্‌টিস্ করে শিখিয়ে নিয়েছিলেন। ফলে আমার নিজের আসল হাতের লেখাই আমূল বদলে গিয়েছিল।

অভিনেতাদের নিয়ে রিহার্সাল অবশ্য উনি অনেক সময় করেছেন। 'অপুর সংসার' -এর সময় কিছু রিহার্সাল করেছিলেন। যেমন, ওই রেলওয়ে লাইনের ওপর থিয়েটার দেখে রাত্রে বাড়ী ফেরার সেই বিখ্যাত দৃশ্যে। যেখানে অপু তার নভেল লেখার স্বপ্নগুলো বলছে। সেই দৃশ্যটা আমরা এইখানেই এক নম্বরের ফ্লোরে বহুবার এবং স্পটে কয়েকবার রিহার্সাল করেছিলাম। তারপর শ্যুটিং-এর দিনে যে রিহার্সাল হয় সে তো হয়েছে। 'চারুলতা'তেও বহু রিহার্সাল হয়েছে। সেগুলো অবস্থার ভেদে করতেন আর কি। যে অভিনেতাদের নিয়ে কাজ করছেন তাদের সুবিধার্থেই, তারা যাতে আরো তৈরী হতে পারে সেইজন্যেই করতেন। •

সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে ছোটরা অত্যন্ত ভালো অভিনয় করে। আমার মনে হয়, এটার কারণ, উনি কিভাবে কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয় তা জানতেন। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করতে পারি। তখন 'সোনার-কেল্লা'র মুকুল (কুশল) খুব বাচ্চা। তখন এমন বয়েস যে সমস্ত জিনিস নিয়েই সে প্রশ্ন করতে থাকে দিবারাত্র। কেমন? কোথায়? আচ্ছা তারাটা কত দূর? আচ্ছা, এই তারা কেন ঝুলে পৃথিবীতে নেমে আসছে না? সবরকম প্রশ্ন। তা একদিন রাত্তিরে আমরা লাঠি বলে একটা জায়গা, চল্লিশ মাইল দূর জয়সলমীর থেকে, সেখান থেকে শ্যুটিং করে ফিরছি। গাড়ির পেছনের সিটে আমি আছি। বৌদি আছেন। আর সামনের সিটে মানিকদা বসে আছেন কুশলের পাশেই। ও তো অনবরত প্রশ্ন করেই যাচ্ছে। আর সারাদিন শ্যুটিং-এর পর আমি ক্লান্ত। কোনোরকমে, আচ্ছা পরে বলব। ঠিক আছে। ওটা এখন বলা যাবে না। এমনি করে 'এ্যাভয়েড' করার চেষ্টা করছি। কিন্তু ও মানিকদাকে যেসব প্রশ্ন করছে মানিকদা তার প্রত্যেকটির উত্তর দিচ্ছেন। কক্ষনো মনে হয় না একজন বড, বয়স্ক মানুষ ছোটর সঙ্গে দয়া করে কথা বলছেন বা প্রশ্রয় দিয়ে কথা বলছেন। ঠিক সমবয়স্কদের মতো, সমান জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলে যাচ্ছেন। এ যে কতবড আশ্চর্য গুণ, এ আমি অন্তত আর কোন মানুষের মধ্যে দেখি নি। সেইজন্যেই বোধ হয় শিশুদের কাছ থেকে অমন সুন্দর সুন্দর অভিনয় তিনি করিয়ে নিতে পারতেন।

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাছ থেকে তিনি কি রকম কাজ চাইছেন তা স্পষ্ট করে বলে দিতেন। সত্যজিতের আগে সিনেমার কিছু কিছু ভালো অভিনয় নিশ্চয়ই দেখা গেছে। তবে সেগুলো অনেক সময় ব্যক্তিগত নৈপুণ্য। সব সময় পরিচালকের দক্ষতা তত নয়। পরিচালকের দাক্ষিণ্যে ভালো হোক, খারাপ হোক বা মাঝারি হোক, কি খুব ভালো হোক—সকল অভিনেতার অভিনয় যে একটা স্ট্যাণ্ডার্ডে আসছে, তা কিন্তু সত্যজিতের আগে ছিল না। কেউ হয়তো খুব ভালো অ্যাকটিং করছেন। আবার তার পাশে কেউ হয়তো ভালো করছেন না, এমন ছিল আগে। কিন্তু সত্যজিৎ অসীম ধৈর্য্যে, অত্যন্ত সুকৌশলে, সকল অভিনেতার কাছ থেকে সেরা কাজটি বার করে নিতেন। যে কোনো শট্ নেওয়ার পরই, শট্ ঠিকঠাক হলে—'ফাইন', 'এক্সসেলেণ্ট' শব্দগুলো তাঁর মুখে লেগেই থাকতো। খুব ছোটোখাটো ডিটেলের কাজ দেখিয়ে দিয়ে তিনি অভিনয়কে অন্যমাত্রায় নিয়ে যেতেন। এসব ক্ষেত্রে সত্যজিৎ রায়ের অবদান আমার মতে অপরিসীম।

তবে সার্বিকভাবে অভিনয়টা সম্পূর্ণরূপে ওঁনারই পরিচালনায় হত। তার বাইরে গিয়ে করা সম্ভব ছিল না। কারণ যেটা দেখাতেন তা ছিল প্রচুর। সেগুলোকে সংগ্রহ করতে পারলেই যথেষ্ট। ওঁনার কাছে খারাপ অভিনয় করাটা খুব শক্ত ব্যাপার ছিল।

না ; প্রত্যক্ষভাবে কারো কাছে অভিনয় সত্যজিৎ শেখেন নি। তবে ভালো ভালো বিদেশী পরিচালকদের সিনেমা দেখতেন প্রচুর এবং জগৎ-বিখ্যাত অসাধারণ অভিনেতাদের কাজ খুব খুঁটিয়ে দেখতেন। অভিনয় ব্যাপারটা ভালোবাসতেন। বিখ্যাত এক-একটা বিদেশী ছবি পাঁচ/সাতবার করে দেখেছেন। কোনবার শুধুমাত্র অভিনয়ের জন্য, কোনবার কেবলই সঙ্গীতের জন্য, কোনবার ফোটোগ্রাফির জন্য। নিজের চোখ-মন-বুদ্ধির ওপর কতখানি নিয়ন্ত্রণ থাকলে একটা সম্পূর্ণ ছবি দেখতে দেখতে সবকিছু বাদ দিয়ে নির্দিষ্ট একটা বিষয়ে মনঃসংযোগ করা যায়, তা কেবলমাত্র তাঁর মত অসামান্য প্রতিভাবানের পক্ষেই সম্ভব।

সাক্ষাৎকার : বিজিত ঘোষ

অনুলিখন : তমাল বসু

বিজিত ঘোষ

'ঘরে-বাইরে' ঃ উপন্যাস ও চলচ্চিত্র

আজ আর সম্ভবত কারো অজানা নেই, সত্যজিৎ (১৯২১-১৯৯২) প্রথম রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৬) কাহিনী নিয়েই চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্রায়িত করার ইচ্ছে ছিল তাঁর বহুদিনের। সেই আকাঙ্ক্ষা থেকেই তিনি 'ঘরে-বাইরে'-র প্রথম পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্যও লিখে ফেলেছিলেন ; 'পথের পাঁচালি' মুক্তি পাওয়ার (১৯৫৫) অনেক আগেই, ১৯৪৬ সালে। অবশ্য তিনি চিত্রনাট্য লিখলেও ছবিটির পরিচালনার কথা ছিল তাঁর বন্ধু হরিসাধন দাশগুপ্তের। ছবিটি সে সময়ে হয়ে ওঠেনি সত্যজিতের আপোষহীন মনোভাবের জন্য। তাছাড়াও আরো 'নানাবিধ' কারণে। পরিবর্তে হ'ল 'পথের পাঁচালি'। প্রসঙ্গতঃ কেউ কেউ বলেন, 'বাইসাইকল থীভস্' ছবি দেখার প্রেরণা তরুণ সত্যজিৎকে সে-সময়ে 'ঘরে-বাইরে' করার ইচ্ছে থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল 'পথের পাঁচালি' ছবি করার দিকে।

যাইহোক, 'ঘরে-বাইরে' নিয়ে সত্যজিতের সেই তরুণ বয়সের (১৯৪৬) ভাবনা বাস্তবায়িত হ'ল দীর্ঘ উনচল্লিশ বছর পরে। ১৯৮৫-তে। তাঁর প্রৌঢ়ত্বে এসে। অবশ্য সত্যজিতের মতে ছবিটি সে-সময়ে না করে ভালোই হয়েছে। সে সময়ে লেখা 'ঘরে-বাইরে'-র চিত্রনাট্যে ছিল অনেকখানিই হলিউডের অনুকরণ। ফলে কিছুটা কৃত্রিমও। এ-প্রসঙ্গে সত্যজিৎ নিজেই বলেছেন : '...প্রথমে 'ঘরে-বাইরে' করার কথা ছিল, 'পথের পাঁচালি'র আগে : কিন্তু সেই 'ঘরে-বাইরে'-র তখন যে আমি চিত্রনাট্য করেছিলুম, সেই চিত্রনাট্য পড়ে পরে আমার নিজের লজ্জা হয়েছিল এবং সত্যি করে সে ছবি যদি তখন হত তাহলে কিন্তু আমার ভবিষ্যৎটা একেবারে অন্যরকম হত। ...সেখানে আমি কোনওরকম স্থান করে নিতে পারতাম না, মোটামুটি হয়তো অন্যদের তুলনায় একটা ভালো ছবি হত।'[১]

'৪৬-এর পর '৮৫ ;—পরবর্তী এই দীর্ঘ উনচল্লিশ বছরে সত্যজিৎ, 'ঘরে-বাইরে' নিয়ে স্বভাবতই অনেক গবেষণা করার সুযোগ পেয়েছেন। ফলে, ছবিটিকে সে যুগের প্রেক্ষিতে নিখুঁতভাবে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে বলে সত্যজিতের বিশ্বাস।

'ঘরে-বাইরে'-র শ্যুটিং-এর কাজ শুরু হয় ১৯৮২-র ডিসেম্বরে। কলকাতায় ছবির কাজ চলাকালেই সত্যজিতের হার্ট-অ্যাটাক হয়। পর পর দু'বার।

১। শ্রী সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। 'দেশ'। ১৮ এপ্রিল, ১৯৮৭।

অসুস্থতার কারণে ছবির কাজ শেষ করেন তাঁর পুত্র সন্দীপ রায়। অবশ্য এডিটিং হয় সত্যজিতের তদারকিতেই। ১৯৮৫-র ১৩ই সেপ্টেম্বর ছবিটি লণ্ডনে মুক্তি পায়। কলকাতায় দেখান হয় নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে। গোর্কি সদনে। একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে।

২

'ঘরে-বাইরে'-র পাঁচটি অক্ষর দিয়ে গড়া সত্যজিতের নিজের হাতে করা বিজ্ঞাপন-পোষ্টারটিই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একটা চৌকো ফ্রেমের মধ্যে দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বিমলা। দৃষ্টি তার বাইরের দিকে। অন্ধকার-মূর্তি বিমলার দীর্ঘ কালো-ছায়া চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরে এসে পড়েছে। বিমলার পিছনদিকটা আর ফ্রেমের বাইরে 'ঘরে-বাইরে'-র অক্ষর ক'টি বাদ দিয়ে সবটাই কালো। ফেলে আসা ঘরের দিকটা সাদা, এই সাদা-কালো রঙ, আলো থেকে অন্ধকারে আসার ইঙ্গিত নয় কি? সাদাকে আলোর, আশার, ইতিবাচকতার প্রতীক বলে ধরেই নেওয়া যেতে পারে। হয়তো ফ্রেমের পেছনের (চৌকাঠের ভেতর দিককার) ঐ সাদা, অন্দরমহলের নিখিলেশের মনোজীবনেরও প্রতীক। সাদা অর্থে ফাঁকা। সাদা অর্থে শূন্যতাও। নিখিলেশ তাই একাধিকবার বেদনামথিত চিত্তে উচ্চারণ করে: 'এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর।'[২]

অন্ধকার, অনিশ্চিত ভয়াবহতারই প্রতীক। ঘরের সুখী, নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বিমলা বেরিয়ে এসেছে অনিশ্চিত, বিপদসঙ্কুল, অসুখী জীবনে। ঘরের আলো থেকে বাইরের অন্ধকারে। এ-আঁধারের পথে যাত্রা আলোকে গ্রহণ করে, স্বীকার করে, অতিক্রম করে নয় (সেক্ষেত্রে বলা যেত 'যে আঁধার আলোর অধিক')। বিমলা অন্ধকারের পথে যাত্রা করেছে আলোকে অগ্রাহ্য করে, অস্বীকার করে, পেছনে ফেলে। তাই, চৌকাঠের বাইরে এসে পড়া, তার দীর্ঘ কালো ছায়া-মূর্তি কেমন যেন এক অশুভ, অমঙ্গলের বার্তা বহন করে আনে।

'ঘরে-বাইরে'-র 'ই'-এর আঁকড়িটা আগুনের লেলিহান শিখার রূপ পেয়েছে। আর সেই আঁকড়ি-রূপ অগ্নিশিখার গতিপথ বিমলা তথা বিমলার ঘরের অভিমুখে। এক্ষেত্রে বুঝতে অসুবিধা হয় না, আগুন বাইরে লাগলেও তা বিমলাকে এবং বিমলার ঘরকে পোড়ানোর পথেই। পক্ষান্তরে বলা যেতে পারে, বিমলাও এগিয়ে চলেছে সেই আগুনের দিকেই। কাজেই আগুন লেগেছে বাইরে। সেই সর্বনাশের পথে ঘর ছেড়ে পা বাড়িয়েছে বিমলা। তাকে বাইরে আনছে নিখিলেশ। এর দায় দু'জনকেই বহন করতে হবে একদিন।

২। 'ঘরে-বাইরে'; রবীন্দ্রনাথ, 'নিখিলেশের আত্মকথা', পৃষ্ঠা ৫৮, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জুলাই ১৯৮৬।

কাজেই, শুধুমাত্র এই পাঁচটি অক্ষর দিয়ে 'ঘরে-বাইরে'-র পোষ্টারের পরিকল্পনাটিই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সত্যজিতের সঠিক গভীর ভাবনাই, চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ তথা রবীন্দ্র-উপন্যাসকে যথাযথ স্বরূপে ফুটিয়ে তুলতে সহায়তা করেছে।

৩

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসটি ডায়ারির আঙ্গিকে লেখা। বিমলা-নিখিলেশ ও সন্দীপের আত্মকথা উপন্যাসে একাধিকবার (বিমলার আত্মকথা সাত বার, নিখিলেশের আত্মকথা সাত বার, আর সন্দীপের আত্মকথা চার বার) ঘুরে ফিরে এসেছে। বলা বাহুল্য এই বিশিষ্ট আঙ্গিক উপন্যাসের কাহিনীকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। কিন্তু চলচ্চিত্রে ঠিক এভাবে চিত্ররূপ দেওয়া একটা দুরূহ কাজ। এজন্য স্বভাবতঃই সত্যজিৎ উপন্যাসের ফর্ম ছবিতে ব্যবহার করেন নি। তবে উপন্যাসের বিমলা-নিখিলেশ-সন্দীপের আত্মকথার ধারাবাহিকতার ক্রমটিকে তিনি রক্ষা করেছেন। তা করেই চিত্রনাট্যটিকে প্রথমেই চারভাগে ভাগ করে নিয়েছেন। উপন্যাসের তিনটি চরিত্রের মোট ১৮টি আত্মকথাকে চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ দশটি দৃশ্যপর্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন।

প্রথমভাগে সম্পূর্ণ বিমলারই প্রাধান্য (উপন্যাসও শুরু হয়েছে বিমলারই আত্মকথা দিয়ে)। বিমলাকে দেখা যায় এই অংশের সবক'টি শটেই। অফ্-ভয়েসে শোনা যায় তার কণ্ঠস্বরও। এরপর দ্বিতীয় অংশটিকে আনা হয় একটি ফেড-আউট ফেড-ইনের সাহায্যে। এই অংশে নিখিলেশেরই প্রাধান্য (উপন্যাসেও দ্বিতীয় আত্মকথাটিই নিখিলেশের)। এই অংশের সমস্ত শটেই নিখিলেশের উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করি। এরপর আবার ফেড-আউট ফেড-ইনের সাহায্যে আসে সন্দীপের অংশটি। উপন্যাসের অঙ্গিকের ক্রম মেনেই। চতুর্থ বা একেবারে শেষ অংশে পরিচালক তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ করেন। ফলে স্বভাবতঃই সেখানে বিশেষ কোনো একটি চরিত্র পৃথকভাবে প্রধ্যন্য পায় নি।

উপন্যাসের কাহিনী থেকে চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যে এই 'ডিস্‌প্লে' বা বিন্যাসের বিষয়ে সত্যজিৎ নিজেই এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন : "The entire narrative is divided into four Phases, the First being from Bimala's point of view, where we have Bimala's commentary and we don't have a single sequence without Bimala ; upto a point the narrative run this way. Then before the second Phase, a full fade out and a full-fade in bring us to Sandip's point of view and there's no sequence without Sandip ; through his commentary we are able to enter into the state of his mind. Then when the tragedy has

taken quite a turn we enter the third Phase, where it fades-out again to bring us to Nikhilesh's point of view, and here we are concerned with Nikhilesh only and every thing happens in relation to Nikhilesh. But the story proceeds all the time in its proper chronological order. And finally in the Fourth and last phase we get the director's point of view. The Cammera can now go whenever it likes, to Bimala, to Sandip or whomsoever it may be."[৩]

চলচ্চিত্রে কোনোকিছু 'অ্যাবস্ট্রাক্ট' রাখা সম্ভব নয়। তাকে কংক্রীট ও দৃশ্য-বস্তুতে ('ভিসুয়ালাইজড্') রূপান্তরিত করতেই হয়। 'ঘরে-বাইরে' মুখ্যতঃ সংলাপ-প্রধান উপন্যাস। আত্মকথন-রীতিতে বলে চলা পাত্র-পাত্রীব সংলাপগুলি উপন্যাসে দীর্ঘতর। এতো সংলাপ, সার্থক চলচ্চিত্রে বজায় রাখা সম্ভব নয়। আর সত্যজিতের ছবিতে সাধারণতঃ সংলাপের প্রাধান্য থাকেই না। সংলাপের দৈর্ঘ্যও হয় খুব ছোট। এজন্যই মুল উপন্যাসের অধিকাংশ সংলাপ বর্জিত হয়েছে চিত্র-নাট্যে। সাহিত্যের 'অ্যাবস্ট্রাক্ট' থেকে চলচ্চিত্রের 'কংক্রীটে' আনার অসুবিধার কারণে এটা করতেই হয়েছে। এ পরিবর্তন নিতান্তই মাধ্যমগত। এ প্রসঙ্গে সত্যজিৎ বলেছেন : "I did not use a single line of Tagore's dialogue in the Film. The way the people talk in the novel, would not be acceptable to any audience.[৪] 'ঘরে-বাইরে' চলচ্চিত্রে রবীন্দ্র-উপন্যাসের এক লাইন সংলাপও ব্যবহৃত হয় নি,—সত্যজিতের এ মন্তব্য যথার্থ নয়। এ-কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে কযেকটি উদাহরণ দিলেই। এ প্রসঙ্গে ডঃ নিমাইচন্দ্র পালের দেওয়া তথ্য[৫] আমাদের কাছে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছে। সেজন্য তাঁকে গ্রহণ করেই ব্যাপারটাকে স্পষ্ট করা যেতে পারে। উপন্যাসে বিমলা তার শেষ আত্মকথায় বলেছে : 'আমি আগুনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেছি ; যা পোড়বার ত পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, যা বাকি আছে তার আর মরণ নেই। সেই আমি আপনাকে নিবেদন করে দিলুম তাঁর পায়ে যিনি আমার সকল অপরাধকে তাঁর গভীর বেদনার মধ্যে গ্রহণ করেছেন।'[৬]

ছবির শুরুতেই আমরা দেখি ক্যামেরা ধীরে ধীরে এগিয়েছে বিমলার মুখের দিকে। তারপর বিমলার মুখ ধরা হযেছে 'ক্লোজ-আপ' শটে। তখন আমরা শুনতে পাই বিমলার কণ্ঠস্বর : 'আমি আগুনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেছি।

৩। 'চিত্রভাষ', পৃষ্ঠা ৬, জানুয়ারি—জুন, ১৯৮৫।
৪। ঐ পৃষ্ঠা ৯১।
৫। 'রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরে', ডঃ নিমাইচন্দ্র পাল, পৃষ্ঠা ১৯৯-২০০, 'রত্নাবলী।'
৬। 'ঘরে-বাইরে', বিমলার আত্মকথা, পৃষ্ঠা ১২৫।

যা পোড়বার, তা পুড়েই ছাই হয়ে গেছে—যা বাকি আছে, তার আর মরণ নেই। সেই আমি, আপনাকে নিবেদন ক'রে দিলাম তাঁর পায়ে, যিনি আমার সকল অপরাধকে তাঁর গভীর বেদনার মধ্যে গ্রহণ করেছেন।...'[৭]

আর একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। উপন্যাসের সন্দীপের আত্মকথা থেকে—

> 'যেটুকু আমার ভাগে এসে পড়েছে সেইটুকুই আমার, এ কথা অক্ষমেরা বলে আর দুর্বলেরা শোনে। যা আমি কেড়ে নিতে পারি সেইটেই যথার্থ আমার, এইহল সমস্ত জগতের শিক্ষা। দেশে আপনা-আপনি জন্মেছি বলেই দেশ আমার নয়; দেশকে যেদিন লুঠ করে নিয়ে জোর করে আমার করতে পারব সেইদিনই দেশ আমার হবে।'[৮]

সত্যজিতের চিত্রনাট্যের পঞ্চম দৃশ্য-পর্যায়ে আমরা সন্দীপের কণ্ঠস্বরে শুনতে পাই—

> 'যেটুকু আমার ভাগে এসে পড়েছে, সেটুকু আমার, একথা দুর্বলেরা বলে, অক্ষমেরা শোনে। যা আমি কেড়ে নিতে পারি সেটাই আমার, এই হল জগতের শিক্ষা। দেশে জন্মেছি বলেই দেশ আমার নয়। দেশকে যেদিন লুঠ ক'রে নিয়ে জোর ক'রে আমার করতে পারব, সে দিনই দেশ আমার হবে।'[৯]

বিমলার শেষ আত্মকথায় মেজোরাণীর শেষ সংলাপ উদ্ধৃত হয়েছে উপন্যাসে এই ভাবে: '...মেজোরাণী আমাকে গাল দিতে লাগলেন, রাক্ষুসী, সর্বনাশী! নিজে মরলি নে, ঠাকুরপোকে মরতে পাঠালি!'[১০] সত্যজিতের ছবির শেষে আমরা অনুরূপ সংলাপই শুনতে পাই বড়রাণীর মুখে—'রাক্ষসী! তুই মরলি নি—ঠাকুরপোকে মরতে পাঠালি?...'[১১]

উপন্যাসে নিখিলেশ তার দ্বিতীয় আত্মকথায় বিমলা সম্পর্কে বলেছে: 'কত জন্মে কত আয়নায় ক্ষণে ক্ষণে তার ছবি দেখলুম—কত ভাঙা আয়না, বাঁকা আয়না, ধুলোয় অস্পষ্ট আয়না। যখনই বলি 'আয়নাটা আমারই করে নিই' 'বাক্সর ভিতর ভরে রাখি' তখনই ছবি সরে যায়। থাক-না, আমার আয়নাতেই বা কী, আর ছবিতেই বা কী!'[১২]

সন্দেহ নেই, উপন্যাসের নিখিলেশের এই কথাগুলোকে আক্ষরিক অর্থেই গ্রহণ করেছেন সত্যজিৎ। ফলে চলচ্চিত্রে 'মিরর-শটের' একটু আধিক্যই লক্ষ্য করা যায়। একাধিক দৃশ্যে দেখা যায় আয়নার মধ্যে তিনটি মূল চরিত্রের প্রতিবিম্ব।

৭। 'এক্ষণ' পৃষ্ঠা ৩৫, শীত বসন্ত, ১৩৯১।
৮। 'ঘরে-বাইরে', পৃষ্ঠা ২৬।
৯। 'এক্ষণ', ঐ, পৃষ্ঠা ৬৫।
১০। 'ঘরে-বাইরে' পৃষ্ঠা ১২৭।
১১। 'এক্ষণ', ঐ, পৃষ্ঠা ১০৭।
১২। 'ঘরে-বাইরে', পৃষ্ঠা ৪১।

এক্ষেত্রে বলা বাহুল্য, রবীন্দ্র-সাহিত্য থেকে পাঠ নিয়েই চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ তাঁর নিজস্ব ডিটেল রচনা করেছেন। কাজেই, রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করে নয়, তাঁকে স্বীকার করে, গ্রহণ করেই সত্যজিৎকে 'ঘরে-বাইরে' চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে আত্মস্থ করে, স্বীকরণ করতে পারার দুর্লভ ক্ষমতাতেই তিনি বিশেষ প্রশংসার্হ ; সেক্ষেত্রে, 'I did not use a single line of Tagore's dialogue in the Film'[১৩]—সত্যজিতের কাছ থেকে এ-জাতীয় উক্তি আমাদের ব্যথিত করে।

৪

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র, বলিষ্ঠ স্বদেশ-ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে নিখিলেশের চিন্তা ও কর্মপন্থার মাধ্যমেই। নিখিলেশের মতে দেশের আসল শত্রু ইংরেজ নয় ; প্রকৃত শত্রু জমিদার, গোমস্তা আর নায়েবরাই। তাই নিখিলেশের সমস্ত চিন্তা-ভাবনাই আবর্তিত হয়েছে দরিদ্র প্রজার সুবিধা-অসুবিধা, সুখ-দুঃখকে কেন্দ্র করে। আর এই সূত্র ধরেই এসেছে পঞ্চু চরিত্রটি। এ-কারণে উপন্যাসে তার গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু দুঃখের কথা, চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ পঞ্চু চরিত্রটিকেই বর্জন করেছেন।

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসটি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা। 'ঘরে-বাইরে' যখন লেখা হচ্ছে (১৯১৬), তখন বাংলাদেশের স্বদেশী তথা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় চলছে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনেই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত। রবীন্দ্রনাথ এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু এই আন্দোলনের মধ্যে ক্রমশঃ ধ্বংসাত্মক নেতিবাচক দিকটি প্রাধান্য পেতে শুরু করেছিল। এ-ব্যাপারটাকে সমর্থন করতে পারেন নি রবীন্দ্রনাথ। তাই শেষপর্যন্ত তিনি এই আন্দোলন থেকে সরে আসেন। সে-সময় এই আন্দোলনের মূল দুটি দিক ছিল বয়কট ও বর্জন নীতি। কিন্তু 'রবীন্দ্রনাথ শুরু হইতেই বয়কট বা বর্জন-নীতির বিরোধী'[১৪] ছিলেন।

উপন্যাসে সন্দীপ ও তার পাণ্ডাদের কার্যাবলীর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন সন্ত্রাসবাদকে তুলে ধরেছেন। রাজনীতি বিষয়ে সন্দীপদের আদর্শ যে-কোনো ভাবেই হোক ইংরেজ হটানো। এজন্য সে জোরজবরদস্তি, চুরি-ডাকাতি, গরীবদের ওপর অত্যাচার সব করতে পারে। করেও। বিপ্লবীদের এই ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে রবীন্দ্রনাথ তথা নিখিলেশ অত্যন্তই বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন।

১৩। 'চিত্রভাষ', পৃষ্ঠা ২৯, জানুয়ারি জুন, ১৯৮৫।

১৪। 'রবীন্দ্র-জীবনী' ২য় খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৬১।

রবীন্দ্রনাথ বরাবরই গঠনমূলক কাজেই বিশ্বাসী। গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়াই তাঁর আদর্শ। তাঁর এই আদর্শ উপন্যাসে নিখিলেশের বক্তব্য এবং কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক পল্লীমঙ্গল। পল্লীবাংলার সাধারণ মানুষ আজ জমিদার গোমস্তা আর নায়েবদের শোষণে মরতে বসেছে। পঞ্চু সেই পল্লী-বাংলারই এক মৃত-প্রায় মানুষ। উপন্যাসে এই একটি চরিত্রের মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথ গোটা পল্লীবাংলার করুণ, মর্মান্তিক রূপটাকে স্পষ্ট করেছেন।

উপন্যাসের নিখিলেশ, রবীন্দ্রনাথের মতোই প্রজাদরদী জমিদার। তিনি তাঁর গ্রামভাবনা ও পল্লী-সংগঠন চিন্তাকে পঞ্চু চরিত্রটির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তাই নিখিলেশের আত্মকথায় বারবার ঘুরেফিরে এসেছে পঞ্চু প্রসঙ্গ : 'পঞ্চু আমার প্রতিবেশী জমিদার হরিশ কুণ্ডুর প্রজা, মাস্টারমশায়ের যোগে তার সঙ্গে আমার পরিচয়।... পঞ্চুর-স্ত্রী যক্ষ্মায় ভুগে ভুগে মরেছে। পঞ্চুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সমাজ হিসেব করে বলেছে, খরচ লাগবে সাড়ে তেইশ টাকা।' [১৫]

একদিকে বৌয়ের সদ্‌গতি। আর একদিকে মেয়ের বিয়ে। উভয় খরচের টাকা সংগ্রহ করতে পঞ্চু দিশেহারা। কিছু জমি সে বিক্রয় করেছে স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য। আর বাকি জমিটুকু দিয়েছে বন্ধক। এরপর আবার স্ত্রীর সৎকার উপলক্ষে তাকে দান-দক্ষিণে আর ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা করতে হবে। এই চরম সংকটে পড়ে '...অবশেষে, একদিন রাত্রে ছেলেমেয়ে চারটিকে ভাঙা ঘরে ফেলে রেখে সে বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে' [১৬] পড়ে। তার নিজের কথায় : 'এগুলোকে দু'বেলা পেট ভরে খাওয়াব সে শক্তিও নেই, আবার এদের ফেলে রেখে দৌড় মারব সে মুক্তিও নেই, এমন করে বেঁধে মার কেন? আমি কী পাপ করেছিলুম?' [১৭]

পঞ্চুর এই জালবদ্ধতাই ভারতবর্ষ। তার গ্রাম। [১৮]

এমনিতেই পঞ্চুর অবস্থা প্রায় না খেতে পাওয়ার মতোই। 'তার আহারের নিয়ম এই যে, খেতে বসেই সে একঘটি জল খেয়ে পেট ভরায়, আর তার খাদ্যের মস্ত একটা অংশ হচ্ছে সস্তা দামের বীজে-কলা। বছরে অন্তত চার মাস তার এক

১৫। 'ঘরে-বাইরে', পৃষ্ঠা ৫৫-৬৪।

১৬। 'ঘরে-বাইরে', ৬০।

১৭। „ ৬৪।

১৮। এ প্রসঙ্গে শ্রী পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিকই বলেছেন : '...যক্ষ্মা, প্রায়শ্চিত্ত, সমাজের নিদান—এ সবই বিকৃত, ভেঙ্গে পড়া জনসমাজ, ...যে কথা গান্ধীও নিজের মত ক'রে বার বার বলেছিলেন। একটি উপমা ব্যবহৃত হয় পঞ্চু সম্পর্কে, "সে ক্লান্ত গোরুর মতো তার ধৈর্যভাবপূর্ণ চোখ তুলে বললে " 'গোরু' ও 'ধৈর্যভাবপূর্ণ' শব্দ দুটিতে বাস্তব আসে প্রত্যক্ষত : ধ্বস্ত, ক্লান্ত, বাধ্য মৃত প্রায় জনসমাজ। ...নিখিলেশ যখনই প্রকৃতির আলোয় তার ব্যক্তিক সংকট থেকে আশ্রয় খুঁজতে চেয়েছে, তখনই ঐ প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ছাপিয়ে পঞ্চু এসে দাঁড়িয়েছে। ...অনাবিল প্রকৃতির আবরণ ভেদ করে নগ্ন বাস্তবকে দেখা।' 'উপন্যাস রাজনৈতিক', পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৮০-৮৮, 'র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন'।

বেলার বেশি খাওয়া জোটে না।'[১৯] তার উপর সন্দীপের নেতৃত্বে তার বিলিতি কাপড় জোর করে কেড়ে নিয়ে সব পুড়িয়ে দেয় জমিদার হরিশ কুণ্ডু। সেই সঙ্গে দেশসেবক (!) হরিশ কুণ্ডু বিলিতি কাপড় বিক্রয়ের অপরাধে পঞ্চুকে একশ টাকা জরিমানা করে। শেষ পর্যন্ত যদিও নিঃস্ব ও অসহায় পঞ্চুকে জরিমানার হাত থেকে বাঁচাতে ও শোষণ মুক্ত করতে নিখিলেশ পঞ্চুর জমি কিনে নিয়ে তাকে নিজের প্রজা করে নেয়। কিন্তু এতেই কি পঞ্চুরা নিস্তার পাবে ?

এই হচ্ছে ভারতবর্ষের পল্লীবাংলার তৎকালীন চেহারা। পঞ্চু এখানে কোনো ব্যক্তি-চরিত্র নয়। সে শ্রেণী-চরিত্র। এই পঞ্চুই ভারতবর্ষ। বাংলাদেশ। গ্রামবাংলা। এই পল্লীবাংলাকে বাদ দিয়ে দেশের সামগ্রিক উন্নতি কোনমতেই সম্ভব নয়। কিন্তু তার জন্য নিখিলেশকে একাত্ম হতে হবে পঞ্চুদের সঙ্গে। ওদের সুখ-দুঃখকে নিজের বলে ভাবতে হবে। বাইরে থেকে, দূর থেকে কিছু ছুঁড়ে দিলে চলবে না। তাই নিখিলেশ অর্থ দিয়ে পঞ্চুকে সাহায্য করতে চাইলে মাস্টারমশায় বলেন, 'আমাদের বাংলা দেশে পঞ্চু তো একলা নয়। সমস্ত দেশের স্তনে আজ দুধ শুকিয়ে এসেছে। সেই মাতার দুধ তুমি অমন করে টাকা দিয়ে বাইরে থেকে জোগাতে পারবে না।[২০]

আমরা বুঝতে পারি, অন্তত ভাবনার দিক থেকে নিখিলেশ তার শ্রেণী-গণ্ডী ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইছে পঞ্চুর চেতনায়। অবশ্য সে নিজে জমিদারের গণ্ডী ভাঙে না। যেমন ভেঙেছিল রবীন্দ্রনাথেরই 'রক্তকরবী'-র রাজা। নিজের জাল ভেঙে রাজা বেরিয়ে এসেছিল সাধারণের মধ্যে। অবশ্য শ্রেণী-চেতনার ইতিহাসে এমন ঘটনা কতখানি বাস্তবসম্মত, তা ভাববার। তবে নিখিলেশ অন্তত ধীরে ধীরে পঞ্চু-শ্রেণীর মানুষের যন্ত্রণার ভাগীদার হয়ে উঠছিল নিশ্চিত। তা না হলে ব্যক্তিগত চূড়ান্ত সংকটের যন্ত্রণা মুহূর্তেও পঞ্চু-ভাবনা তার চেতনায় বারেবারে ঘুরেফিরে আসতো না। 'একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলন-বিচ্ছেদের সুখ দুঃখ ছাড়িয়ে এ পৃথিবী অনেক দূর বিস্তৃত। বিপুল মানুষের জীবন ; তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে তবেই যেন নিজের হাসিকান্নার পরিমাপ করি।' [২১] পঞ্চু-ভাবনার প্রেক্ষিতেই নিখিলেশের আরো মনে হয়,—'যে প্রকাণ্ড তামসিকতা এক দিকে উপবাসে কৃশ, অজ্ঞানে অন্ধ, অবসাদে জীর্ণ, আর-এক দিকে মুমূর্ষুর রক্তশোষণে স্ফীত হয়ে আপনার অবিচলিত জড়ত্বের তলায় ধরিত্রীকে পীড়িত করে পড়ে আছে, শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে লড়াই করতে হবে। এই কাজটা মুলতুবি হয়ে পড়ে রয়েছে শতশত বৎসর ধরে।' [২২]

১৯। 'ঘরে-বাইরে', পৃষ্ঠা ৫৬।
২০। ঐ
২১। ঐ
২২। " পৃষ্ঠা ৭০-৭১।

নিখিলেশের এইসব ইতিবাচক ভাবনায় ধরা পড়েছে তার স্বদেশ-চেতনার বিশিষ্টতা, চারিত্রিক-দৃঢ়তা ও সংগ্রামী মনোভাব। কিন্তু চলচ্চিত্রে পঞ্চু চরিত্রের অনুপস্থিতি স্বভাবতঃই নিখিলেশ চরিত্রটিকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছে।

উপন্যাসের নিখিলেশের কাছে পঞ্চুই দেশের আসল চরিত্র। মূল শক্তি। এই শক্তি অজ্ঞানে, অবসাদে আর জড়ত্বে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এই শক্তিকে জাগ্রত করে তুলতে হবে। তবেই সম্ভব দেশের কল্যাণ। এইভাবে নিজের গণ্ডী ও তার সংকট থেকে নিখিলেশ বৃহৎ পৃথিবীর আঙিনায় দাঁড়ায় পঞ্চুরই চেতনায়। ফলে এই উপন্যাসে সমগ্র ভারতবর্ষের নেপথ্য-চিত্র রচনা করেছে পঞ্চুই।

আসলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে ইংরেজকে একদিন ভারতবর্ষ ছেড়ে যেতেই হবে। কিন্তু আমাদের দেশের যুগ যুগ সঞ্চিত দারিদ্র্য, অজ্ঞানতা সহজে দূর হওয়ার নয়। লড়তে হবে এদেরই বিরুদ্ধে। তাই নিখিলেশ বলে, 'আমার ভারতবর্ষ কেবল ভদ্রলোকেরই ভারতবর্ষ নয়। আমি স্পষ্টই জানি আমার নীচের লোক যত নাবছে ভারতবর্ষই নাবছে, তারা যত মরছে ভারতবর্ষই মরছে।' [২৩]

এই বোধ থেকেই নিখিলেশ অনুভব করে পঞ্চুই দেশের লক্ষকোটি মানুষের প্রতিনিধি। তার সমস্যাই দেশের আসল সমস্যা। পঞ্চুকে উদ্ধার করতে পারলে দেশের সমস্যার হবে সমাধান। আসল কাজই তো দেশগঠন। পঞ্চুকে নিয়েই করতে হবে সে কাজ। সে কাজ করতে হবে পঞ্চুদেরই নিয়ে। কারণ, পঞ্চুই 'বাংলার সমস্ত গরীব রায়তের প্রতিমূর্তি।' [২৪] তাই অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও অন্ধ তামসিকতা থেকে পঞ্চুকে উদ্ধার করার মধ্যেই দেশের আসল কাজের সন্ধান পায় নিখিলেশ। সে যথার্থই বোঝে, পঞ্চুর সমগোত্রীয় মানুষদের মুক্তিই দেশের প্রকৃত মুক্তি। ফলে নিখিলেশের কাছে পঞ্চু হয়ে ওঠে দেশের সমস্যাক্লিষ্ট এক প্রতীকী চরিত্র। তাই পঞ্চুর মুক্তি এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধের চেষ্টায় নিখিলেশ তার জীবন উৎসর্গ করে। অথচ যে চরিত্রটিকে অবলম্বন করেই নিখিলেশের এই মহানুভবতার প্রকাশ, চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ সেই পঞ্চুকেই বাদ দিয়েছেন। ফলে রবীন্দ্র-মতাদর্শপুষ্ট নিখিলেশ চরিত্রটির বিশেষ মাত্রা চলচ্চিত্রে আদৌ ধরা পড়ে নি।

৫

সত্যজিতের 'ঘরে-বাইরে' ছবিতে সন্দীপকে একাধিক দৃশ্যে দেখা যায় বিমলার পদপ্রান্তে প্রেম-ভিক্ষা-রত অসহায় অবস্থায়। কিন্তু উপন্যাসের সন্দীপ

২৩। 'ঘরে-বাইরে' পৃষ্ঠা ৫৭।
২৪। ৫৪।

চরিত্রে রয়েছে এক 'বিশেষ' দৃঢ়তা। সন্দীপ প্রাথমিক পর্যায়ে মহিলাকে আকৃষ্ট করার নানা অভ্রান্ত কৌশল অবলম্বন করে সত্য। কিন্তু তারপর চলে অপরপক্ষের ক্রিয়াকলাপ। সন্দীপ সেখানে রসিক দর্শকমাত্র। কখনো বা সক্রিয় অভিনেতাও বটে। তাই এই সন্দীপের কাছে মহিলারাই আসে। সন্দীপ আর তখন মহিলাদের কাছে যায় না। নারী মনের ভাবাবেগকে বাড়িয়ে দিয়ে তার যথার্থ দুর্বল স্থানে সন্দীপ প্রথমে আঘাত করে। অনেকটা লাট্টু ঘুরিয়ে দেবার মতো। লাট্টু প্রথম ঘুরিয়ে দেয় সন্দীপই। তারপর ঠিক সময় বুঝে দড়ি তুলে নিয়ে নিজের কাছে রাখে। তখন থেকে লাট্টু ঘুরতে থাকে তার নিজের তাগিদেই। কেননা পূর্বে এমনই পাক দেওয়া আছে যে, লাট্টুর তখন আর স্থির হ'বার জো নেই।

ব্যক্তিত্ব, দৃঢ়তা এসব সন্দীপ চরিত্রের ভেতরকার সত্য না হলেও, তার সেই দেখানো-দৃঢ়তা, ব্যক্তিত্ব, সর্বোপরি বাক্‌পটুতা অন্য মেয়েদের কাছে বিশেষ আকর্ষণের বিষয় এবং তার প্রতি মেয়েদের আকর্ষণের ওটিই একমাত্র প্রধান বিষয়। উপন্যাসটি থেকে একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি স্পষ্ট করা যেতে পারে,—

'কাপড়ে যখন আগুন লাগে তখন ভয়ে যতই ছুটোছুটি করে আগুন ততই বেশি করে জ্বলে ওঠে। ভয়ের ধাক্কাতেই ওর হৃদয়ের বেগ আরো বেশি করে বেড়ে উঠবে। আরো তো এমন দেখেছি। সেই তো বিধবা কুসুম ভয়েতে কাঁপতে কাঁপতেই আমার কাছে এসে ধরা দিয়েছিল। আর, আমাদের হস্টেলের কাছে যে ফিরিঙ্গি মেয়ে ছিল সে আমার উপর রাগ করলে এক-এক দিন মনে হত সে আমাকে রেগে যেন ছিঁড়ে ফেলে দেবে। সেদিনকার কথা আমার বেশ মনে আছে যেদিন সে চীৎকার করে 'যাও যাও' বলে আমাকে ঘর থেকে জোর করে তাড়িয়ে দিলে— তার পরে যেমনি আমি চৌকাঠের বাইরে পা বাড়িয়েছি অমনি সে ছুটে এসে আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে মেঝেতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। ওদের আমি খুব জানি—।'[২৫]

কিন্তু সত্যজিৎ চলচ্চিত্রে সন্দীপকে যেমন স্বভাব-দুর্বল করে এঁকেছেন, উপন্যাসের সন্দীপ আদৌ তেমন নয়। বরং তার বিপরীতই। সন্দীপের স্বভাবে একটা প্রবল জোর আছে। সে তার স্বভাবের জোর সম্পর্কে অত্যন্তই সচেতন। সে বলে, 'প্রকৃতি আত্মসমর্পণ করবে দস্যুর কাছে। কেননা, চাওয়ার জোর, নেওয়ার জোর, পাওয়ার জোর সে ভোগ করতে ভালোবাসে।...ওরা আমার চোখে-মুখে দেহ-মনে কথায়-ভাবে একটা প্রবল ইচ্ছা দেখতে পায়...সে একেবারে ভরপুর ইচ্ছা—চাই-চাই-খাই-খাই করতে করতে কোটালের বানের মতো গর্জে চলেছে।'[২৬]

২৫। 'ঘরে-বাইরে', সন্দীপের আত্মকথা, পৃষ্ঠা ৩৮।
২৬। ২৬-২৮।

আর এই ইচ্ছের প্রবলতা ব্যাপারটি সাধারণী নারীদের যে বিশেষ পছন্দের তা সন্দীপ ভালো করেই জানে। 'বারবার দেখলুম আমার সেই ইচ্ছার কাছে মেয়েরা আপনাকে ভাসিয়ে দিয়েছে, তারা মরবে কি বাঁচবে তার আর হুঁশ থাকে নি।'[২৭]

সন্দীপের অজানা নয়, মেয়েদের কাছে সাহসিকেরই জয়। তাই সন্দীপ বলে, 'আমি যে চালে চলি তাতে মেয়েদের হৃদয় জয় করতে আমার দেরি হয় না।'[২৮] পূর্বে উল্লিখিত দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি থেকেই আমরা জানতে পারি এই নীতি কার্যকর করেই সে কাছে টেনেছিল বিধবা কুসুমকে। ফিরিঙ্গি মেয়েটিকেও। সন্দীপ বলে, 'আমি বস্তুতন্ত্র।...যা চাই সে খুব কাছে আসবে, তাকে মোটা করে পাব, তাকে শক্ত করে ধরব, তাকে কিছুতে ছাড়ব না—মাঝখানে যা-কিছু আছে তা ভেঙে চুরমার হয়ে ধুলোয় লুটবে, হাওয়ায় উড়বে, এই আনন্দ, এই তো আনন্দ, এই তো বাস্তবের তাণ্ডব-নৃত্য—তার পরে মরণ-বাঁচন, ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ তুচ্ছ! তুচ্ছ! তুচ্ছ!'[২৯]

সন্দীপ তার স্বভাবের জোর সম্পর্কে বিশেষ সচেতন। এই জোরকে অস্বীকার করতে অনেকেই পারে না। পারে নি বিমলাও। সন্দীপ প্রথমে এসেই বিমলাকে দেশ-সেবার জন্য সহযোগিতায় অসংকোচ আহ্বান জানায়। ক্রমশঃ এই আহ্বান একদিন প্রকাশ্য প্রণয়-নিবেদনের রূপ নেয়। কথার জাদুকর সন্দীপ। চতুরও বটে। প্রথমদিকে বিমলাকে মুখে সে বিশেষ কিছু বলে না। স্ত্রী-পুরুষের মিলন-নীতি সম্পর্কিত কিছু মডারণ্‌ বই পড়তে দেয় তাকে। চাতুরী করে নিখিলেশের ছবির পাশেই বসায় নিজের ছবি। নানারকম কৌশলে সন্দীপ ঘনিয়ে তোলে বিমলার মোহাবেশকে। বোঝায়, সে নারী নয়। কোন গৃহের বধূ নয়। নয় কোনো পুরুষের স্ত্রী-ও। কারো সঙ্গে তার কোনো আত্মীয়-বন্ধন নেই। কাজেই, তার কেন সাধারণ নারীসুলভ লজ্জা-সংকোচ থাকবে? সে তো সকল সমাজ-বন্ধন, নীতি-বন্ধনের উর্ধ্বে। দেশব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনের সে এক নেত্রী। কাজেই ব্যক্তিগত জীবনের সংকীর্ণ নৈতিক মাপকাঠির অধীন হওয়া তাকে অন্তত মানায় না। এমন নেত্রীর শাস্ত্রের অনুশাসন বা স্বামিপ্রেমও চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে সন্দীপ বিমলার উপর আপন প্রভাবকে বদ্ধমূল করে। প্রবৃত্তিকেই বাস্তব বলে স্বীকার ও শ্রদ্ধা করাই আধুনিকতা;—এ-কথাই বিমলাকে বারে বারে বোঝায় সন্দীপ।

কপট সন্দীপ এ-ভাবেই বিমলাকে ধীরে ধীরে তার পরিচিত আবেষ্টনী থেকে বাইরে টেনে আনে। তার দাম্পত্যবন্ধনকে করে দেয় শিথিল। অনবরত প্রশস্তির মোহজালে বিমলাকে ধীরে ধীরে আত্মকর্তৃত্ব শূন্য করে তোলে। তখন বিমলার

২৭। 'ঘরে-বাইরে', সন্দীপের আত্মকথা, পৃষ্ঠা ২৮।
২৮। ঐ
২৯। ৬৩।

দশা পূর্বের বিধবা কুসুম আব ফিরিঙ্গে মেয়েটির মতই। ঠিক যেমনটি সন্দীপ চেয়েছিল,—'...ওগো প্রলয়ের পথিক, তুমি পথে বেরিয়েছ, তোমার পথে বাধা দেয় এমন সাধ্য কারো নেই। আমি যে দেখতে পাচ্ছি, আজ তোমার ইচ্ছার বেগ কেউ সামলাতে পারবে না। রাজা আসবে তোমার পায়ের কাছে তার রাজদণ্ড ফেলে দিতে, ধনী আসবে তার ভাণ্ডার তোমার কাছে উজাড করে দেবার জন্যে, যাদের আর-কিছুই নেই তারাও কেবলমাত্র মরবার জন্যে, তোমার কাছে এসে সেধে পডবে। ভালো-মন্দর বিধি-বিধান সব ভেসে যাবে, সব ভেসে যাবে। রাজা আমার, দেবতা আমার, তুমি আমার মধ্যে যে কী দেখেছ তা জানিনে, কিন্তু আমি আমার এই হৃৎপদ্মের উপরে তোমার বিশ্বরূপ যে দেখলুম। তার কাছে আমি কোথায় আছি। সর্বনাশ গো সর্বনাশ, কী তার প্রচণ্ড শক্তি! যতক্ষণ না সে আমাকে সম্পূর্ণ মেরে ফেলবে ততক্ষণ আমি তো আর বাঁচি নে, আমি তো আর পারিনে, আমার যে বুক ফেটে গেল। ...

বলতে বলতে সে চৌকির উপর থেকে মাটির উপর পডে গিয়ে আমার দুই পা জডিয়ে ধরলে। তার পরে ফুলে ফুলে কান্না—কান্না—কান্না!' ৩০

অথচ সত্যজিতের ছবিতে দেখি ঠিক এর বিপরীত-দৃশ্য। বিমলার এই অসহায় আত্মসমর্থনের পরিবর্তে, সন্দীপই কাঙালের মতো বিমলার পায়ে এসে পড়েছে। উপন্যাসের সন্দীপের ব্যক্তিত্বের বিশেষ জোর ব্যাপারটা চলচ্চিত্রে অনুপস্থিত হওয়ায়, সন্দীপ-চরিত্রের মাত্রা নিঃসন্দেহে লঘু হয়ে গ্যাছে।

৬

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে সন্দীপকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলিয়েছেন,—রাবণ পৌরুষদৃপ্তভাবে কাছে টানলে সীতা স্বেচ্ছায় তাঁর অঙ্কশায়িনী হতেন। হতেন কি হতেন না, সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। তবে সন্দীপ অন্তত এটা বিশ্বাস করে। মানেও। তার আচার-আচরণ, কথাবার্তা, পূর্বে দু'টি মহিলার সঙ্গে তার সম্পর্কের উল্লেখ (ফিরিঙ্গি মেয়েটি ও বিধবা কুসুম), সর্বোপরি মিনি নেওয়ার সময় বিমলার দিকে 'বিশেষভাবে' ছুটে যাওয়া ইত্যাদি সন্দীপের দৈহিক কামনাকেই স্পষ্ট করে।

আর সন্দীপ তার লোভকে কখনো গোপনও করতে চায় নি। লোভ-লালসা, কামনা-বাসনার কথা অকপটে বলতে তার বিন্দুমাত্র লজ্জা বা কুণ্ঠা নেই। বরং এ নিয়ে লজ্জা পাওয়াটাই তার কাছে লজ্জার। রাবণ সম্পর্কে সন্দীপের ঐ নিজস্ব ধারণার কথা নিশ্চয়ই সত্যজিতের অজানা ছিল না। আর সেজন্যই সন্দীপের মুখে তিনি 'আমি রাবণের চেলা' সংলাপটি বসান।

৩০। 'ঘরে বাইরে', সন্দীপের আত্মকথা পৃ. ৭৯ ৮০।

কাজেই চলচ্চিত্রে বিমলা-সন্দীপের দৈহিক ঘনিষ্ঠতা দেখানোর সুপ্তবীজ সত্যজিৎ মূল-কাহিনীর সন্দীপ চরিত্রেই পেয়েছেন। এক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন, ভিন্ন জায়গায়। তা সন্দীপের দিক থেকে নয়। বিমলার পক্ষ থেকে।

বলাবাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে এমন কোনো চুম্বন-দৃশ্য নেই। তবে উপন্যাসে নেই বলেই চলচ্চিত্রে আসবে না, তেমন কোনো বাধ্য-বাধকতাও দেখি না। অবশ্য এমন ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, সে দৃশ্যের প্রাসঙ্গিকতা কতটুকু? উপন্যাসে তেমন ঘটনা না থাকলেও, উপন্যাসের সেই চরিত্রের মধ্যে তেমন ঘটনা ঘটানোর সম্ভাবনা কতখানি নিহিত ছিল? সেদিক থেকে বলতে গেলে বলতেই হয়, সন্দীপের পক্ষে এ স্থূলতা নিতান্তই স্বাভাবিক। সন্দীপ-চরিত্রে এমন স্থূলতার ইঙ্গিত উপন্যাসের একাধিক স্থানে আছে। বিমলা তার আত্মকথায় সন্দীপ সম্পর্কে লিখেছে : '...তিনি অগ্নিশিখা না মানুষ সে আমি ভুলে গিয়ে-ছিলুম। ... আমার ভয় হতে লাগল এখান সন্দীপ ছুটে এসে আমার হাত চেপে ধরবেন। কেননা তাঁর হাত চঞ্চল আগুনের শিখার মতোই কাঁপছিল, আর তাঁর চোখের দৃষ্টি আমার উপর যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতো এসে পড়ছিল।' ৩১

আর এক জায়গায় বিমলা বলেছে : 'পরক্ষণেই সে লাফ দিয়ে উঠে আমাকে ধরতে এল। এমন সময় বাইরে জুতোর শব্দ শোনা যেতেই সন্দীপ তাড়াতাড়ি চৌকিতে ফিরে এসে বসল। ৩২ মোহর-প্রাপ্তি উপলক্ষে সন্দীপের বিমলার দিকে ধেয়ে-আসা প্রসঙ্গে বিমলা লিখেছে, '...তার মুখে চোখে হঠাৎ যে মত্ততা ফেনিয়ে উঠল সে তো, মনে হল,...।' ৩৩

এ-সময়ে সন্দীপ ছুটে এসেছিল বিমলাকে আলিঙ্গন করতেই। বিমলার তা বুঝতে ভুল হয় নি। তৎক্ষণাৎ বিমলা সন্দীপকে দূরে ঠেলে ফেলে দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে : '...সে চৌকি থেকে লাফিয়ে উঠে আমার কাছে ছুটে এল। কী তার মতলব ছিল জানি নে।...আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে সন্দীপকে ঠেলা দিলুম।'৩৪

বলাবাহুল্য, সন্দীপের এই দৈহিক কামনাকে কখনই প্রশ্রয় দেয় নি বিমলা। এর প্রমাণ মিলবে আর একটি দৃশ্যেও,—'সন্দীপ আমার মুখের উপর তার উজ্জ্বল চোখ দুটো তুলে বসে রইল, দেখতে তার চোখ যেন মধ্যাহ্ন-আকাশের তৃষ্ণার মতো জ্বলে উঠতে লাগল। তার পা দুই-একবার চঞ্চল হয়ে উঠল ; বুঝতে পারলুম সে উঠি-উঠি করছে, এখনি সে উঠে এসে আমাকে চেপে ধরবে।... প্রাণপণ শক্তিতে আপনাকে চৌকি থেকে ছিঁড়ে নিয়ে উঠেই দরজার দিকে ছুটলুম।' ৩৫

৩১। 'ঘরে-বাইরে' পৃষ্ঠা ৪০।
৩২। " ৯৯।
৩৩। " ৯৪।
৩৪। " ৯৩।
৩৫। " বিমলার আত্মকথা, পৃষ্ঠা ৯৯।

সন্দীপের চুম্বনে এই বিমলার নিপ্রতিবাদ আত্মসমর্পণ সত্যজিৎ স্ক্রিন জুড়ে কিভাবে দেখান? সন্দীপের চুম্বনে কোনো রকম বাধা না দিয়ে, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ না করে (যা সে ইতিপূর্বে বার বার করেছে), দ্বিধা-সংকোচ-অপরাধ-বোধে না ভুগে বরং তা সানন্দে-সাগ্রহে ভোগ করাটা একটু অস্বাভাবিকই মনে হয়। অন্ততঃ রবীন্দ্র-সৃষ্ট বিমলা চরিত্রের মহিমা এতে নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে করি।

চুম্বন-দৃশ্যে আপত্তি নয়। আপত্তি নয় সন্দীপের চুম্বনেও। আপত্তি, সন্দীপের চুম্বনকে সম্পূর্ণ দ্বিধাহীনভাবে সাগ্রহে বিমলার গ্রহণ করাটাতে। যা রবীন্দ্র আদর্শের প্রেক্ষিতে মেনে নেওয়া যায় না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই বিমলা সম্পর্কে আমাদের জানিয়েছেন : 'বিমলার struggle নিজেরই শ্রেয়ের সঙ্গে প্রেয়ের।' ৩৬

অবশ্য সত্যজিৎ লিখেছেন,—'চুম্বনের দরকার ছিল, এটা খুবই প্রয়োজনীয়, মনে হয়েছে আমার কাছে। এ-ছাড়া বিমলার 'সারেণ্ডার' সম্পূর্ণ হতে পারে না। আবার দেখুন চুম্বনের পরেই সন্দীপ টাকার কথা বলছে। সন্দীপের চরিত্র এক্ষেত্রে কিছুটা বোঝা যায়।' ৩৭

সন্দীপের দিক থেকে সত্যজিৎ এটা ঠিকই বলেছেন। কিন্তু রবীন্দ্র-সৃষ্ট নারীচরিত্রের 'সারেণ্ডার'-এর জন্য চুম্বন আবশ্যিক,—এ-কথা আমরা আদৌ মনে করি না।

৭

সত্যজিতের 'ঘরে-বাইরে' ছবির পরিণতিতে বিমলার বৈধব্য-বেশ নিয়ে সমসময়ে যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ, উপন্যাসে নিখিলেশের মৃত্যুর কোনো স্পষ্ট উল্লেখ নেই। তবুও আমরা মনে করি সত্যজিতের এই ভাবনা যথার্থই। মূল কাহিনীতে যা ঘটেছে সেটাই সব নয়। যা ঘটতে পারতো বা ঘটার সম্ভাবনা ছিল, তেমন কথাও বলার অবশ্যই অধিকারী চলচ্চিত্র-স্রষ্টা। মহৎ পরিচালকের চলচ্চিত্রে অনেক সময় ধ্রুপদী কাহিনীও আবার নতুন করে সৃষ্টি হয়ে ওঠে।

শ্রীযুক্ত অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'উপন্যাসে নিখিলেশ যে মারা গেল তা রবীন্দ্রনাথ দেখান নি উপন্যাস যেন শেষ হয়েছে 'open ended' ধরণে তাকে ছবিতে এত 'সুসমাপ্ত' বা 'closed' ধরণের দেখানো কেন হল—এ প্রশ্নের কোনো উত্তর আমি এখনো খুঁজে পাই নি।' ৩৮

৩৬। 'প্রবাসী' বৈশাখ ১৩৪৮।
৩৭। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ১১.১.'৮৫।
৩৮। 'চিত্রনাট্যে স্বাধীনতা সত্যজিৎ রায়', 'দেশ', ২রা মে, ১৯৯২।

ঠিকই। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের কোথাও নিখিলেশের নিশ্চিত-মৃত্যুর উল্লেখ নেই। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্র-মানসিকতা বা রবীন্দ্র-জীবন-দর্শন আর সেই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের একাধিক রচনার কথা মাথায় রেখেই বলা যেতে পারে, নিখিলেশের মৃত্যুই রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত ছিল।

রবীন্দ্রনাথের মতে, 'মৃত্যুতেই ট্র্যাজেডি নহে।' যথার্থই। যে মরেই গেল, তার আবার ট্র্যাজেডি কিসের? পরিবর্তে, প্রতিক্ষণ যন্ত্রণা ভোগের মধ্যদিয়ে বেঁচে থাকলো যে, ট্র্যাজেডি তো তারই। উপন্যাসে নিখিলেশ রবীন্দ্রনাথের মতাদর্শপুষ্ট চরিত্র। তাঁর আদর্শের ধারক, বাহক, মুখপাত্র। সেই মানুষকে অনুক্ষণ যন্ত্রণা দিয়েছে বিমলা। স্বভাবতঃই বিমলার আচার-আচরণ, কাজকর্ম রবীন্দ্রনাথের মানসিক সমর্থন পেতে পারে না। পায়ওনি উপন্যাসে। কিন্তু তা পায় নি বলেই তিনি বঙ্কিমের মতো বিমলাকে বিষ খাওয়াতে[৩৯] বা গুলি করে মারার[৪০] আদৌ পক্ষপাতী নন। কেননা, নীতি অপেক্ষা শিল্পই রবীন্দ্রনাথের কাছে বরাবর বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। তাই, কার্য-কারণ সূত্রে, অনিবার্য স্বাভাবিক ঘটনা পরম্পরার মধ্যদিয়ে 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশের মৃত্যুই ঘটেছে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় বিষয়। তাঁর অনেক রচনারই পরিসমাপ্তি ঘটেছে মৃত্যুর মধ্যদিয়ে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে-সব মৃত্যু হয়ে উঠেছে বিশেষ তাৎপর্যবহও। মূঢ় মানুষ বা ক্ষণকালের জন্য হলেও ভ্রান্ত-পথে চালিত মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর চেষ্টা করে কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সজ্জন। কিন্তু মোহে আচ্ছন্ন মূঢ় মানুষ সেই মহান পুরুষকে অনেক সময়ই ঠিকঠাক বুঝতে পারে নি। এমনকি তাদেরই নির্বুদ্ধিতায়, কখনো-বা তাদেরই হাতে সেই মহদাশয় ব্যক্তির মৃত্যুও ঘটেছে। তখন সকলের ভুল ভেঙেছে। তারপর তারা পেয়েছে সঠিক পথের সন্ধান। কাজেই যে-সব ক্ষেত্রে মূঢ় মানুষের ভ্রান্তিমোচনের জন্য, তাদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করতে, সেই মহা-পুরুষের মৃত্যু বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। এমন ঘটনা রবীন্দ্র-রচনায় ঘটেছে একাধিকবার। বিশেষ করে তাঁর নাটকে। কবিতায়ও। কয়েকটি সূত্রাকারে তা দেখানো যেতে পারে :

(ক) 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসে (১৮৮৩) [নাট্যরূপ : প্রায়শ্চিত্ত-১৯০৯] রায়গড়ের রাজা প্রতাপাদিত্যের স্নেহময় খুল্লতাত বসন্ত রায়ের আত্মদানে রাজা প্রতাপাদিত্যের চিত্ত শোধন ঘটেছে।

(খ) 'বিসর্জন' নাটকে (১৮৯০) জয়সিংহের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে উত্তরণ ঘটেছে রঘুপতির।

৩৯। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বঙ্কিম কুন্দনন্দিনীর ক্ষেত্রে যা করেছেন।

৪০। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের রোহিনীর কথা এক্ষেত্রে মনে পড়ে।

(গ) 'মুক্তধারা' নাটকে (১৯২২) মহৎ-মনের মানুষ অভিজিতের প্রাণদানের মধ্যদিয়েই উত্তরকূটের রাজা রণজিতের নবজন্ম ঘটেছে।

(ঘ) 'রক্তকরবী' নাটকে (১৯২৬) রঞ্জনের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে রাজা তাঁর ভ্রান্তি বুঝতে পারেন।

(ঙ) 'শিশুতীর্থ' নামের বিশিষ্ট দীর্ঘ-কবিতাটিতেও দেখি, অধিনেতার মৃত্যু ঘটেছে। এখানেও তার মৃত্যু বিফলে যায় নি। মৃত্যুর মধ্যদিয়েই তিনি হয়ে উঠেছেন 'মহা-মৃত্যুঞ্জয়।' তার মৃত্যুই ভ্রান্তপথের পথিকদের অনুতাপ, অনুশোচনা, অপরাধ বোধের অনলে পুড়িয়ে সম্পূর্ণ মানুষ করে তোলে। ফলে বিশৃঙ্খল জনতা শৃঙ্খলিত হয়। বড়ো-মিথ্যার বিপরীতে নিঃস্বার্থ আত্মদানে তাদের নবজন্ম ঘটে।

এই সূত্র ধরেই বলা যেতে পারে যে, 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে বিমলার ভুলের (কৃতকর্মের) প্রায়শ্চিত্ত (শাস্তি) স্বরূপ নিখিলেশের মৃত্যুই স্বাভাবিক। এই মৃত্যুই বিমলার ভ্রান্তি-মোচনের সহায়ক হবে। তাই, সত্যজিতের ছবিতে বিমলার বৈধব্য-বেশ অসঙ্গত নয়। বরং তা নিতান্তই সঙ্গত। স্বাভাবিক। বিশেষ অর্থবহও বটে।

অবশ্য সত্যজিৎ নিজে বলেছেন, 'মূল রচনায় কাহিনীর শেষটা অস্পষ্ট—নিখিলেশ বাঁচল কি বাঁচল না। আমি তার মৃত্যু দেখিয়েছি।' মূল রচনায় কাহিনীর শেষটা অস্পষ্ট? আমরা তা মনে করি না আদৌ। বরং যথেষ্টই স্পষ্ট। আর সেটা 'ঘরে-বাইরে' নিয়ে দীর্ঘকাল গবেষণা করেও সত্যজিৎ বোঝেন নি,—এটা মেনে নিতে কষ্ট হয়। আমাদের ধারণা, রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট বুঝেই তিনি বিমলাকে বিধবা দেখিয়েছেন। সেটা তাঁর বিশেষ কৃতিত্বই। তবু কেন তিনি 'শেষটা অস্পষ্ট' বললেন, বুঝলাম না। আর যদি তাঁর সত্যই 'অস্পষ্ট' মনে হওয়া সত্ত্বেও এই পরিণতি দান করে থাকেন, তবে বলবো তিনি নিজের অজান্তে যথার্থ রবীন্দ্রানুসরণই করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের পরিণতিতে নিখিলেশের গুরুতর আহত হওয়ায় সংবাদ দিয়েছেন, নিশ্চিত মৃত্যুর কথা বলেন নি সত্য; কিন্তু তবু সেখানকার বর্ণনা মৃত্যুর পক্ষেই অনুকূল আবহ সৃষ্টি করেছে নিঃসন্দেহে,—'...করলি কী ছুটু, কী সর্বনাশ করলি? ঠাকুরপোকে যেতে দিলি কেন। ...রাক্ষুসী, সর্বনাশী! নিজে মরলি নে, ঠাকুরপোকে মরতে পাঠালি! দিনের আলো শেষ হয়ে এল। জানালার সামনে পশ্চিম-দিগন্তে গোয়ালপাড়ার ফুটন্ত শজনে গাছটার পিছনে সূর্য অস্ত গেল। ... আমি যে আমার ভাগ্যের প্রতীক্ষা করছি। ...মনে হল একটা প্রকাণ্ড কালো অজগর এঁকে বেঁকে রাজবাড়ির গেটের মধ্যে ঢুকতে আসছে। ...খবর ভালো নয়। ...ডাক্তার বললেন, কিছু বলা যায় না।' [৪১]

৪১। বিমলার আত্মকথা, পৃষ্ঠা ১২৯ ২৮।

'সর্বনাশ', 'রাক্ষুসী', 'সর্বনাশী', মরতে-পাঠানো, দিনের আলো নিবে আসা, সূর্যের অস্ত যাওয়া, ভাগ্যের প্রতীক্ষা করা, কালো অজগরের প্রবেশ এবং 'খবর ভালো নয়' ও 'কিছু বলা যায় না'—এ-সবই নিখিলেশের মৃত্যু-বার্তাই বহন করে আনে।

প্রখ্যাত সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য মনে করেন, 'অনুমান করা যায় যে ঔপন্যাসিক নিখিলেশের জন্য চরম দণ্ড বিধান করেন নাই।' [৪২]

আমাদের অবশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত-কথাই মনে হয়। রবীন্দ্র-নাটকের স্বভাবানুযায়ীই নায়কের আত্মদানে জীবনের জটিলতার মীমাংসা সাধন করা হয়েছে এই উপন্যাসে। বিমলার মুক্তিও এসেছে নিখিলেশের আত্মদানে।

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে বিমলার মুখে একাধিকবার সিঁদুর-প্রসঙ্গের উল্লেখ যেন তার আসন্ন-বৈধব্যেরই পূর্বাভাষ। উপন্যাসটি শুরুই হয়েছে এই সিঁদুর-প্রসঙ্গ দিয়ে : 'মা গো, আজ মনে পড়ছে তোমার সেই সিঁথের সিঁদুর, চওড়া সেই লাল পেড়ে শাড়ি, ...পথে কালো মেঘ কি ডাকাতের মতো ছুটে এল? সেই আমার আলোর সম্বল কি এক কণাও রাখল না?' [৪৩]

মায়ের সিঁথির সিঁদুরের স্মৃতি বিমলার জবানীতে শেষেও আবার এসেছে। বোধ করি, এই 'সিঁথের সিঁদুর'-এর বার বার উল্লেখ; 'লালপেড়ে শাড়ি', 'কালো মেঘ', 'আলোর সম্বল...এক কণা'-ও না-রাখা,—বিমলার অনাগত বৈধব্যেরই ইঙ্গিতবহ।

উপন্যাসের শুরুতেই প্রকাশ পেয়েছে, সিঁদুরের মূল্য রাখতে চাওয়ার আন্তরিক আর্তি। সিঁদুর, স্বামীর প্রতি ভালবাসার চিহ্ন বা স্মারক। তার অবমাননা করেছে বিমলা। এজন্য অপরাধবোধে ভুগেওছে সে ('...কেবলই মনে হতে লাগল, আমি মরলেই সব বিপদ কেটে যাবে। আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি সংসারকে আমার পাপ নানা দিক থেকে মারতে থাকবে।')[৪৪]

সিঁদুরের মর্যাদা রাখতে না পারায় সম্ভবতঃ একসময় বিমলার মনে আশঙ্কা জেগেছে, এজন্য তাকে চরম ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। তা না হলে সিঁদুর নিয়ে বারে-বারে ঐ করুণ আর্তি কেন?

এ-ব্যাপারটি নিশ্চয়ই সত্যজিতেরও দৃষ্টি এড়ায় নি। তাই দেখি, একটা শটে সত্যজিৎ টেবিলের উপর পড়ে থাকা বিমলার আধখোলা সিঁদুরের কৌটোর উপর স্লো জুম করেছেন। লাল টকটকে কিছু সিঁদুর উপচে পড়ে আছে। সিঁদুরের এই

৪২। 'রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা,' ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৪৩, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী।
৪৩। 'বিমলার আত্মকথা', পৃষ্ঠা ৭।
৪৪। ঐ " ১২৯।

অমর্যাদা, অপচয় ব্যাপারটার প্রেরণা সত্যজিৎ, বলা বাহুল্য, রবীন্দ্র-উপন্যাস থেকেই পেয়েছেন।

আরও দু'একবার সিঁদুর-প্রসঙ্গ এসেছে বিমলার আত্মকথায় : 'মনে আছে, ভোরের বেলায় উঠে অতি সাবধানে যখন স্বামীর পায়ের ধুলো নিতুম তখন মনে হত আমার সিঁথের সিঁদুরটি যেন শুকতারার মতো জ্বলে উঠল।' [৪৫]

সিঁদুরের প্রতি এই সতর্কতা, দুর্বলতা, মোহময়তা পরিণতিতে বিমলার নিশ্চিত বৈধব্যেরই পূর্বাভাষ।

অথচ এই প্রসঙ্গে ডঃ অশ্রুকুমার সিকদারের মনে হয়েছে, বিমলা তার আত্ম-কথা শুরু করেছে 'উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাব রমণীয় পরিণামের পরে।'[৪৬] 'রমণীয় পরিণাম' কোন্‌টা ঠিক বুঝলাম না? বিশেষ করে বিমলার পক্ষে?

উপন্যাসে নিখিলেশের পরিণতি সম্পর্কে ডঃ নিমাই চন্দ্র পাল লিখেছেন : '...অস্তমুখী সূর্যই বুঝি স্বয়ং নিখিলেশ। ...সূর্যকে মেঘ কিছুক্ষণ আড়াল করে, সূর্য অস্তও যায়। কিন্তু সূর্যের মৃত্যু? অকল্পনীয়।'[৪৭] অর্থাৎ তাঁর মতে মূল উপন্যাসে নিখিলেশের মৃত্যু অকল্পনীয়। ডঃ পালের এ কথাটি আমরা মানতে পারলাম না।[৪৮] আমাদের ধারণা উপন্যাসে নিখিলেশের মৃত্যুই স্বাভাবিক।

আবার ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, 'ভ্রাতৃস্নেহের সোপান বাহিয়াই সে পতিপ্রেমের মন্দিরে পুনরারোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।' [৪৯] কিন্তু আমরা তা মনে করি না। অবশ্য যদি ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ভাবজগতে বা মানসলোকে মিলনের কথা বলে থাকেন, সেটা আলাদা ব্যাপার। যেমন দেখেছি 'শিশুতীর্থ' কবিতায় অধিনেতা, মৃত্যুর মধ্যদিয়ে 'মহা-মৃত্যুঞ্জয়' হয়ে উঠেছেন। রবীন্দ্রনাথের একাধিক নাটকেও এমন ঘটনা ঘটেছে। আমাদের মনে হয় বিমলার ক্ষেত্রেও তেমনই চিত্ত-শোধন ঘটেছে নিখিলেশের আত্মদানেই।

চিত্তশোধন ঘটার পর বিমলা যে 'পতিপ্রেমের মন্দিরে পুনরারোহণ' করেছে, সে মন্দির দেবতাহীন। বিগ্রহশূন্য। এই শূন্যতার হাহাকার একদিন নেমে

৪৫। 'বিমলার আত্মকথা', পৃষ্ঠা ৫।

৪৬। 'আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস', পৃষ্ঠা .০, অরুণা প্রকাশনী।

৪৭। 'রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরে', পৃষ্ঠা ১৯৮, রত্নাবলী।

৪৮। তবে পূর্বোক্ত গ্রন্থেরই অন্যত্র (১৯৯ পৃষ্ঠায়) ডঃ পাল অমূল্য প্রসঙ্গে যা বলেছেন, সে সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ একমত : 'উপন্যাসে অমূল্যর মৃত্যু হলেও ছবিতে অমূল্যর মৃত্যু হয় নি।.. দেশপ্রেমে নিষ্ঠা যে শুধু মৃত্যুই প্রমাণ করে এমনটি নাও হতে পারে। আত্মোৎসর্গের মহিমা নিশ্চয় আছে কিন্তু দেশপ্রেমে নিষ্ঠা নিয়ে বেঁচে থাকা কম গৌরবের নয়। সেদিক থেকে চলচ্চিত্রে অমূল্যের পরিণতি শিল্পানুগ।'

'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', পৃষ্ঠা ১৬৭, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ সং।

এসেছিল নিখিলেশের জীবনেও ('এ ভরা বাদর, মাহভাদর / শূন্য মন্দির মোর')। তার কারণ ছিল বিমলাই। সেই বিমলার ভ্রান্তির প্রায়শ্চিত্তই আজকের নিঃসীম শূন্যতায়। বিমলার আত্মকথায়, উপন্যাসের পরিণতিতে প্রাকৃতিক বর্ণনার মধ্যেও এই শূন্যতার ছায়া দেখি।

নিঃসীম অন্ধকার। পাতা-ঝরা শিমুল গাছ। একা দাঁড়িয়ে। শস্যশূন্য মাঠ। এ-সব চিত্রকল্প বিমলার ভবিষ্যৎ-জীবনের কথাই যেন আমাদের মনে করিয়ে দেয়। একাকী, নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন বিমলার আগামী দিনগুলির প্রায়শ্চিত্তের যন্ত্রণা যেন এই প্রাকৃতিক বর্ণনার মধ্যে ধরা আছে।

রবীন্দ্রনাথের জগতে এই বিচ্ছিন্নতা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর। এই বিচ্ছিন্নতা থেকে বিমলার মুক্তি ঘটতে পারে চরম অভিজ্ঞতার পথে। সেই চরম অভিজ্ঞতাই নিখিলেশের মৃত্যু। সন্দীপদের মাতানো-ক্ষ্যাপানোর ভ্রান্ত-রাজনীতির[৫০] (যাতে সাময়িক যোগ দিয়েছিল বিমলাও) অন্যতম পরিণতি নিখিলেশের আত্মদান। সে-ই সাম্প্রদায়িকতার প্রথম বলি।

---

৫০ এ-প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থ ই বলেছেন, 'নিখিলেশের গুরুতর আঘাত, বিমলা ও সন্দীপ উভয়ে মিলিয়া যে বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়াছে তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল, 'বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', পৃষ্ঠা ১৬৫, ঐ।

সংগীত-ভাবনায় সত্যজিৎ

গৌতম ঘোষ

সত্যজিৎ রায়ের আবহসংগীত

"আজ অবধি যে ক'টা ছবিতে আমি নিজে সংগীত রচনার দায়িত্ব নিয়েছি তার মধ্যে 'চারুলতা'র সংগীত আমার কাছে অপেক্ষাকৃত সাবলীল ও সুপ্রযুক্ত বলে মনে হয়েছে। এর একটা কারণ অবিশ্যি অভিজ্ঞতা। আবহসংগীতের কাজে অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক। ছবির মেজাজ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকলেও কোন্ দৃশ্যে কোন্ বা কোন্ কোন্ যন্ত্রে কোন্ সুর কোন্ লয়ে কোন্ তালে বাজালে সেই মেজাজের সঙ্গে মিলবে, এ জ্ঞান সহজলভ্য নয়। তাই সঙ্গীতের কাজে এখন অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যায়। শেখারও আছে এখনও অনেক কিছুই। বিশেষতঃ বাংলাদেশে—যেখানে জাতীয় জীবনে, মানুষের পোষাক-পরিচ্ছদে, কথাবার্তায় বাড়িঘর দোরের চেহারার কোন স্পষ্ট চরিত্র নেই—সবই যেখানে পাঁচমিশেলি খিচুড়ি, সেদেশের পটভূমিকায় আধুনিক ছবির আবহসংগীত রচনা এক দুরূহ ব্যাপার। অথচ এ চ্যালেঞ্জ এড়ানো চলে না।" এ-কথা বলেছেন সত্যজিৎ রায়।

এই উক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তিনি সিনেমার আবহসংগীত নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন। অথচ তিনি কখনই একজন সংগীত-স্রষ্টা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চান নি।

আমরা জানি যে শৈশব থেকে একটা সাংগীতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে সত্যজিৎ রায় বড হয়েছেন। তাঁর নিজের ভাষায়, "হ্যাঁ আমি সাংগীতিক পরিমণ্ডলের মধ্যেই বড় হয়েছি। আমার বাবার দিক থেকে আমার ঠাকুর্দা উপেন্দ্রকিশোর বেহালা বাজাতেন। অর্গ্যান বাজিয়ে গান গাইতেন, পাখোয়াজ বাজাতেন। আমার মায়ের দিক থেকে আমার প্রমাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্ত একজন বিখ্যাত সংগীত-স্রষ্টা ছিলেন। আমার মামা ছিলেন অতুলপ্রসাদ, মাসি ছিলেন কনক বিশ্বাস, সাহানাদেবী, পিসি ছিলেন মালতী ঘোষাল,—ওই বাবার দিক থেকে আর মায়ের দিক থেকে এমন একটা সাংগীতিক পরিবেশ পাওয়ায় আমার মধ্যেও একটা সাংগীতিক বোধ বা চেতনা অর্থাৎ সংগীতের প্রতি একটা গভীর অনুরাগ বা ভাল-বাসা তৈরি হয়েছিল।

নিজের পরিবার, তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজ, ঠাকুর পরিবারের সংগীতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও তার স্মৃতি, কারণ 'মরি লো মরি' শুনব যখন অমিয়া

ঠাকুরের গলায় তা শুনতে চাইব। সেই যে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে শুনেছি দাঁড়িয়ে গাইতেন আজও আমার কাছে তা স্মৃতি হয়ে আছে।"

শৈশব থেকে মা সুপ্রভা রায়ের গলায় শোনা গান আর পরিবারের নামী-অনামী অনেক সংগীতরসিক ও স্রষ্টাদের সংস্পর্শ বালক সত্যজিতের কানে 'সা' ধরিয়ে দিয়েছিল ও তাল, লয়, মাত্রা সম্পর্কে প্রাথমিক বোধ তৈরি করতে সাহায্য করেছিল।

পরবর্তীকালে সংগীতের প্রতি অনুরাগ ও অধ্যয়ন, বিশেষ ক'রে পাশ্চাত্য মার্গ সংগীত তাঁর কৈশোর ও যৌবনের প্রধান আবেগ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শুধুমাত্র রেকর্ড বাজিয়ে শোনা নয়, বিখ্যাত কম্পোজারদের স্টাফ নোটেশনের বই পড়ে সংগীত উপভোগ ও অধ্যয়ন করা যে সে সংগীত রসিকের কাজ নয়।

সংগীত সম্পর্কে গভীর বোধ ও পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও প্রাথমিক পর্যায়ে সংগীত রচনার কাজে হাত দেন নি। আর যখন দিয়েছেন সেটাও শুধুমাত্র নিজের ছবির জন্য (দুই একটি ব্যতিক্রম—সেক্সপীয়রওয়ালা, হরিসাধন দাশগুপ্ত কয়েকটি তথ্যচিত্র, বাক্সবদল, সন্দীপ রায়ের ছবি ইত্যাদি) ছবির প্রয়োজনে; আর এই কাজ শুরু হয়েছে 'তিনকন্যা' ছবির সময়কাল থেকে। এর কারণ কি?

সত্যজিৎ একদিকে যেমন ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, অন্যদিকে তেমন ছিলেন অত্যন্ত সচেতন শিল্পী। কি করতে যাচ্ছি, কেন করতে যাচ্ছি, কাদের জন্য করব এসব না ভেবে উনি কোনো কাজ করেন নি বলেই আমার ধারণা।

যখনই তিনি ঠিক করলেন যে চলচ্চিত্র হবে তাঁর মাধ্যম, তখন থেকেই চলচ্চিত্রই হয়ে দাঁড়াল তাঁর ধ্যান, জ্ঞান, সাধনা। অন্যান্য মাধ্যম সম্পর্কে তাঁর সম্যক জ্ঞানকে তিনি পুরোপুরিভাবে নিয়োজিত করলেন সিনেমায়। যাতে তাঁর চলচ্চিত্র আরও সংগঠিত হয়, পরিশীলিত হয়। ঐ পর্বে সিনেমা তৈরীর বাইরে আলাদা করে কোনো মাধ্যম নিয়ে কাজ করার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

প্রথম পর্বে নির্মিত ছ'টি কাহিনীচিত্রে এবং ১৯৬১'র গোড়ার দিকে নির্মিত 'রবীন্দ্রনাথ' তথ্যচিত্রে তিনি নিজে সংগীত পরিচালনা বা মৌলিক রচনা করেন নি। তাঁর শিল্পধারার দিকে একটু আলোকপাত করলেই বোঝা যায় যে ওটা ছিল প্রস্তুতি পর্ব। যে কোনো বড মাপের শিল্পীর মতই সত্যজিতের শিল্পকর্মে কোনো ফাঁকি বা সহজে উতরে যাওয়ার জায়গা ছিল না। সিনেমার প্রতিটি বিভাগের ব্যবহারিক দিকটা না জেনে তিনি কখনই কাজে হাত দেন নি; এবং অকপটে স্বীকার করেছেন কোথায় ভুল-ভ্রান্তি ও খামতি ছিল। কিভাবে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে সিনেমার মত একটা জটিল মাধ্যমকে আয়ত্ব করার চেষ্টা করেছেন। এই ক্রমাগ্রসরণ সত্যজিতের সংগীত রচনার মধ্যেও সুস্পষ্ট। সিনেমার জন্য আবহসংগীত কোনো মহান সংগীত রচনা নয়, আর সিনেমাকে বাদ দিয়ে এর

গুরুত্বও প্রায় নেই বললেই চলে ; কিন্তু তা সত্ত্বেও সাবলীল ও সুপ্রযুক্ত আবহসংগীত একটা ছবির ভাব প্রকাশে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। আর এই সংগীত রচনার জন্য এক ধরণের পারদর্শিতার প্রয়োজন আছে। পশ্চিমী চলচ্চিত্রে আবহসংগীতের ক্ষেত্রে তাই ভাস্বর হয়ে আছে অনেক সংগীত রচয়িতার নাম ; এডমুণ্ড মাইজেল, সের্গে ই প্রোকোফিয়েভ, এলমার বার্ণস্টাইন, নিনো রোটা, রেনজো বোসোলিনি প্রমুখ।

আমাদের দেশীয় চলচ্চিত্রে কতিপয় সংগীত পরিচালক সুচিন্তিত আবহসংগীত রচনা করে সুনাম অর্জন করেছেন ও জনপ্রিয়তাও পেয়েছেন।

কিন্তু প্রাক্-সত্যজিৎ যুগে এইসব প্রতিভাবান সঙ্গীত পরিচালকদের প্রধান অন্তরায় ছিল সেইসব ছবির চলচ্চিত্রগুণ। ফলে তাঁদের কাজের ধারাবাহিকতা রাখা সম্ভব হয় নি। সত্যজিৎ রায় একের পর এক ভিন্ন স্বাদের চলচ্চিত্রের মধ্যদিয়ে দেখালেন যে দৃশ্যকল্প, শব্দ, সংলাপ, অভিনয়ের মতই আবহসংগীত পরিচালকের একটা মস্ত বড হাতিয়ার। ঠিকমত প্রয়োগ করতে পারলে সিনেমায একটা নতুন মাত্রা যুক্ত হতে পারে। আবহসংগীত শুধুমাত্র সংগীত নয়। এটা চিত্রনাট্যের মূল থীমেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

সত্যজিতের আবহসংগীতের বিশেষত্ব কি, পরবর্তী প্রজন্মের চলচ্চিত্রকার ও আবহসংগীত রচয়িতারা কি কি জানলে উপকৃত হবেন, সেইসব উপাদনগুলো নিয়ে এবার একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব।

(১) একটা বিষয়বস্তু নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরী হবে ; তা সে কাহিনীভিত্তিক হোক বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত হোক কিংবা প্রামাণ্য কোনো ঘটনা থেকেই হোক। প্রাথমিক পর্যায় হ'ল চিত্রনাট্যের খসডা ও চিত্রনাট্য রচনা। এই প্রাথমিক পর্যায়ে ভেবে ফেলা উচিৎ বিষয়বস্তু ও তার চলচ্চিত্র প্রয়োগে আবহসংগীতের ভূমিকা কি বা প্রয়োজন কতটা। চিত্রনাট্যকারও পরিচালক যদি সংগীত রচয়িতা নাও হন তাহলেও একটা ইঙ্গিত থাকতে পারে মূল থীমের ভাব প্রকাশের জন্য কি ধরণের সাংগীতিক প্রয়োগ প্রযোজন। যদি আদৌ প্রয়োজন না হয়, সেটাও ভাবনায় মধ্যে রাখতে হবে।

এই ভাবনা একাধারে যেমন চিত্রনাট্যের কাঠামোকে সাহায্য করবে আবার পাশাপাশি এককেটা দৃশ্য গঠন, পরিপার্শ্ব ও চরিত্রাবলীর সংমিশ্রণে বা সংঘাতে বিষয়বস্তু অথবা একটা বিশেষ মুহূর্তের ভাব প্রকাশে শব্দের কি ভূমিকা, তার আভাস রাখবে। সেই শব্দ সংলাপ হতে পারে, অন্যান্য সমান্তরাল ও অসমান্তরাল শব্দ হতে পারে, আবহসংগীত হতে পারে অথবা নৈঃশব্দ্যও হতে পারে। চলচ্চিত্র নির্মাণের এই পর্যায়ে চিত্রনাট্যকার-পরিচালকের মাথায় আবহসংগীতের ব্যবহার সম্পর্কে যদি একটা প্রাথমিক

ধারণা থাকে, তাহলে আবহসংগীত চিত্রনাট্যের মূল থীমের অঙ্গ হয়ে ওঠে ; ছবির শেষে গিয়ে শূন্যস্থান পূরণের মত অবস্থা হয় না। সত্যজিৎ লিখেছেন, "এখানে পরিচালকের দায়িত্ব অনেকখানি। ছবির মূল সুরটি পরিচালকের চেয়ে বেশি ভাল করে আর কে জানবে? বিশেষত ছবি যদি নতুন বিষয়বস্তু নিয়ে নতুন আঙ্গিকে রচিত হয় তাহলে সে ছবিতে আবহসংগীতের প্রয়োজন আছে কিনা—বা থাকলে তার প্রকৃতি কেমন হবে তা পরিচালকেরই স্থির করা উচিৎ।"

(২) আমার একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে এই পর্ব শুরু করছি। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে 'সীমাবদ্ধ' ছবির শ্যুটিং চলছে। কলকাতার বহুতল বাড়ীর একটা ফ্ল্যাটের সেট। ফ্ল্যাটের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে রাতের কলকাতার একটা আঁকা সিনারি। চরিত্ররা সংলাপ শেষ ক'রে এবং যা যা করার ক'রে ফ্রেম আউট হল। শট্ তখনও চলছে। ক্যামেরার পেছন থেকে মানিকদার গলা, 'হাওয়া'। ফ্রেমের বাইরে রাখা বড বড ফ্যানগুলো ঘুরতে শুরু করল। হাওয়ায় জানলার পর্দা উডতে লাগল। হয়ত ক্যামেরার একটু মুভমেণ্ট ছিল, ঠিক মনে নেই এখন। তবে এখনও যেটা কানে লেগে আছে তা হ'ল ক্যামেরা অপারেট করতে করতে মানিকদা শিস দিচ্ছিলেন। তখন কিছুই বুঝতে পারি নি। হাতে-কলমে ছবি করতে গিয়ে ধরতে পেরেছিলাম, উনি আবহ-সংগীতের দৈর্ঘ্য ও মুড শট্ চলাকালীন আন্দাজ করে নিচ্ছিলেন।

আবহসংগীতের ভাবনা শ্যুটিং করার সময়ে খুবই কাজে লাগতে পারে। কোনো দৃশ্যে সংলাপের একটা বিরতিতে সংগীত আসবে ও চলে যাবে। পরিচালক হয়ত চান ঠিক ঐ মুহূর্তে অভিনেতা তার অভিব্যক্তিতে বিশেষ একটা ভাব প্রকাশ করুক বা সংলাপের মধ্যেই একটা বিশেষ লয়ে পরবর্তীকালে আবহসংগীত মিশ্রিত হবে। হয়ত প্রয়োজনে পরিচালক অভিনেতাকে বলতে পারেন সংলাপের গতি মন্থর করতে। এই রকম অজস্র সম্ভাবনা ছড়িয়ে থাকে দৃশ্য গঠন ও আবহসংগীতের সম্পর্কের মধ্যে। এ ছাড়াও থাকে আবহসংগীতের প্রয়োগ যদি ভাব প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় হয় তাহলে সেই মত ক্যামেরা মুভমেণ্টের গতি নির্ধারণ করা। ছবির কোনো অংশে হয়ত সংলাপ থাকবেই না—মন্তাজ পদ্ধতিতে কাহিনীর একটা অংশ বলা হবে—আবহসংগীতের প্রয়োজনে। এখানে শট্ টেকিং ও সম্পাদনার ছন্দ আবহসংগীতের ছন্দের সঙ্গে সরাসরি-ভাবে জড়িয়ে পড়বে। এটা দু'রকমভাবে হতে পারে। এক, আবহের ছন্দ-লয় মাথায় রেখে শট্ নেওয়া ও সম্পাদনার টেবিলে শট্ সাজানো। দুই, সম্পাদিত দৃশ্যের সঙ্গে সমন্বয় রেখে আবহসংগীত রচনা করা। আবার

শ্যুটিং ও সম্পাদনার সময়ে অনেক দৃশ্য রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের জাগতিক ধ্বনি একটা সাংগীতিক ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করতে পারে। সব কিছুই নির্ভর করে পরিচালকের রুচি, পরিমিতিবোধ ও প্রয়োগ সম্পর্কীয় ধারণার উপর। সত্যজিতের ভাষায়, "এখানে সুরকারকে একটি কথা মনে রাখতে হয়। সেটা হল এই যে, ছবি প্রধানত চোখে দেখার জিনিস। দৃশ্যবস্তু ছাড়া ছবিতে যা থাকে তার মধ্যে প্রধান হ'ল সংলাপ—কারণ, কাহিনীর অনেকখানিই ব্যক্ত হয় সংলাপের মাধ্যমে। আরও কিছুটা বলা হয় যাবতীয় ধ্বনির সাহায্যে। ঐ বলার কাজে আবহসংগীতের কাজ সবচেয়ে পরে। কারণ সংগীতের ব্যঞ্জনা আছে, কিন্তু পরিষ্কার কোনো ভাষা নেই। এখানে সাযুজ্যের একটা প্রশ্ন আসে। সব কথায় সব সুর বসে না। গান সেখানেই সার্থক যেখানে সুর হ'ল ভাষার ব্যঞ্জক। চলচ্চিত্রের আবহসংগীতও ব্যঞ্জকেরই ভূমিকা গ্রহণ করে—যদি তা সুপ্রযুক্ত হয়।"

(৩) সত্যজিৎ-এর শিল্পকর্ম সুসংবদ্ধ। আগেই বলেছি যে, চিত্রনাট্য ও চিত্রগ্রহণের সময়ে পরিচালকের মাথায় আবহসংগীত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকার ফলে সংগীতের আনাগোনা হয় অত্যন্ত সাবলীলভাবে। সংলাপ ও অন্যান্য ধ্বনির মধ্যে আবহসংগীত মিশ্রিত হয়ে আসে ও মিলিয়ে যায়, করে দেয় এক একটা মুহূর্ত, যুক্ত হয় নতুন ব্যঞ্জনা। আবহসংগীত আলাদা করে কানে লাগে না; পুরো সাউণ্ডট্র্যাকেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ভাব প্রকাশ করে যায়। সত্যজিতের আবহসংগীতের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মত। প্রথমত: সাউণ্ডট্র্যাক আবহসংগীত দ্বারা ভারাক্রান্ত নয়। আগাগোড়াই যদি ছবিতে আবহসংগীত বাজতে থাকে তাহলে এর গুরুত্ব হ্রাস পেতে বাধ্য। আবহসংগীত কোলাহলে পরিণত হয়। সত্যজিতের আবহ গুপ্তবাণের মত; উনি জানেন ঠিক কোন মুহূর্তে তা ছুঁড়তে হবে। দ্বিতীয়ত: সত্যজিতের আবহসংগীত রচিত হয়েছে বিষয়বস্তুর মূল সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। ফলে তাঁর ছবিতে 'থীম' মিউজিকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রায় সবকটা ছবিতেই অনেক ধরণের কম্পোজিশনের ব্যবহার নেই। একটা কি দু'টো মূল সুর ভিন্ন তাল, লয়, মাত্রায় ফেলে যন্ত্রানুষঙ্গ বদলে সারা ছবিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দৃশ্যের মুড অনুযায়ী এমনভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে যে বোঝাই যায় না একই সুর বাজছে। আবার কখনও কখনও সচেতনভাবে একই কম্পোজিশন বার বার ফিরিয়ে আনা হয়েছে, যেমন 'চারুলতা' ও 'অশনি সংকেত' ছবিতে। যখনই ঐ সঙ্গীত আসে দর্শক যেন কিছুর সূত্র পান, ইঙ্গিত পান; একটা বিশেষ অনুভূতি তাঁর অবচেতন মনকে স্পর্শ করে যায়। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা প্রতিটি চলচ্চিত্রকারের শিক্ষণীয়, তা হ'ল শব্দ পুনর্যোজনার কথা মাথায় রেখে

সংগীত রচনা করা ও 'অর্কেস্ট্রা' পরিচালনা করা। ব্যাপারটা আরেকটু পরিষ্কার করা যাক। কোনো একটা পীস্ রচনা করা হ'ল, এবার বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে বা একক যন্ত্রে বাজানো হ'ল, সেটা রেকর্ডিস্ট তাঁর প্রয়োজনে রেকর্ডিং volume-এ রেকর্ড করে নিলেন। কিন্তু শব্দ পুনর্যোজনা মিশ্রণের সময়ে সংলাপ, অন্যান্য ধ্বনি এবং বিশেষ দৃশ্যের মুড অনুযায়ী সেই পীস্‌টা ঠিক কোন volume-এ মিশ্রিত সাউণ্ডট্র্যাকে শোনা যাবে সেটা মূল্যায়ন করাই হচ্ছে আসল ব্যাপার। হয়ত দৃশ্যের চাহিদা অনুযায়ী এমন volume-এর দরকার যেখানে এসে প্রয়োজনীয় chord-গুলো আর শোনাই গেল না। এখানেই প্রয়োজন সংগীত রচয়িতা ও অ্যারেঞ্জারের দক্ষতার। এখানে সত্যজিৎ রায় একেবারে দশ গোল মেরে বসে আছেন। তাঁর রচনা ও অ্যারেঞ্জমেণ্টের পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান সত্যিই অবাক করে দেয়।

সত্যজিৎ রায় আবহসংগীত রচনায় মূলতঃ পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সংগীতের কাঠামোকেই অনুসরণ করেছেন। কারণ এই কাঠামোতে অর্কেস্ট্রা তৈরি করতে অনেক সুবিধা আর দৃশ্যের সীমিত সময়-সীমার মধ্যে একটা রচনাকে বিস্তৃত করা। ধরা যাক, একটা পীসের সময় হচ্ছে সাতচল্লিশ সেকেণ্ড। এরই মধ্যে যন্ত্রের পরিবর্তন হবে, কাউণ্টার পয়েণ্ট আসবে। শট্ পরিবর্তন বা ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে তিন জায়গায় variation হবে; সতেরো সেকেণ্ডে, বত্রিশ সেকেণ্ডে, আবার বিয়াল্লিশ সেকেণ্ডে। পাশ্চাত্য সংগীতের কাঠামোয় এটা খুব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করা যায়। পাশ্চাত্য সংগীত থেকে উনি যেমন অনেক কিছু নিয়েছেন; পাশাপাশি মার্গসংগীতও স্থান পেয়েছে ওঁর আবহে। কোনো একটা রাগ বা গৎ ভেঙে রচনা করেছেন; পাশ্চাত্য সংগীতের melody ও chord মিলিয়ে দিয়েছেন তার সঙ্গে। আবার কখনও নিয়েছেন রবীন্দ্রসংগীতের সুর থেকে, লোকসংগীতের সুর থেকে। সব কিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে তার আবহসংগীতে। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যদিয়ে তিনি তৈরী করতে পেরেছেন নিজস্ব একটা স্টাইল। একটা বইয়ের মলাট দেখেই যেমন চেনা যায়, এটা সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টি। তেমনই আবহসংগীত শুনলেই বোঝা যায়, এটা সত্যজিৎ রায়ের 'কম্পোজিশন'। সত্যজিৎ আবহসংগীত রচনায় মুক্ত বাতাস এনেছেন, গোঁড়ামিকে ভেঙে দিয়েছেন। সত্যিই আবহসংগীত রচনায় কোনো 'জাত বজায় রাখার তাগিদ নেই'। আবহ সংগীত শুধুমাত্র সঙ্গত নয়; একে নিয়ে ভাবতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে এবং ছবির ভাবের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। তাহলেই এই বিমূর্ত অভিব্যক্তির ব্যঞ্জনা উপলব্ধ হবে। সত্যজিৎ রায়ের 'আবহসংগীত প্রসঙ্গ' প্রবন্ধ থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ উদ্ধৃত করে এই রচনা শেষ করছি—

"আবহসংগীতের ব্যবহারে সংগীতের শাস্ত্রীয় ব্যাকরণ নিয়ে গোঁড়ামি সম্পূর্ণ অর্থহীন, কারণ নিছক সংগীত হিসাবে আবহসংগীতের মূল্যায়নের কোন

প্রয়োজনই নেই। যে-কোন যন্ত্রের দ্বারা ছন্দ বা স্বর উত্থাপন সম্ভব, তারই ব্যবহার আবহসংগীতে চলতে পারে। সেতার, সরোদ, পাখোয়াজের সঙ্গে ঘটি বাটি পেয়ালা পিরিচ বাজিয়ে আমারই কোন ছবির সুর রচনা করেছিলেন রবিশঙ্কর। এ ধরণের প্রয়াস সংগীতের আসরে নীতিবিরুদ্ধ পাগলামো বলে মনে হত। কিন্তু এর ফলে যে আবহসংগীত রচিত হল, তা যদি ছবির সঙ্গে তাল রাখতে সক্ষম হয় তবে সে সংগীত শুধু সংগীত নয়—রসোত্তীর্ণও বটে।”

সুভাষ চৌধুরী

সত্যজিতের রবীন্দ্রসংগীত-ভাবনা

এখন থেকে ঠিক পঁচিশ বছর আগে (কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৭৪) সত্যজিৎ রায়'এর প্রবন্ধ "রবীন্দ্রসংগীতে ভাববার কথা" যখন প্রকাশিত হয় তখন বেশ একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। প্রবন্ধ পাঠে ব্যক্তিগতভাবে আমি কেবল যে বিস্মিত হয়েছিলাম তা নয়, বারবার পড়ার তাগিদ অনুভব করেছিলাম। এখন বুঝতে অসুবিধা হয় না এর সঙ্গত দুটি কারণ ছিল। প্রথমত, প্রবন্ধে এমন কতগুলি মৌলিক চিন্তার সূত্র ছিল যা যে কোন রবীন্দ্রসংগীতানুরাগীকে কৌতূহলী করে তুলতে বাধ্য করে। আর দ্বিতীয় লেখাটির বেশ কিছু ক্ষেত্রে ছিল আশ্চর্য স্ববিরোধ। বিদগ্ধমহলে লেখাটি নিয়ে প্রত্যক্ষ আলোচনায় কেউ তেমন আগ্রহ দেখান নি, এমন কি প্রবন্ধের অনেকাংশে যাঁরা ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন তাঁরাও নন; এর কারণ সম্ভবত (এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি) প্রবন্ধের লেখক ছিলেন সত্যজিৎ রায়, যিনি তখনই বিশ্ববিখ্যাত এক ব্যক্তিত্ব।

১৯৮১ সালে 'আজকাল' পত্রিকার পক্ষ থেকে গৌরকিশোর ঘোষ আমাকে অনুরোধ করেন সত্যজিৎ রায়ের একটি সাক্ষাৎকার নেবার জন্য। সেই উপলক্ষে রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ক তাঁর মতামতকে একবার নতুন করে যাচাই করে নেবার সুযোগ পাওয়া গেল, যদিও বিচ্ছিন্নভাবে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা হয়েছে, অবশ্য বিস্তৃতভাবে নয়। সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ রায়ের 'রবীন্দ্রসংগীতে ভাববার কথা' সম্পর্কে যে-সব জিজ্ঞাসা দীর্ঘ দিন ধরে মনের মধ্যে ছিল তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা জেনে নেবার সুযোগ ঘটে গেল। সম্পূর্ণ সাক্ষাৎকারটি ক্যাসেটে ধরা আছে। ক্যাসেট থেকে অনুলিখনটি সত্যজিৎ রায় নিজে পড়ে স্বাক্ষর করে দেবার পর তা 'আজকাল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য, অনুলিখনটি হুবহু ছাপা হয় নি। কিছু কিছু প্রসঙ্গ নিজেই বাদ দিয়েছিলেন তিনি। যতটুকু ছাপা হয়েছিল তা প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রবন্ধের বিশদ ব্যাখ্যান বলা যেতে পারে। এই সাক্ষাৎকারে রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে তাঁর আরো পরিণত মতামত জানার সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক বিষয়ে তাঁর মতামতগুলি এখনো কৌতূহলী করে তোলে। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে সত্যজিৎ রায়ের ভাবনাকে এতখানি গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কতখানি যুক্তিযুক্ত। আসলে

সত্যজিৎ রায় আজন্ম যে সংগীতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেছেন সেখানে রবীন্দ্রসংগীতের একটি বিশেষ স্থান ছিল। এছাড়া পাশ্চাত্য সংগীতের রস পেতে শুরু করেছিলেন কিশোর বয়স থেকেই, পরবর্তীকালে পিয়ানো বাজানো ও স্বরলিপি প্রস্তুত করায় নিজেকে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন। পাশ্চাত্য সংগীতে তাঁর এই শিক্ষা রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে অনেকগুলি নতুন ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছিল বলে মনে হয়। এ কথা স্পষ্ট বোঝা যায় তাঁর নিজের বক্তব্যে। তিনি বলেছেন : গানে রবীন্দ্রনাথের যা একান্ত সৃষ্টি, প্রচলিত নিয়মে তার জাত নির্ণয় করা চলে না, কারণ রবীন্দ্রনাথ জাতের কথা ভাবেন নি। তাঁর লক্ষ্য ছিল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দিকে, এক একটি বিশেষ ভাবকে বিশেষ কথা বিশেষ সুরে-ছন্দে প্রকাশ করার দিকে। জাতের দোহাই যেখানে দেওয়া চলে না, সেখানে চরিত্র রক্ষা করার প্রশ্নটাই বড় হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রাথকেও এই প্রশ্নটাই ভাবিয়ে তুলেছিল। একটি গানের এই যে অবিকল্প রূপের ধারণা, এটা এদেশের নয়। ˇ

বিষয়টি সত্যজিৎ রায়ের বুঝতে অসুবিধা হয় নি, পাশ্চাত্য সংগীতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগের সুবাদে। যাঁদের পাশ্চাত্য সংগীতের কোন প্রত্যক্ষ শিক্ষা নেই তাঁদের বোঝা আর সত্যজিৎ রায়ের বোঝার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য ছিল অবশ্যই। কিন্তু খট্‌কা লাগে যখন তিনি রবীন্দ্রসংগীতের সংজ্ঞা নির্দেশ করেন এইভাবে : 'কোন প্রচলিত রীতি যখন রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন, তখনও তার কথায় বা সুরে বা ছন্দে কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য এনেছেন। ফলে সেগুলিকে অনুকরণ না বলে নবকরণ বলা চলতে পারে। বাংলা তথা ভারতীয় গানের এই নবীকৃত রূপই হ'ল রবীন্দ্রসংগীত।' আবার যখন তিনি বলেন : 'এটাও লক্ষণীয় যে গানেই তাঁর একমাত্র সৃষ্টি যার পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে কাব্যে উপন্যাসের তুলনায় বিবর্তনের মাত্রাটা এতে অনেক কম।' এই বাক্যটিতে এসে হঠাৎ একটি ধাক্কা খেতে হয়। সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সংগীত সৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় থাকলে একথা কেমন করে মেনে নেওয়া যাবে। এই বক্তব্য কেবল বিতর্কিত ব্যক্তিগত ভাললাগা-মন্দলাগার প্রশ্ন নয়। সাংগীতিক বিশ্লেষণে একথা এতখানি স্পষ্ট যে, এ নিয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। এটাই মনে হয় তাঁর নিজের কথায় : 'রবীন্দ্র-সংগীতের সামগ্রিক চর্চার সুযোগ বা সময় ছিল না।' সময় তাঁর ছিল না ঠিকই, কিন্তু সুযোগ! আমার মনে হয়, আসলে তাঁর তেমন কোন প্রয়োজন বা তাগিদ ছিল না।

রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে তাঁর একটি ভাবনার কথা বলেছেন : '...এই কারণেই মনে হয় রবীন্দ্রনাথ রাগসংগীতের রীতিটা তেমনভাবে তলিয়ে দেখেন নি। তিনি গান রচনার কাজে লেগেছিলেন প্রধানত বিদ্রোহের ভাব নিয়েই। প্রাচীন রীতিকে ভেঙে ফেলতে হবে, এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।'

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর গান সম্পর্কে এমন ধারণাকে কখনো প্রশ্রয় দিয়েছেন বলে জানা নেই, বরং তাঁর বক্তব্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরের আভাস মেলে। তিনি বলছেন, "গান রচনায় আমি নিজে যা করেছি, কোন পথে গেছি, গানের তত্ত্ববিচারে তার দৃষ্টান্ত ব্যবহার করা আবশ্যক। আমার চিত্তক্ষেত্রে বসন্তের হাওয়ায় শ্রাবণের জল-ধারায় মেঠো ফুল ফোটে, বড়ো-বড়ো বাগান-ওয়ালাদের কীর্তির কাছে তার তুলনা কোর না।" আর রবীন্দ্রনাথ রাগসংগীতের রীতিটা তেমনভাবে তলিয়ে দেখেন নি বাক্যটিও কতখানি গ্রহণযোগ্য? রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন এই রাগসংগীত "আরো বহু কক্ষবিশিষ্ট হোক, তার ভিত্তিসীমার মধ্যে বহু চিত্রবৈচিত্র্য ঘটুক, তা হলে সংগীতে আমাদের প্রতিভা বিশ্বজয়ী হবে।" মনে হয় ৭ জানুয়ারী ১৯৩৫-এ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে একটি লেখা চিঠির বয়ান সত্যজিৎবাবুর এমন মন্তব্যের উৎস। রবীন্দ্রনাথের উক্তি কিন্তু এখানেও সামগ্রিকভাবে তাঁর বক্তব্যের পরি-প্রেক্ষিতে অনালোচিত থেকে গিয়েছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এখানে রবীন্দ্রনাথ লিখিত ঐ পত্রটির আংশিক বয়ানটি দেখলেই আমার বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে—"...একটি জনশ্রুতি আছে যে, আমি হিন্দুস্থানী গান জানি নে, বুঝি নে। আমার আদিযুগের রচিত গানে হিন্দুস্থানী ধ্রুবপদ্ধতির রাগরাগিনীর সাক্ষী-দান অতি বিশুদ্ধ প্রমাণ-সহ দূরভাবী শতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিদারুণ বাদ-বিতণ্ডার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। ইচ্ছা করলেও সেই সংগীতকে আমি প্রত্যাখ্যান্ করতে পারি নে, সেই সংগীত থেকেই আমি প্রেরণা লাভ করি একথা যারা জানে না তারাই হিন্দুস্থানী সংগীত জানে না। হিন্দুস্থানী গানের আচারের শিকলে যাঁরা অচল করে বেঁধেছেন, সেই ডিক্‌টেটারদের আমি মানি নে। যাঁরা বলেন ভারতীয় গানের বিরাট ভূমিকার উপর নব নব যুগের নব নব যে সৃষ্টি স্বপ্রকাশ তার স্থান নেই—ঐখানে হাতকড়ি পরা বন্দীদের পুনঃপুনঃ আবর্তনের অতিক্রমণীয় চক্রপথ আছে মাত্র এমনতর নিন্দোক্তি যাঁরা স্পর্ধা সহকারে ঘোষণা করে থাকেন তাঁদের প্রতিবাদ করার জন্যই আমার মতো বিদ্রোহীদের জন্ম।" এখানে "আমার মতো বিদ্রোহীদের জন্ম"কে ভিত্তি করে যদি মন্তব্য করা হয়, 'তিনি গান রচনার কাজে লেগেছিলেন প্রধানত বিদ্রোহের ভাব নিয়েই' তা হলে তা কেবল যে অযৌক্তিক হবে তা নয়, রবীন্দ্র-সংগীত রচনার সমস্ত ভাবনাকে অন্য-পথগামী করে দেওয়া হবে। বরং এ প্রসঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদের ব্যাখ্যাটি অনেকখানি প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয়। ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন, 'সংগীতকার হিসাবে রবীন্দ্র-নাথ ছিলেন সত্যিকারের একজন বিপ্লবী। তাঁর এই বিপ্লব ভারতীয় রাগসংগীতের অন্তরঙ্গ বিবর্তনেই সাধিত হয়েছিল। অন্তরঙ্গ এই কারণে যে রবীন্দ্রনাথের গানে বিদেশী প্রভাব অতি সামান্যই। তাঁর গানের কারুকার্য হয়েছে নতুন মিশ্রণে, বহুবিধ স্বতন্ত্র স্বর এবং ভাব সৃষ্টিতে। কিন্তু তাঁর সৃজনী প্রচেষ্টার স্বাক্ষর রয়েছে দেশীয় লোকায়ত সংগীতে, বাউল ও ভাটিয়ালীতে বিশেষ করে। রাগরূপে ক্রমশ

ক্ষয়িত হয়, তাদের চমৎকার কারুকার্য সত্ত্বেও আবার মূলে ফিরে যায়। 'বিদ্রোহের ভাব নিয়েই রবীন্দ্রনাথ গান রচনার কাজে লেগেছিলেন' আর 'সংগীতকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সত্যিকারের একজন বিপ্লবী'—এ দু'এর মধ্যে দুস্তর ভাবনার পার্থক্য। আর একটি বিষয়ে বারবার ভুল হয়ে যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের গানকে রাগ-সংগীতের সঙ্গে সমান জায়গায় রেখে তাদের তুলনামূলক মূল্যায়ন প্রচেষ্টা। তা কেমন করে সম্ভব? কেননা এদের জাতই তো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

'সংগীতের বেলা রবীন্দ্রনাথ অ্যাকাডেমিক পদ্ধতির অনেক কিছুই গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তান জিনিষটা তিনি বাদ দিয়েছিলেন, তার একটা কারণ বোধ হয় এই যে সেটা তাঁর আয়ত্তে ছিল না।' আবার রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ শুনে সত্যজিৎ রায় নিশ্চিত হয়েছেন যে 'তার গলার কাজ খুব বেশি ছিল না। অন্তত যে কাজে খেয়ালের তান হয়, তা তো নয়ই।' 'বাধ্য হয়েছিলেন' কথাটাকে যদি একটু তলিয়ে দেখা যায় তবে অনায়াসেই অন্তত এটুকু বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ এ ক্ষেত্রে বাধ্য হন নি। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথাতেই এর উত্তরটি অত্যন্ত স্পষ্ট : "গীতরসের যে সঞ্চয় বাল্যকালে আমার চিত্তকে পূর্ণ করেছিল, স্বভাবতই তার গতি হল কোন মুখে তার প্রকাশ হল কোন্ রূপে, সেই কথাটি যখন চিন্তা করে দেখি, তখন তার থেকে বুঝতে পারি সংগীত সম্বন্ধে আমাদের দেশের প্রকৃতি কী। ...ছেলেবেলা থেকে গানের প্রতি আমার নিবিড় ভালবাসা যখন আপনাকে ব্যক্ত করতে গেল, তখন অবিমিশ্র সংগীতের রূপ সে রচনা করলে না। সংগীতকে কাব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে। কোনটা বড কোনটা ছোট বোঝা গেল না।" এটুকু জানলে অন্তত বাধ্য হয়েছিলেন এমন কথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হবে। 'তাঁর আয়ত্তে ছিল না' এই মন্তব্য সম্পর্কে বলা যায় ব্যত্যয় সাধনে তাঁরই অধিকার জন্মায় যিনি পরম্পরাগত সংগীত রীতিকে সার্থকভাবে আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তাই 'আয়ত্তে ছিল না' সম্ভবত অসতর্ক উক্তি। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, এমন গান তিনি রচনা করতে চান নি যাতে 'খেয়ালের তান' হবে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সংগীত সৃষ্টির প্রতি মনোযোগী দৃষ্টি দিলে কি সে কথা বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে বলা চলে না। এই সঙ্গে সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রনাথের গানে রাগের 'অপ্রতিভ চেহারা'র কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন : 'রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের স্বরলিপিতে রাগের উল্লেখ নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু মার্গ সংগীতের সঙ্গে যাদের সামান্য পরিচয়ও আছে তারা রাগের এই আভাস লক্ষ্য করে তার ইম্যাস্-কুলেশনে আক্ষেপ বোধ না করে পারে না।' রূপের অপ্রতিভ চেহারা নিয়ে যখন সত্যজিৎ রায়কে প্রশ্ন করেছিলাম, তিনি তার উত্তরে বলেছিলেন—'রূপের কথা মনে করেই বলছি। রাগের যা অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা তার কথা মনে করেই বলছি। রাগ মিশ্রণের প্রশ্ন উঠছে না। সে কথা আমি বলি নি। আমি বলেছি রাগের চেহারা কেমন ন্যাড়া হয়ে যায়। স্বরগুলো লাগছে কিন্তু স্বরের মধ্যে শ্রুতি লাগছে না

তাই রাগের চেহারা এখানে ম্লান হয়ে যায়।' এই প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের আর একটি মন্তব্য সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য : 'রাগরাগিনীর প্রভাব তিনি কোনদিন সম্পূর্ণভাবে কাটাতে পারেন নি, কিন্তু যে জিনিষটা ক্রমে দেখা দিল, সেটাতে রাগ সংগীতের শুদ্ধতা আর বজায় রইল না। রইল কিছু রাগের পর্দা এবং তার সঙ্গে যোগ হল বিশেষ নতুন ঢং।'

একটি বিশেষ নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোন থেকে রবীন্দ্রসংগীতকে সত্যজিৎ রায় দেখেছিলেন বলে, এভাবে মূল্যায়ন করেছিলেন। ভুললে চলবে না রবীন্দ্রনাথ রাগসংগীত সৃষ্টি করতে চান নি। বিপ্লবী মানসিকতা নিয়ে রাগমিশ্রণ করেছেন এমন কথা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। আসলে গানের বাণীর ভাবউন্মোচনে যে-সমস্ত সুরবিন্যাস রচিত হয়েছে তার মধ্যে বিভিন্নভাবে রূপের আভাস মিলেছে, কিন্তু তা রাগসংগীত বা তথাকথিত রাগ হিসাবে বিবেচিত হলে রাগের 'অপ্রতিভ চেহারা' তো মিলতেও পারে। রাগের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার প্রত্যাশা এই গানে প্রত্যাশিত কি ? কেবলমাত্র সাংগীতিক দিক থেকে বিশ্লেষণেই এই বিপত্তি বলে মনে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দু-তিনটি গানের উল্লেখ করছি। সবকটি গান'ই তাঁর শেষজীবনের রচনা অর্থাৎ বিবর্তনের শেষ পর্যায়ের। 'মম দুঃখের সাধন যবে করিনু নিবেদন'-এর সুর সংযোজনায় দেখা মেলে প্রধানত বিলাবল এবং ইমন রাগের মিশ্রিত রূপ, কখনো কখনো মিলে যায় গৌড় সারং আর বেহাগের আভাস। 'যদি হায় জীবন পূরণ নাই হল মম' গানের বিভিন্ন পর্দ বিন্যাসে কাফি পটদীপ জৌণপুরী ভৈরবী প্রভৃতি রাগের ছায়া ফুটে ওঠে। এ গানে রাগের নির্দিষ্ট রূপ খুঁজতে গেলে কেমন করে তা পাওয়া যাবে ? তা বলে একথা তো বলা যাবে না যে এক্ষেত্রে 'কথার খাতিরে সুরকে দাবিয়ে রাখতে হয়, অথবা কথার ছন্দ অতিমাত্রায় সুরে সঞ্চারিত হয়ে গানকে দুর্বল করে ফেলে।' এ প্রসঙ্গে আর একটা বাক্য খুবই বিস্মিত করে। সত্যজিৎ রায় লিখেছেন 'স্বরগুলো লাগছে কিন্তু স্বরের মধ্যে শ্রুতি লাগছে না।' রবীন্দ্রনাথ নিজের গানের স্বরলিপি (ব্যতিক্রম একটি গান) নিজে করেন নি, প্রত্যক্ষভাবে তাঁর কাছে দেখা ছাত্র-ছাত্রী অথবা তাঁদের পরম্পরা মারফত আমরা যে গানগুলি শুনে এসেছি এতদিন, ধরে নিতে হবে স্বরগুলি তাঁদের গলায় ফুটে উঠছে কিন্তু শ্রুতির আবেদন অনাস্বাদিতই থেকে যাচ্ছে। যদি তা মেনে নেওয়া যায় তাহলে সেক্ষেত্রে Composer-এর দায়িত্ব কতখানি ? Composer-এর সৃষ্টির সার্থক উপস্থাপনার দায়িত্ব তো শিল্পীর, এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

রবীন্দ্রসংগীতের সুরের পরছন্দের দিক নিয়ে যখন সত্যজিৎ রায় বলছেন তখন তাঁর মন্তব্যগুলি বেশ কৌতূহল জাগায়। নয় মাত্রা বা এগারো মাত্রার সবকটি গানের উল্লেখ করে তিনি দেখিয়েছেন, এ গানে বাণীর প্রতিটি মাত্রা সুরের প্রতিটি মাত্রায় উচ্চারিত এবং কোথাও যতির কোন চিহ্ন নেই। এ গান গাওয়া যায় না কারণ এখানে দম নেবার কোন সুযোগ রচয়িতা রাখেন নি। সেই সঙ্গে তিনি প্রশ্ন

রেখেছেন তা হলে এই রচনার অর্থ কী? রবীন্দ্রনাথ কেন এমন অসাংগীতিক তালের উদ্ভব করলেন? এর একঘেয়েমির দিকটা বাদ দিলেও, তালের গাণিতিক দিকটা এভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার কোন সমর্থন তো কোন সংগীতরীতিতে পাওয়া যায় না।

এ বিষয়ে অনেকগুলি বলবার কথা আছে। সত্যজিৎবাবু যে গানগুলি বা তালগুলির উল্লেখ করেছেন সেই তালে রচিত গানের সংখ্যার একটি তালিকা দেওয়া যাক। বিভিন্ন ছন্দের বিন্যাসে নয় মাত্রার তালের গান ৩।২।২।৪ ছন্দে দুটি, ৩।৬, ৫।৪, ৬।৩ ও একটা নয় মাত্রার ছন্দের মোট ৩টি। একটি গান দুই ভিন্ন ছন্দে আর এগারো মাত্রার মোট ২টি গান একটির ছন্দ ৩।২।২।৪ ও অন্যটির ৩।৪।৪। প্রায় দু'হাজার গানের মধ্যে এই ৭ খানি গান এই দুটি তালে বিন্যস্ত। 'কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে নিয়মে কবিতায় চলে, তাল সেই নিয়মে গানে চলিবে এই ভরসা করিয়া গান বাঁধিতে চাহিলাম।' গান বাঁধলেন কিন্তু পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ আর এই ছন্দ বিন্যাসে এ গান এ ক্ষেত্রে বাঁধায়, উৎসাহিত হন নি। এতেই বোঝা যায় তিনিও বিষয়টি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। ঐ নিছক সৃষ্টির আনন্দের একটি উক্তি এক বিচিত্র প্রকাশ মাত্র। আরও একটি বক্তব্য এই প্রসঙ্গে আলোচিত হওয়াই সঙ্গত। সত্যই কি রবীন্দ্রনাথ এই তালগুলি উদ্ভব করলেন বলা সঙ্গত হবে? তিনি তাল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এ কাজ করেছিলেন এমন ধারণা করা বরং অসঙ্গতই হবে। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য প্রাচীন বহু সংগীত গ্রন্থে তালের এমন বিচিত্র বিন্যাসের সন্ধান মেলে। সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রসংগীতের তাল ও ছন্দের আলোচনায় বলেছেন: 'এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে তাঁর অপেক্ষাকৃত দুর্বল যে সমস্ত গান, তার বেশির ভাগেই ছন্দের এই যান্ত্রিক দিকটা দেখা যাবে।' এ পর্যন্ত যদিও বা কেউ কেউ সম্মত হন কিন্তু পরের অংশটিতে চমকিত হতে বাধ্য হবেন। তিনি লিখেছেন: 'কিছুটা হয়তো নৃত্যনাট্যের প্রয়োজনে গানের বক্তব্য আরো বেশি পরিষ্কার করার জন্য তাঁকে এ রীতি অবলম্বন করতে হয়েছিল, কারণ নৃত্যনাট্যের গানেই এই আড়ষ্টতা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।' তাঁর নৃত্যনাট্যের গানে এই ধরণের ছন্দোবিন্যাসের গান খুঁজে পাওয়া যাবে কেমন করে? তবে কি এ কথা মনে করে নেওয়া যেতেই পারে সত্যজিৎ রায় নৃত্যনাট্যের গানগুলি তেমন মনোনিবেশ সহকারে শোনার প্রয়োজন বোধ করেন নি। তাঁরই ভাষায়: 'রবীন্দ্রসংগীতের সামগ্রিকচর্চার সুযোগ বা সময় ছিল না।'

'নৃত্যনাট্যের গানেই এই আড়ষ্টতা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়'—এই বক্তব্য কেমনভাবে মেনে নেওয়া সম্ভব? জানি না কোন বিশেষ নৃত্যনাট্যের বিশেষ অংশ সম্পর্কে তাঁর এই মন্তব্য কিনা, কিন্তু নৃত্যনাট্যে বিশেষ করে চণ্ডালিকার গান তো এক অনবদ্য সৃষ্টি। গান এতটাই শক্তিশালী যে কেবলমাত্র গানেই এর নাট্যরস

শ্রোতার হৃদয়ে অনায়াসে সঞ্চারিত হতে পারে। এই প্রসঙ্গের জের টেনে সত্যজিৎ রায় বলেন: 'উদাত্ত ভাবের বা রৌদ্ররসের অনেক গান ছন্দের দুর্বলতার জন্য ব্যর্থ মনে হয়।' উদাহরণ হিসাবে দুটি গানের উল্লেখ করেছেন, 'ঐ মহামানব আসে' এবং 'আগুন জ্বালো' (ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা)। যাঁদের এ গান দুটির সঙ্গে সম্যক পরিচিতি আছে তাঁরা অবশ্যই অন্যমত পোষণ করবেন।

রবীন্দ্রনাথের গানের লিরিক নিয়ে সত্যজিৎ রায় সরাসরি একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, যাঁকে তিনি 'গুরুতর' বলে বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেছেন : 'গানের ভাবে ভাষায় সুরে ছন্দে শিষ্টাচারের যে অমোঘ নিয়ম রবীন্দ্রনাথ ষাট বছর ধরে মেনে এসেছিলেন, সে-নিয়ম কি সমের নিয়ম বা বাদী-সম্বাদীর নিয়মের চেয়ে কিছুমাত্র কম inhibiting ? এই যে বকুল পারুল চাঁপা টগর চামেলির সম্ভার, এই যে শরতের আলো, ফাগুনের রং, বরষার গুরগুরু, বসন্তের হাওয়ার হিল্লোল বা মনের দোলায় দেয় দোল, এই যে মনের বীণার সুরের পরশ, হৃদযের তন্ত্রীতে বেদনার ঝংকার—এই যে দূরে যাওয়া কাছে আসা, আধো চাওয়া আধো হাসা—এও কি 'কৈসে পনিঘট জাঁউ' আর 'পিয়া পিয়া পাপিয়া' আর 'ভরু ভরু অঙ্গ আঁখিয়া'র মতো ফরমুলা নয় ; clicle´ নয়—আজকের দিনে ঠুংরীর গানের কথার মতোই যা প্রায় অর্থহীন ?'

রবীন্দ্রনাথের গানের দেহ বা অবযবের প্রসঙ্গে এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের মনেও কি একটি প্রশ্ন জাগে না ? প্রশ্নটি হল সত্যজিৎ বায কি কেবল রবীন্দ্রনাথের এমনি কতগুলি গান শুনেছিলেন যার নমুনা তুলে দিযে তিনি বলতে পেরেছেন যে, 'আজকের দিনে ঠুংরীগানের কথার মতোই যা অর্থহীন।' সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্র-নাথের গানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকলে কিছুতেই এ মন্তব্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। এ কথা আজ আর অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে রবীন্দ্রনাথের গান ভাষার চারুতায ও বোধের গভীর প্রগাঢ়তায় নিষিক্ত। বোধের প্রত্যয়ে রবীন্দ্রসংগীত তাই সর্বকালের নিজস্ব মানসিকতার দর্পণ বিশেষ। এ গানের জীবনবোধ সম্পূর্ণ ভিন্নতর। রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায় "যখন ভালোবাসার গান গাই তখন পাই শুধু গানের আনন্দকেই না ; ভালোবাসার উপলব্ধিকেও মেলে এমন এক নতুন নৈশ্চিত্যের মধ্য দিয়ে যে, মন বলে পেয়েছি তাকে যে অধরা, যে আলোকবাসী, যে কাছের থেকে দেয় না ধরা, দূরের থেকে ডাকে।" বাংলা গানে এ মনন ও চিন্তনের প্রকাশ কেবল অভিনবই নয়, অশ্রুতপূর্ব। প্রত্যক্ষ এই কথার মধ্যে বিদ্রোহের ছাপ খুঁজে হতাশ হয়েছেন সত্যজিৎ। কেন করেছেন জানি না। কিন্তু সামগ্রিক-ভাবে রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে পরিচয় থাকলে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারতেন তা বাংলাগানের জগতে বিপ্লবই ঘটিয়েছিল বললে এতটুকুও অত্যুক্তি করা হবে না। এই আলোচনার রেশ ধরে তিনি 'গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ' গানটির উল্লেখ করেছেন। বলেছেন 'সুর লোক সংগীতের, কিন্তু ভাষা ভদ্র, মার্জিত, প্রশ্ন

ওঠে—এ সংগীতের স্থান কোথায় ? পদ্মার বুকের পানসিতে নয় নিশ্চয়ই, কারণ কর্তা 'তার হাতে বৈঠা দেখলে যে মাঝি হাসবে।' আরো প্রশ্ন করেছেন ,'এখানে লোক সংগীতের সুর কেন, ছন্দ কেন ?' এ সম্পর্কে অসামান্য ব্যাখ্যা আছে ধূর্জটিপ্রসাদের লেখায়। তিনি বলেছেন, 'এ ধরণের মিশ্রণের একটা নতুন প্রকৃতি আছে, সেটা হল জীবনের প্রকৃতি, সুর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সাহিত্যে ভাঙন ধরছে, আর্টে নতুন কিছু হচ্ছে না। একাডেমিক হয়ে যাচ্ছে,—সে সময় জমি থেকে, মাটি থেকে একটা নতুন জীবন বইতে থাকে।' রবীন্দ্রনাথ লোকসংগীত সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন বলে যদি ধারণা করা হয় তবে তা যথার্থ হবে কি ? লোকসংগীতের সুর, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে সে গানের দর্শনও মিশিয়ে নিয়েছেন তাঁর স্বাধীন রচনায়—তাকে করে তুলেছেন যুগোত্তীর্ণ এক নতুন বর্ণের গান।

এই প্রসঙ্গে তাঁকে প্রশ্ন করি, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গান সম্পর্কে আপনি কি এখনো এই মত পোষণ করেন ? তিনি উত্তর দেন এভাবে : 'না। কিন্তু মিডিল পিরিয়ডের অনেক গানের সুর আগে এসেছে। সেক্ষেত্রে অনেক গান প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য জাস্টিফাই করা যায় তবে সামগ্রিক বিচারে শেষের দিকের গান সার্থক এ কথা বলা যায় না।' এখানে ধন্দে ফেললেন তিনি 'মিডিল পিরিয়ডের অনেক গানের সুর আগে এসেছে' তথ্য প্রমাণ কিন্তু সে কথা বলে না। আর 'সামগ্রিক বিচারের ক্ষেত্রে শেষের দিকের গান সার্থক মনে হয় নি তাঁর'—তবে কি ধরে নেব, শেষ পর্যায়ের গান শোনার সময় বা সুযোগ হয় নি তাঁর তেমনভাবে।

পরিশেষে আমরা একটি বিষয়ে সত্যজিৎ রায়ের কাছে ঋণী থাকতে বাধ্য। গানে যন্ত্রানুপ্রসঙ্গে তাঁর আগে এভাবে কেউ ভেবেছেন বলে জানা নেই। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন : 'যাঁরা যন্ত্র ছাড়া গলা সুরে রাখতে পারেন তাঁদের উচ্চারণে সংগীতোপযোগী বিশুদ্ধতা থাকে, তবে যন্ত্র ছাড়া গান গেয়েও রবীন্দ্রসংগীতের সমস্ত সৌন্দর্য তাঁরা প্রকাশ করতে পারেন। এইভাবে গাওয়ায় কী হতে পারে তার দৃষ্টান্ত গ্রামোফোন রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথের নিজেরই গাওয়া 'তবু মনে রেখো' গানে আছে।'

এবার বলেছেন : 'সব না হলেও, অনেক গানই এভাবে গাওয়া সম্ভব এবং উচিত এটা আমি বিশ্বাস করি। তালের গান তাল-সঙ্গত ছাড়া গাইতে হলে গায়কের যে জিনিসটার দরকার সেটাকে ইংরেজীতে বলে Phrasing, এতে বারো আনা গানের সঙ্গে চার আনা আবৃত্তির মিশ্রণ—যেন প্রায় সুর করে ভাব দিয়ে কথা বলা। ...তবে সাধারণের জন্য এ রীতি নয়। রবীন্দ্রোত্তর যুগে রবীন্দ্রসংগীত বেঁচে থাকতে পারে কেবল তার সুর আর ছন্দের জোরে এবং যেটার আসলে দরকার সেটা হল এই দুটো দিককে উপযুক্ত সংগতে আরো সমৃদ্ধ করা।'

এই বক্তব্যের সঙ্গে অনেকেই একমত না হতে পারেন, কিন্তু উপযুক্ত সংগত-এর প্রশ্নটি যে অত্যন্ত জরুরী সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। এই আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর কয়েকটি কথা সর্বশেষে প্রণিধানযোগ্য। 'গানে কথার মূল্য যাই হোক না কেন, উপযুক্ত সংগতে সে মূল্য বাড়ে বই কমে না।' 'হার্মনি না হলেও, কর্ডের ব্যবহার ছাড়া গান খোলে না।' 'টানা গানের সঙ্গে যদি টানা যন্ত্রে তার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে, তা হলে সংগীত টটলজি দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে।' 'যন্ত্রের ব্যবহারে দিশি-বিলিতি বাছবিচার না থাকাই ভালো।' আর একটা সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন : 'তবলার সংগতে ওস্তাদি মেজাজটা বড চট্ করে এসে পড়ে।...কাজেই ওটার বদলে যন্ত্রকেই তালের কাজে লাগানো উচিত।'

সত্যজিৎ রায়ের এই বক্তব্যগুলির দিকে দৃষ্টি দিলে রবীন্দ্রসংগীতে যন্ত্রানুষঙ্গ সম্পর্কে অনেকগুলি নির্দিষ্ট ভাবনার ইঙ্গিত মেলে। বিশেষ করে সংগতে কর্ডের প্রয়োজন। অর্গ্যান ভাইব্রোফোন জাতীয় যন্ত্রে কর্ডের প্রয়োগ গানের সৌন্দর্য বৃদ্ধির বিশেষ সহায়ক হয়। যন্ত্র নির্বাচনেও তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে বলা যায় এ বিষয়ে ছুঁৎমার্গী হওয়ার কোন প্রয়োজন দেখি না। তেমন হলে পিয়ানো, বেহালাকেও বাদ দিতে হয়। আসলে কোন যন্ত্র বাজছে এটাই বড়ো করে না দেখে কি বাজছে এবং সেই বাজনা গানটার সুরের পরিমণ্ডলকে কতখানি সমৃদ্ধ করছে সেটাই প্রধান বিবেচ্য হওয়া উচিত। কেবল টানা যন্ত্রে যন্ত্রানুষঙ্গের প্রসঙ্গটির নিদর্শন তো হামেশাই মেলে। তালবাদ্য যন্ত্রের সহযোগিতার প্রসঙ্গটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হওয়া উচিত। এই প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত স্বতন্ত্র রচনার অবকাশ আছে এবং সেই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহারিক প্রয়োগেই এর যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁকে কয়েকবারই অনুরোধ করেছিলাম, তাঁর বক্তব্যের নিদর্শন হিসাবে কয়েকখানি রবীন্দ্রসংগীত সংগত রচনা ও পরিচালনা করা। তাঁর যে একেবারে ইচ্ছাও ছিল না তা কখনো মনে হয় নি—কিন্তু হয়ে ওঠে নি।

আসলে রবীন্দ্রসংগীত তিনি যতটা শুনেছিলেন, যতটা তাঁকে শোনানো হয়েছিল প্রয়োজনের তাগিদে, তারই ভিত্তিতে একটি নিজস্ব মতামত গড়ে তুলেছিলেন। পরবর্তীকালে তার কিছুটা বদল হলেও রবীন্দ্রসংগীতের সামগ্রিক চর্চার কেবল সুযোগ বা সময় নয়, প্রয়োজনের তাগিদও ছিল না তাঁর।

কিশোর চট্টোপাধ্যায়

রেকর্ড-সংগ্রাহক সত্যজিৎ রায়

সত্যজিৎ রায় যে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রেমিক ছিলেন সেটা সবার জানা আছে। কিন্তু তিনি যে একজন 'রেকর্ড-কালেক্টর'ও ছিলেন সেটা অনেকের অজানা। গ্রামোফোন রেকর্ড অনেকেই কেনেন ও কিনে থাকবেন, কিন্তু সবাই কালেক্টর হতে পারেন না। রেকর্ড কালেক্‌সান করতে গেলে অন্যরকম মানসিকতার প্রয়োজন (আমি অবশ্যই ক্লাসিক্যাল রেকর্ডের কথা বলছি)। সত্যজিৎ রায়ের এই মানসিকতার পরিচয় পেয়েছি তাঁর সঙ্গে কথা বলে, তাঁর সঙ্গে মিশে, তাঁর রেকর্ড কালেক্‌সান দেখে। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ কালেক্টর। এই কালেক্টর-সত্যজিতের কথা আমি আপনাদের বলতে বসেছি।

আমার সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের দেখা হয় ১৯৬০ সালে। আমি তখন সবে ক্ল্যারিয়নে চাকরিতে ঢুকেছি। কপি ডিপার্টমেন্টে কাজ করতাম। সেই ডিপার্ট-মেন্টে রোজ আসতেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বিজ্ঞাপনগুলি বাংলায় অনুবাদ করার জন্য। আমি তখন বাখ ও বেঠোফেনের প্রেমে মত্ত ও সারাক্ষণ ওঁদের মিউজিক্ শুনছি ও কিছু কিছু রেকর্ড সংগ্রহ করছি। তখন কলকাতায় প্রচুর ইউরোপীয়ান ক্লাসিক্যাল রেকর্ড পাওয়া যেত যা এখন দুষ্প্রাপ্য। সুভাষদা আমার এই প্রেমের কথা জানতে পেরে বললেন, "এই কিশোর, চলো তোমায় আমি মানিকের বাড়ি নিয়ে যাই।" আমি আকাশ থেকে পড়লাম, কারণ সত্যজিৎ রায় তখন ক্ল্যারিয়নের একজন ডিরেক্টর ছিলেন এবং শুধু তাই নয়, তখন তিনি সত্যজিৎ রায়। তাঁর কাছে যাবো? আমি ভাবলাম, সুভাষদা নিশ্চয় ঠাট্টা করছেন। কিন্তু সুভাষদা বললেন, "দ্যাখো কিশোর তুমি সিরিয়াস্‌লি রেকর্ড কালেক্‌সান করছো ও বাখ, বেঠোফেন শুনছ। তোমার মানিকের সঙ্গে পরিচয় হওয়া প্রয়োজন—অনেক কিছু শিখতে পারবে।" কথা রাখলেন সুভাষদা। একদিন রবিবার সকালে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে সত্যজিতের লেক রোডের ফ্ল্যাটে উপস্থিত হলেন।

সত্যজিতের সেই ঘরটা আমার এখনও মনে আছে। চারি দিকে এল. পি ও 78 R.P.M. রেকর্ড ছড়ান (সত্যজিৎ রায়ের রেকর্ড কালেক্‌সান শুরু হয় 78 R.P.M.-এর যুগ থেকে)। আমার ওই সময়কার কালেক্‌সান করার কোন অভিজ্ঞতা নেই। আমার সঙ্গে যখন সত্যজিৎ রায়ের পরিচয় হয় তখন এল. পি মার্কেটে এসে গেছে। বিদেশে যদিও ক্যাসেটও ছাড়া হয়েছিল, ভারতবর্ষে তখনও

ক্যাসেট আসে নি। সত্যজিৎ রায় এবং তার বন্ধু অনিল গুপ্ত মিলে কলকাতায় একটা গ্রামোফোন সোসাইটি শুরু করেন ওই '৭৮-এর যুগে (১৯৪০ থেকে ১৯৪৫)। তিনি একবার বলেছিলেন যে 78 R.P.M. রেকর্ডে এত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে এল. পি. যখন প্রথম আসে তাঁর একটা মজার অভিজ্ঞতা হয়। আপনারা সকলেই জানেন যে 78-এর এক-একটা সাইড তিন মিনিটের হত কিংবা তার একটু বেশি। সাইডটা শেষ হয়ে গেলে গ্রামোফোনের উপর সেটা উল্টে দিতে হত। সত্যজিৎ বলেছিলেন যে প্রথম প্রথম তাঁর এল. পি. বাজাতে খুব অসুবিধা হত, কারণ তিন মিনিট অন্তর-অন্তর উঠে গিয়ে গ্রামোফোনের কাছে চলে যেতেন রেকর্ড উল্টে দেবার জন্য। যদিও তার কোন প্রযোজন ছিল না। তাই বোধ হয় সেই এল. পির যুগে তাঁর ঘরে এত 78 R.P.M. রেকর্ড দেখেছিলাম। সেই 78 R.P.M. রেকর্ড তিনি ফেলতে পারেন নি। এখনও তাঁর কালেক্সানে সেগুলি আছে। তাঁর ঘরের এক কোনে ছিল একটি Pye Black Box Record Player যা এখনও তাঁর ঘরে আছে। সত্যজিৎ রায় প্রকৃত সংগীত-প্রেমিক ছিলেন। তিনি কখনও স্টিরিও হাই-ফাই এসব তথ্যকে সংগীতের উপর বসান নি। সেই তিরিশ বছর আগে আমাকে তিনি যে কথা বলেছিলেন আমি তা ভুলি নি, "মনে রাখবে সাউণ্ডের চেয়েও মিউজিক অনেক বড়ো।" তিনি কিন্তু সেদিন আমায় বলেছিলেন বই পড়তে। যেমন, Donald Francis Tovey's Essay In Music Criticism. তিনি বললেন, "Tovey পড়েছ ?" আমার মনে আছে, আমি বলেছিলাম, "আমার পড়া হয়ে গেছে।" তিনি অবাক ও খুশী হয়েছিলেন। তাঁর সংগীত লাইব্রেরীতে Tovey-এর সব বইগুলো আছে এবং Tovey-এর একটা খুব দুর্লভ বই আছে, যেটি হল, "A Musician Talks The Integrity of Music" by Donald Francis Tovey. তাঁর সংগীত লাইব্রেরীর আরো কয়েকটি দুর্লভ বইয়ের উল্লেখ আমি করছি। "Orchestration" by cecil Forsyth আর একটা বই হল, বেঠোফেনের জীবনী থেয়ারের লেখা। এই থেয়ারই বেঠোফেনের প্রথম জীবনী লেখেন।

১৯৬০ সালের সেই দিনটির পর অনেক বছর কেটে গেছে। আমার কাছে সত্যজিৎবাবু হয়ে গেছিলেন মানিকদা। তাঁর সঙ্গে কনসার্টে বা বাড়িতে অনেক বার দেখা হয়েছে। কথা হয়েছে। তিনি পাশ্চাত্য ক্লাসিক্যাল সংগীত নিয়ে কথা বলতে ও আলোচনা করতে ভালোবাসতেন। সত্যজিৎ বলতেন পৃথিবীতে দুই-রকমের লোক আছে "even" আর "Odd"। 'Even' হল যারা বেঠোফেনের দুই, চার, ছয় আর আট নম্বর সিম্ফনি বেশী পছন্দ করে। আর 'Odd' হল যারা বেঠোফেনের তিন, পাঁচ, সাত আর নয় নম্বর সিম্ফনির ভক্ত। তিনি নিজে দুই, চার, ছয় আর আট বেশী পছন্দ করতেন। অর্থাৎ "even"। অনেকেই হয়ত জানতে উৎসুক কোন্ কম্পোজারের কোন্ কাজ তাঁর প্রিয়। তাঁর কিছু তথ্য আমি এখানে

উল্লেখ করছি। বেঠোফেন ও মোটসার্টকে নিয়ে তিনি দুটি রেডিও-টক দিয়েছিলেন। ১৯৭০ সালে বেঠোফেনের উপর ও ১৯৯১ সালে মোটসার্টের উপর। এই দুটি টক সকলের-ই শোনা উচিত। আশা করা যায় অল ইণ্ডিয়া রেডিও মাঝে মাঝে এগুলি বাজাবেন। ১৯৯১ সালে সত্যজিৎবাবু আমাকে একটা বই পড়তে দেন। H.C Robbins Landon এর লেখা "Mozart's Last year 1791।" তিনি আমায় অনেকবার বলেছিলেন 'আজকাল আমি কোথাও বলতে-টলতে চাই না। কিন্তু আমার খুব ইচ্ছে মোটসার্টের উপর একটা টক্ দেওয়া! যেমন দিয়েছিলাম ১৯৭০ সালে বেঠোফেনের উপর।' শেষ পর্যন্ত বুলবুল সরকারের উদ্যোগে এই টক্ তৈরী করা হয়, তখন সত্যজিৎবাবু খুবই অসুস্থ। এই টকে তিনি বাজিয়েছিলেন মোটসার্ট ম্যাজিক ফ্লুটের অংশ। ডন জিওভানির সেই ভয়ঙ্কর শেষ দৃশ্য যখন স্ট্যাচু এসে ডন জিওভানিকে হিড হিড করে টেনে নরকে নিয়ে যাবে, মোটসার্টের এক্‌জুলটাটে জুবিলাটে এবং ডি মাইনার পিয়ানো কনচেরটো। তাঁর পাশ্চাত্য সংগীতের প্রেমের সঙ্গে তাঁর নিজের ফিল্মের সঙ্গীতের কোন যোগাযোগ আছে কিনা আমার বলার কোন অধিকার নেই। আমি তাঁকে জেনেছিলুম একজন সংগীতপ্রেমিক ও রেকর্ড-কালেক্টর হিসাবে। তবে এটুকু বলতে পারি যে ভোরষাক ও মোটসার্টের সংগীতের সঙ্গে গভীর পরিচয় না থাকলে হয়ত "গুপী গাইনের" গানগুলি লেখা যেত না। 'শাখা-প্রশাখা'তে যে বাখ, বেঠোফেন ব্যবহার করা হয়েছে সে তো আমরা জানি। 'ঘরে-বাইরে'রও শেষে যে ফিউনেরাল মার্চ আছে তা শুনলে বোঝা যায় যে সত্যজিৎ ওয়াগ্‌নারের পোয়েটেরডেমারুং শুনতে ভালোবাসতেন।

আর একটা কথা এখানে বলা উচিত। সত্যজিৎ প্রকোফিয়েভের সংগীত শুনতে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর কালেক্‌সানে অনেক প্রকোফিয়েভের রেকর্ড ও ক্যাসেট আছে। তিনি প্রকোফিয়েভের "Ivan the Terrible" এতবার শুনতেন যে রেকর্ড বাক্সটি ছিঁড়ে গিয়েছিল এবং নতুন করে বাঁধাতে হয়েছিল। সত্যজিতের মতে প্রকোফিয়েভ ছিলেন ফিল্ম সংগীতের সম্রাট। তাঁর মতে প্রকোফিয়েভ ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক ফিল্মের বাইরেও বার বার শোনা যায়। এবং সেইজন্য প্রকোফিয়েভ অন্যান্য ফিল্ম কম্পোজারদের চেয়ে আলাদা। তিনি প্রকোফিয়েভ ক্ল্যাসিক্যাল সিম্ফনি শুনতেও খুব ভালোবাসতেন।

আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হবার সময় সত্যজিৎবাবু আমাকে দুই একটি কথা বলেন যার উল্লেখ এখানে করা দরকার। তিনি আমাকে বেশী করে চেম্বার মিউজিক শুনতে বলেছিলেন। সিম্ফনি ও কনচেরটো ভালো কিন্তু ইউরোপিয়ান ক্লাসিক্যাল সংগীতের ভাণ্ডারের আসল হীরে জহরৎ ছড়ানো আছে ওই চেম্বার মিউজিকে। এটা ছিল তাঁর মত এবং এর আসল মর্ম আমি এখন বুঝতে পেরেছি। মোটসার্ট ও বেঠোফেনের কোয়ারটেট ও কুইনটেটের মতন কাজ কোথায় পাবো?

সত্যজিতের রেকর্ড ও ক্যাসেটের কালেক্‌সানে প্রচুর দুর্লভ চেম্বার মিউজিক পাওয়া যাবে। যেমন মেণ্ডেলশন ও সুমানের পিয়ানো ট্রিও বা বেঠোফেনের চেলো সনাটা-গুলি রস্ট্রপোভিচ ও রিক্টরের বাজানো। বা হায়ডেনের সমস্ত পিয়ানো ট্রিও, সুবার্টের লেখা গান, বেঠোফেনের পিয়ানো ট্রিও (তিনি বেঠোফেনের গোষ্ট ও আরচডিউক ট্রিও খুব শুনতেন) এবং যেমন বকারিনির গীটার কুইনটেট। আরো অনেক কাজ। কয়েকটি রেকর্ড তাঁর কালেকসানে দেখলাম যা থেকে বোঝা যায় যে তিনি চেম্বার মিউজিক কত গভীরভাবে ভালোবাসতেন তা হল স্কারলাটির চৌতিরিশটি হারপসিকর্ড সনাটা এবং গ্লেন গুলডের বাজানো বেঠোফেনের পিয়ানো সনাটা।

চেম্বার মিউজিক ছাড়া তাঁর চিরন্তন প্রেম ছিল অপেরা ও কোরাল মিউজিকের সঙ্গে। প্রথম দেখাতেই তিনি আমায় বলেছিলেন যে অপেরা ছাড়া মোটসার্ট চেনা শক্ত। আসল মোটসার্ট লুকিয়ে আছে তাঁর অপেরা ও চেম্বার মিউজিকে। 'ডন জিওভানি' ও 'ম্যাজিক ফ্লুট' ছিল তার প্রিয়, কিন্তু তাঁর কালেক্‌সানে মোটসার্টের প্রায় সব অপেরা পাওয়া যায়। কসিফানটুটে, ম্যারেজ অফ ফিগারো ও সেরাগলিও তো বটেই—সেরাগলিও থেকে ওসমিনের গানগুলি তিনি প্রায় গুন গুন করে গাই-তেন। তাছাড়া তার কালেক্‌সানে পেলাম মোটসার্টের ইডিমিনিওর দুটি রেকর্ডিং এবং মোটসার্টের আরো অনেক দুর্লভ অপেরা যা রেকর্ড লাইব্রেরিতেও পাওয়া শক্ত। যেমন "থামোশ কিং অফ-ইজিপ্ট" এবং "লা ক্লেমেন্সা ডি টিটো"। তার কাছে মোটসার্টের 'ইডিমিনিও' শোনবার আমন্ত্রণ আমার ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা হয়ে ওঠে নি-নানা কারণে। তাঁর "ইডিমিনিওর" একটি রেকর্ডের কণ্ডাকটার হল বিখ্যাত বারোক কণ্ডাকটার হারনানকুরট, যার কিছু ক্যাসেট এখন ভারতবর্ষে পাওয়া যাচ্ছে। মোটসার্টের অপেরাগুলি ছাড়া তাঁর কাছে পেলাম ভারদির অপেরা 'সাইমন বকানাগেরা।' বেঠোফেনের একমাত্র অপেরা 'ফিডেলিও' হ্যাণ্ডেলের আসিস ও গালেটিয়া (এই অপূর্ব অপেরাটি তাঁর নিশ্চয় খুবই ভালো লাগত কারণ তাঁর কালেকসানে দুটি রেকর্ড পেলাম)। গ্লুকের 'অরফিউস ও ইউরিডিচে' এই অপেরাটিরও দুটি রেকর্ডিং পেলাম। তাঁর কালেক্‌সানের আরো অপেরা হল মণ্টেভারদির 'করোনেসান অফ পপিয়া', ও স্মেটানার 'বারটার্ড ব্রাইড' একদম বারোক যুগের প্রথম অপেরা থেকে রোমান্টিক অপেরা কোনোটাই তিনি বাদ দেন নি। তাঁর বইয়ের কালেক্‌সানে দেখলাম অপেরার লিবরেটোর ওপর বই। অপেরা গাইড ও অপেরা রেকর্ডের ক্যাটালগ।

অপেরা ছাড়া কোরাল সঙ্গীত ছিল তাঁর প্রিয়। তিনি বার বার শুনতেন হায়ডেনের 'ক্রিয়েসান', বাখের 'সেণ্ট ম্যাথুস প্যাসান', ভোরষাকের স্টাবাট মেটার, পারগোলেসির স্টাবাট মেটার, হায়ডেনের 'সিজনস্' ও বেঠোফেনের 'মিসা সলেমনিস।' তাঁর কালেকসানে পেলাম 'মিসা সলেমনিসের' একটি দুর্লভ রেকর্ডিং কণ্ডাক্টার কেলেম্পারার কিন্তু অরকেস্ট্রাটি ফিলহারমনিয়া নয়, ভিয়েনা সিম্ফনি

অরকেস্ট্রা—একটি ঐতিহাসিক রেকর্ডিং কারণ এই অরকেস্ট্রার সঙ্গে কেলেম্পারারের বেশী রেকর্ডিং নেই। তিনি গ্রেগোরিয়ান চাণ্টও শুনতেন। এক্‌জুলটাটে জুবিলাটের সঙ্গে তাঁর চিরকালের প্রেমের কথা সকলেই জানে। কারণ তাঁর অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে দেওয়া মোটসার্টের উপর টকে এই কাজটির কথা তিনি বলেছিলেন।

বেঠোফেন ও মোটসার্ট ছিল তাঁর প্রিয় সঙ্গীত রচয়িতা। তিনি বলতেন, মানুষের একটা জীবনে এঁদের সব কাজ শোনা যায় না। এঁদের উপলব্ধি করতে সারা জীবন কেটে যায়। মাহলার বা ব্রুকনারের কথা যখন বলতাম একটু হেসে বলতেন কিছু শুনেছি, ওঁদের শোনা খুব ফ্যাশান কিন্তু আমার বাকি জীবনটা কেটে যাবে মোটসার্ট ও বেঠোফেনকে নিয়ে। বেঠোফেনের ভায়লিন কনচেরটো ছিল তাঁর ফেভারিট্। এর কিছু অংশ তিনি 'শাখা-প্রশাখা'য় ব্যবহার করেছিলেন। বেঠোফেনের সাত নম্বর সিম্ফনির সেকেণ্ড মুভমেণ্ট তিনি খুব ভালোবাসতেন। আর ভালোবাসতেন ভারদির রেকুইম মাস—এই মাসের ল্যাকিরিমোসা অংশটি এবং মোটসার্টের অপেরা 'ডন জিওভানি' ও 'ম্যাজিক ফ্লুট' তাঁর খুব প্রিয় ছিল। 'ম্যাজিক ফ্লুটে'র প্রভাব কিছুটা 'গুপী গাইনে' এসেছে। এটা হল দুই যুগের দুই শিল্পীর আত্মার মিল। ব্রামশের দুটি পিয়ানো কনচেরটোও তাঁর খুব পছন্দ ছিল। তিনি আমায় একবার বলেছিলেন যে ব্রামশের প্রথম পিয়ানো কনচেরটোর মতন অরকেস্ট্রার কাজ খুব কম আছে। কনচেরটোর শুরু একটি তুফানের মত। মনে হয় কনসার্ট হলে ঝড় নেমে এল।

ব্রামশ বা বেঠোফেন, মোটসার্ট, হায়ডেন, স্থবার্ট বা বাখ—এঁরাই ছিল সত্যজিৎ রায়ের জীবনসঙ্গী। এই রস এক ধরণের নেশা। একবার পান করলে আর ঘোর কাটে না। তাই না বার্ণার্ড 'শ বলেছিলেন "Music is the brandy of the damned"। সেই 78 r.p m-এর যুগ থেকে সত্যজিৎ রায় এই রস পান করে এসেছেন এবং রেকর্ড সংগ্রহ করেছেন। অনেক ছোটবেলায় বেঠোফেনই তাঁর সঙ্গীতের দরজা খুলে দিয়েছিলেন। তারপর সেই পথ দিয়ে হয়েছে কত না স্থরের আনাগোনা। জীবনের শেষে এল. পি আর ক্যাসেট কম্প্যাক্ট ডিস্কের কালেক্‌সানও শুরু করেন। তিনি সব সময় ক্যাটালগ দেখে রেকর্ড কিনতেন অনেক ভেবেচিন্তে। তাঁর লাইব্রেরীতে কম্প্যাক্ট ডিস্কেরও একটা ক্যাটালগ আছে। বোধহয় আরো অনেক কালেকসান করার আশা ছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন সব শেষ হয়ে গেল। না শেষ কি হয়েছে? আমার দৃঢ় ধারণা এখন তিনি মোটসার্ট ও বেঠোফেনের সঙ্গে আলোচনা করছেন। বাখ এবং স্কারলাটির সঙ্গে হারপসিকর্ড বাজাচ্ছেন। সারা জীবন ধরে মোটসার্ট, বেঠোফেনদের জন্য অনেক প্রশ্ন জমা ছিল। এখন তাঁর সব উত্তর তিনি পাচ্ছেন।

চলচ্চিত্র-ভাবনায় সত্যজিৎ

দেবীপদ ভট্টাচার্য

সত্যজিতের চলচ্চিত্রচিন্তা
তিনখানি বই / আলোচনা

সত্যজিৎ রায়কে চলচ্চিত্রের স্রষ্টা হিসেবে আমরা সকলে জানি, জানি কিভাবে তিনি শুধু বাংলা নয়, ভারতীয় চলচ্চিত্রের আকাশে একটা জ্যোতিষ্কের মত তিন দশকেরও বেশি সময় তাঁর রুচি, শিল্পবোধ ও জীবনবোধের উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে দিয়ে অস্তমিত হয়েছেন। চলচ্চিত্র সম্বন্ধে চিন্তার ক্ষেত্রেও সত্যজিতের মনন কত পরিচ্ছন্ন আর মৌলিক ছিল তাও আমাদের অজানা থাকে না, যখন ঐ শিল্পের ওপর তাঁর লেখা বাংলা আর ইংরাজি রচনাগুলি আমরা পড়ি। আজকের এই নাতিদীর্ঘ নিবন্ধে তাঁর 'একেই বলে শুটিং' (নিউস্ক্রিপ্ট, ১৯৮৬), 'বিষয় চলচ্চিত্র' (আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮২), এবং **'Our Films Their Films'** (**Orient Longmans**, ১৯৭৬) সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই আমার যে কথাটি অবশ্য বক্তব্য বলে মনে হচ্ছে তা হোল শ্রীরায়ের দৃষ্টিভঙ্গী এবং বাচনভঙ্গীর স্বচ্ছতা ও সাবলীলতা। এই শব্দদুটিকে আমি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ব্যবহার করতে চাই। কারণ বহুল ক্ষেত্রে ভাষার ব্যবহারে আমরা অত্যন্ত শিথিল ও অসাবধান হয়ে পড়ি। সত্যজিৎ চলচ্চিত্র শিল্পকে এমন মনপ্রাণ দিয়ে পছন্দ করতেন, তার শিল্পগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এত পরিষ্কার ছিল যে শুধু ছবি তৈরী করার সময় নয়, চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনার বেলাতেও তাঁর চিন্তার পরিচ্ছন্নতা, তাঁর ভাষার স্বাচ্ছন্দ্য আর পরিচ্ছন্নতার মধ্যে ধরা পড়তো। কার্টুনিস্ট আবু আব্রাহাম ঠিকই বলেছেন, **'In these essays we discover a sensitive artist, sure of what he wants. It should not surprise anybody to see how well Satyajit Ray writes.'** সত্যজিৎবাবু যখন কলম ধরতেন তখন জাতশিল্পীর মত খুব তাত্ত্বিক বিষয়কেও সহজ ও সরল করে তুলতেন। এই তিনটে বইয়েই তার ভূরি ভূরি প্রমাণ মেলে।

সত্যজিৎবাবুর তৈরি চলচ্চিত্র, তাঁর আঁকা ছবি আর তাঁর লেখা গল্পগুলির মত তাঁর এই বই তিনটিও যে কারণে আমাদের মুগ্ধ করে তা হোল, তাদের বিষয়বস্তুর উপস্থাপনার স্বাচ্ছন্দ্য, সাবলীলতা আর আন্তরিকতা। যেমন গল্পচ্ছলে সহজ ভাষায় 'একেই বলে শুটিং' বইটিতে তিনি চলচ্চিত্র তৈরী করার সময়ে পাওয়া তাঁর

নানা কৌতুকপ্রদ অভিজ্ঞতা ছোটদের জন্য পরিবেশন করেছেন, তেমনি আবার 'বিষয় চলচ্চিত্র' বইটিতে উপযুক্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে তিনি শিল্পমাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের নানা বৈশিষ্ট্য আর সমস্যার চিন্তাসমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন। চলচ্চিত্র-স্রষ্টা হিসেবে তিনি যে দক্ষতা আর 'professionalism' আয়ত্ত করেছিলেন, চলচ্চিত্রের তাত্ত্বিক হিসেবেও তিনি ঠিক ততখানি মৌলিকতা আর 'no nonsense' মনোভাব দেখিয়েছেন যা প্রত্যেক চলচ্চিত্র-রসিকের মনে স্থায়ী দাগ রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। সত্যজিৎবাবুকে আমরা বরাবরই maker বা স্রষ্টা হিসেবে চিনেছি—চলচ্চিত্র-শিল্পের নানা তাত্ত্বিক সমস্যা সম্বন্ধে তিনিও যে Eisenstein বা Pudovkin -এর মত চিন্তা করতেন, এই প্রবন্ধগুলি তার স্পষ্ট প্রমাণ। তৃতীয় বইটি, অর্থাৎ 'Our Films, Their Films'-এ সত্যজিতের লেখা ২৬টি ইংরাজি প্রবন্ধ সঙ্কলিত হয়েছে। প্রবন্ধগুলি নানা সময়ে বিভিন্ন দেশি ও বিদেশি পত্র-পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। ভারতীয় চলচ্চিত্র, বিভিন্ন খ্যাতিমান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-পরিচালক, আর তাঁর নিজের ছবি করতে গিয়ে লেখক যে-সব সমস্যার মুখে পড়েছেন—এই সব কিছুর নানা মনোজ্ঞ আলোচনায় এই সংকলনটি চলচ্চিত্রের নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটা গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। আমার বিশ্বাস, এই তিনখানি বই-ই বিভিন্ন কারণে শুধু আমাদের কাছে সুখপাঠ্য নয়, আমাদের চিন্তাকেও উদ্দীপ্ত করে।

'একেই বলে শুটিং' বইটি যে একটু হালকা ধরণের তার নাম থেকেই তা স্পষ্ট; কিন্তু বইটির বিষয়বস্তু আর তা উঠতি বয়সের পাঠকদের কাছে মেলে ধরার পদ্ধতি এতই জীবন্ত যে বালক/বালিকা, তরুণ/তরুণী, প্রৌঢ়/প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ/বৃদ্ধা সবাই পরম উৎসাহ আর কৌতূহলের সঙ্গে বইখানির আদ্যোপান্ত পড়বেন। কম খরচে উঁচুমানের ছবি করার উচ্চাশা পূর্ণ করতে গিয়ে চলচ্চিত্র-পরিচালক ও তাঁর কর্মীদের কত রকমের সমস্যায় পড়তে হয়, যে-সব প্রেক্ষাগৃহের পর্দায় প্রতিফলিত দৃশ্য আমাদের কাছে খুব স্বতঃস্ফূর্ত আর স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে সেগুলি তুলতে গিয়ে পরিচালক, ক্যামেরাম্যান ও অন্যান্য কর্মীদের কি রকম হিম-সিম খেতে হয়েছে তা এই বইটির 'বাঘের খেলা' (গুপী আর বাঘার বাঁশ বনে বাঘ দেখার ইতিহাস), 'হুণ্ডী-ঝুণ্ডী-শুণ্ডী', 'উট বনাম ট্রেন' ('সোনার কেল্লা' ছবির একটি অনবদ্য দৃশ্যের শ্যুটিং-এর কাহিনী), ফেলুদার সঙ্গে কাশীতে ('জয় বাবা ফেলুনাথ'ছবির শ্যুটিং-এর কাণ্ডকারখানা) প্রভৃতি উপাখ্যানে অসাধারণ মজার সঙ্গে প্রাঞ্জল ভাষায় পরিচালক রায় তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ, চলচ্চিত্র শিল্প যে সব সময় একটা 're-creating a reality that is imagined by its director' এবং এই re-creation করতে গিয়ে পরিচালক আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গকে কত কাঠখড় পোড়াতে হয়, কত মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়, কত উদ্ভাবনী বুদ্ধি ধরতে হয় তা এই

রচনাগুলি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তোলে। সবচেয়ে বড কথা হোল এই সব অসুবিধে আর মেহনতকে শ্রীরায় চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছেন এবং তাতে জিতে তাঁর অভীষ্ট ফল পেয়েছেন।

সত্যজিতের রসবোধ আমাদের তাঁর বাবা সুকুমারের কথা মনে করিয়ে দেয়। এমন সব ছোট ছোট মজার ঘটনা বা উক্তি তিনি এই লেখাগুলির মধ্যে বুনেছেন যে আমাদের হাসিতে ফেটে পডবার অবস্থা হয়। প্রতিদিন সকালে unit-এর সবাইকে চা দেবার আগে 'বাঙ্গালী জাগো' বলে কামু মুখার্জির চীৎকার, কিংবা দলের অভিনেতা রাজকুমার লাহিডীর রাজস্থানে শ্যুটিং-এর সময় সব জায়গায় গিয়ে নাগরা জুতো সংগ্রহের বাতিক এবং তাই নিয়ে কামুর 'Nagra Falls' সৃষ্টি করার হুমকি, এই রকম অসংখ্য চুটকি গল্পের ইতস্ততঃ প্রক্ষেপ বইটিকে কৌতুকরসের ভাঁডার করে তুলেছে। চলচ্চিত্র-শিল্পের পেছনে যে-সব মানুষ কাজ করেন সত্যজিৎ শুধু তাদের কাজ করিয়েই সন্তুষ্ট হতেন না, তাঁদের মানুষ হিসেবে কিরকম গুরুত্ব দিতেন, তার অসংখ্য নজির এই বইখানিতে আথছাব পাওয়া যায়।

'বিষয় চলচ্চিত্র' বইটি অবশ্যই আর একটু গুরু-গম্ভীর চরিত্রের। কিন্তু চলচ্চিত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু পাঠক বইটি পডে শুধু তৃপ্ত হবেন না, অনেক মূল্যবান চিন্তার খোরাক পাবেন। 'চলচ্চিত্রের ভাষা : একাল ও সেকাল', 'চলচ্চিত্র রচনা : আঙ্গিক, ভাষা ও ভঙ্গি', 'চলচ্চিত্রের সংলাপ প্রসঙ্গে', 'চারুলতা প্রসঙ্গে', 'রঙ্গীন ছবি' ইত্যাদি রচনা শুধু সত্যজিতের নিজের চলচ্চিত্রবোধ সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে না, চলচ্চিত্র-শিল্পের বহু মৌলিক শিল্পনীতি সম্বন্ধে এই প্রবন্ধগুলি আমাদের স্বচ্ছ ধারণা দেয়।

ছবি করতে গিয়ে সত্যজিৎ কখনোই নতুন ফ্যাশনের আঙ্গিকের অন্ধ অনুকরণ করেন নি, যদিও সফলভাবে তা করবার ক্ষমতা তাঁর নিঃসন্দেহে ছিল। কিন্তু জাতশিল্পী হওয়ার দরুণ কখনও হালফ্যাশনের কায়দা-কানুনকে অন্ধভাবে অনুকরণ করার মানসিকতা তাঁর ছিল না। এই সম্বন্ধে 'চলচ্চিত্রের ভাষা : একাল ও সেকাল' প্রবন্ধটিতে তাঁর কথাগুলি একবার ভাল করে অনুধাবন করার যোগ্য। তিনি বলছেন, 'কিন্তু আজ যে নতুন ভঙ্গিটা সিনেমায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সেটা অনেক সময় মনে হয় যেন একটা আস্ফালনের ভঙ্গি ; তাতে চমক-লাগানোর প্রয়াসটা বেশ স্পষ্ট। আর পার্থক্যটা এত স্পষ্ট বলেই হয়ত তার প্রভাব এত দ্রুত আর ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পডছে। ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা ইত্যাদি বিভিন্নদেশের তরুণ পরিচালকেরা এই নতুন বুলি আওড়াচ্ছেন। বারবার দর্শকদের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছেন, এবং চিত্রসমালোচকদের উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলছেন। এই সব সমালোচকদেরই মধ্যে কেউ কেউ বলছেন, এই নতুন ভাষাই হোল আজকের চলচ্চিত্রের উপযুক্ত ভাষা ; এই ভাষা যে-ছবিতে ব্যবহার হোল না, সে ছবি

যুগোপযোগী শিল্প-সৃষ্টির পংক্তিতে স্থান পাবার যোগ্য নয়।' এই প্রবণতা সম্বন্ধে সত্যজিতের মনোভাব অনুশীলনের যোগ্য : 'ব্যাপার গুরুতর এবং গুরুতর এই কারণেই যে, যুগটা হোল হুজুগের যুগ, ফ্যাশনের যুগ। এই দুইয়ের দৌরাত্ম্য আমাদের পোড়া দেশেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাঙ্গালী তরুণদের মধ্যে আজকাল অনেকেই আর বাবু হয়ে বসেন না, কারণ চোঙা প্যান্টে সে কাজটা সম্ভবপর নয়। অথচ চোঙাপ্যান্ট না পড়লে ফ্যাশান থাকে না। পোষাকের ব্যাপারে যেটা সম্ভব, শিল্পের ব্যাপারেও যে সেটা ঘটতে পারে না এমন কোন ভরসা নেই। সুতরাং মনে হয় এই ভাষার ব্যাপারটাও একটু তলিয়ে দেখা দরকার। সত্যই কি এই ভাষা সিনেমার একটা নতুন পর্ব সূচিত করল, যার ফলে এ-পর্যন্ত যা হচ্ছিল তা ওল্ড-ফ্যাশন্‌ড হয়ে গেল, না-কি এ-ভাষাও চোঙাপ্যান্টের মত এমন একটা কিছু যাতে সব কাজ চলে না। ফলে অনেক কাজ বাদ দিতে হয়। কারণ তা না হলে ফ্যাশান থকে না।' এর পরে চলচ্চিত্রের ভাষা নিয়ে সত্যজিতের অনেক সুচিন্তিত বক্তব্য উদ্ধৃত করা যায়; সব সময়ই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে ভাষা যদি কোন ভাবকে পরিষ্কার না করে, কিংবা প্রয়োজন হলে ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ করে প্রকাশ না করে, তবে তাকে শুধু হাল ফ্যাশনের করার কোন মানে নেই। চলচ্চিত্রের ভাষা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সত্যজিৎ সব সময়ে ক্যামেরার দৃষ্টি দিয়ে দেখা দৃশ্যনিচয়ের গ্রন্থনার কথা বলেছেন। সেখানে তিনি লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয়, গ্রিফিথ্, চ্যাপ্‌লিন, আইজেনস্টাইন, পুদভ্‌কিন্, দভঝেঙ্কো, শিলার, মূর্ণাউ, পাবস্ট্, লুবিচ প্রমুখ বহু প্রতিভাধর মার্কিন, রুশ এবং য়ুরোপীয় চলচ্চিত্রকারের অবদানের উল্লেখ করে দেখিয়েছেন কিভাবে তাঁরা সবসময়ই বক্তব্যের সুচারু এবং অর্থবাহী উপস্থাপনার উদ্দেশ্যে পর্দায় প্রতিফলিত দৃশ্যমালাকে গেঁথেছেন, ক্যামেরার কায়দা বা নিজের মুন্সীয়ানার নিছক প্রকাশের তাগিদ কখনও তাঁদের সক্রিয় করে নি। জাপানের বিশ্ববন্দিত পরিচালক আকিরা কুরোসাওয়ার চলচ্চিত্র-ভাষা সম্বন্ধে সত্যজিতের বক্তব্য মনে রাখার মত। 'উনিশশো পঞ্চাশ কি একান্নো সালে ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয় জাপানী পরিচালক আকিরা কুরোসাওয়ার ছবি 'রসো মন'। এ ছবি উৎসবে উপস্থিত সমঝদারদের আশ্চর্যভাবে নাড়া দিয়েছিল। এর কারণ ছিল 'রসো মন'-এর অভিনব বিষয়বস্তু ও আশ্চর্য চিত্রভাষা। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটেছিল এই ছবিতে। জাপানের 'কাবুকি ও নো' নাটকের অভিনয়-রীতি, জাপানী উডকাঠের চিত্রকল্প ও কম্পোজিশন, মার্কিন ওয়েস্টার্ন-সুলভ ক্ষিপ্রগতি ও যে-কোন দেশীয় মহৎ উপন্যাসসুলভ মন্থর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ চরিত্র বিশ্লেষণ —এই সবই এই ছবিটির মধ্যে আশ্চর্যভাবে মিশে খাপ খেয়ে গিয়েছিল। কুরো-সাওয়ার পরের ছবি দেখে বোঝা গেছে তিনি বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে তাঁর চিত্রভাষা যেমন ইচ্ছা পরিবর্তন করতে সক্ষম। আর আশ্চর্য এই যে, নানান স্টাইলের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও স্টাইলের খিচুড়ি জিনিসটা তিনি আশ্চর্যভাবে এড়িয়ে গেছেন।'

সত্যজিৎ বলতে চেয়েছেন যে চলচ্চিত্রের স্টাইল বা আঙ্গিক সব সময়েই বিষয়বস্তুনিষ্ঠ হওয়া দরকার। আঙ্গিকের নিজস্ব কোন অস্তিত্ব থাকে না, থাকা উচিত নয়, কারণ তার উদ্দেশ্যই হোল কোন চিন্তা, বক্তব্য বা দৃশ্যকে শটের মাধ্যমে দর্শকমানসে মুদ্রিত করা। বলাই বাহুল্য, শুধু চলচ্চিত্রের নয়, যে-কোন শিল্পের মৌলিক নীতিই হোল এই।

এই আলোচনায় 'বিষয় চলচ্চিত্র' বইটিতে সত্যজিৎ-আলোচিত সব বিষয়গুলির ওপর মন্তব্য করার অবকাশ নেই; কিন্তু 'চারুলতা প্রসঙ্গে' প্রবন্ধটি নিয়ে কিছু ভাবনা করা দরকার, কারণ এখানে লেখক সার্থক সাহিত্যের সৎ এবং মূলস্থষ্টির অনুসারী চলচ্চিত্রায়নের কথাটা নিয়ে চিন্তাগর্ভ আলোচনা করেছেন। কোন বিদগ্ধ লেখক সত্যজিতের 'চারুলতা'র সমালোচনা করতে গিয়ে যখন অভিযোগ করেন যে ছবিটি রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়ে'র মূল স্বরটি থেকে সরে গিয়েছে, তখনই সত্যজিৎ জবাব হিসেবে আলোচ্য প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। সত্যজিতের প্রধান যুক্তি এই যে চলচ্চিত্র-পরিচালক যদি চিত্রণীয় কাহিনীর অন্তর্নিহিত স্বরটি বুঝে থাকেন এবং সেই সঙ্গে যদি তিনি চলচ্চিত্রের মাধ্যমগত বিশেষত্বগুলি সম্বন্ধেও সজাগ থাকেন, তা হলে কখনই তিনি 'মাছি মারা' কেরাণীর মত ছবিটিতে কাহিনীটির প্রতিটি ঘটনা ও দৃশ্যের অন্ধ অনুকরণ করবেন না। সত্যজিতের মতে 'নষ্টনীড়ে'র ভেতরকার স্বরটি ধরাই হবে দায়িত্বশীল পরিচালকের কাজ এবং তা করতে গিয়ে চলচ্চিত্রের দৃশ্যগ্রন্থন আর কাহিনীর ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে যদি কিছুটা আপাত পার্থক্য এসে পড়ে তা শুধু অনিবার্য নয়, বাঞ্ছনীয়। সত্যজিৎ বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের গল্পের আসল জিনিসটি বিধৃত আছে কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে, সম্বন্ধের টানা-পোড়েনের মধ্যে। সম্বন্ধভিত্তিক ঐ 'Tension' ফুটিয়ে তোলবার জন্য পরিচালক চলচ্চিত্রের নিজস্ব ঢং-এ কাহিনীর স্থানে স্থানে পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু তাকে কোনমতেই কাহিনীর মূল স্বরের বিকৃতি বলা যাবে না। অবশ্যই সত্যজিতের যুক্তি অকাট্য, তবে 'চারুলতা'তে তিনি সর্বতোভাবে রবীন্দ্র-কাহিনীর আভ্যন্তরীণ স্বরকে অক্ষত রেখেছেন, এ মন্তব্য আমরা এখানে করতে পারি না, কারণ সে আলোচনার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধের অবতারণা হয় নি। তবে এইটুকু এখানে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে, তাঁর যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সত্যজিৎ রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর এবং তাঁর নিজের 'চারুলতা' ছবির দীর্ঘ তুলনামূলক সমান্তরাল আলোচনা করেছেন, যে আলোচনায় কোন ফাঁকি নেই। 'বিষয় চলচ্চিত্রে'র শেষ প্রবন্ধ 'শতাব্দীর সিকিভাগ' প্রবন্ধটিতে সত্যজিৎ চলচ্চিত্রকার হিসাবে তাঁর পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতা এবং বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর আশঙ্কার কথা বলেছেন। চলচ্চিত্র যে অন্য আর সব শিল্পের মত শুধুমাত্র শিল্পীর কল্পনা ও সৃষ্টি-ক্ষমতার উপর নির্ভর করে না, তার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন ও জনমানসের গ্রহণ-ক্ষমতা সম্বন্ধে পরিচালকের সচেতনতার দরকার তা এই শিল্পটিকে একেবারে অন্য

একধরণের যে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে তা শিল্পীর অনুপ্রেরণাকে রুদ্ধ করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। প্রবন্ধটি শেষ করার আগে সত্যজিৎ বলেছেন, 'গত কয়েক বছরে চিত্র-নির্মাণের খরচ বেড়েছে মারাত্মকভাবে। সেই সঙ্গে নির্ভরযোগ্য যন্ত্রপাতির অভাবে স্টুডিও ল্যাবরেটরি প্রেক্ষাগৃহগুলির দৈন্যদশায়, হিন্দি ছবির প্রভাবে দর্শকদের রুচি-বিকৃতির ফলে এবং লোডশেডিং-এর দৌরাত্ম্যে বাংলা ছবি আজ এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে এই পঁচিশ বছরে যা শিখলাম সেটা কাজে লাগানোর সুযোগ আর কতদিন থাকবে সে বিষয়ে সন্দেহ হয়।' ভাল চলচ্চিত্রকারদের পক্ষে আজ বাংলা ছবির পরিবেশ কত প্রতিকূল তা আজকের বাংলা ছবির বাজার দেখলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আগেই বলা হয়েছে, তৃতীয় বইটি ইংরাজিতে লেখা কতকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধের সঙ্কলন। প্রথম প্রবন্ধটি Introduction (অবতরণিকা) হিসাবে চিহ্নিত হলেও বলা চলে চলচ্চিত্র সম্বন্ধে সত্যজিতের ঔৎসুক্য এবং পরে অনুরাগের সূচনা থেকে শুরু করে আধুনিক পাশ্চাত্য চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তুর permissiveness (যৌন বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অতি খোলামেলা চরিত্র) সম্বন্ধে সুচিন্তিত বক্তব্য সবই এতে স্থান পেয়েছে। এইখানে যে কথাটা অবশ্যই বলা দরকার তা হোল, যেমন বাংলা-ভাষাকে তেমনি ইংরেজিকেও সত্যজিৎ বিরল দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন; বিষয়বস্তুর সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ও উপলব্ধি যেমন অসাধারণ, তার উপস্থাপনাও তেমনি মনোজ্ঞ। চলচ্চিত্রে Permissiveness সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য থেকেই এই মন্তব্যের যৌক্তিকতা বোঝা যাবে। তিনি বলেছেন,

> 'There is no doubt that permissiveness in the cinema is of major sociological significance as a reflection of the changing mores of Vestern Society; but to justify it as some higher form of artistic truth is as ridiculous as the simulated intercourse indulged in by unclothed performers in film after film after permissive film. Apparently, such is the dread in which thc stigma of prudery is held in the West today the even the distinction between gratuitions eroticism, which is plain pornography and eroticism that is valid in its context is glossed over by most critics'.

(পাশ্চাত্য চলচ্চিত্রে যৌন বিষয়ের প্রত্যক্ষ উপস্থাপনায় যে উদারতা আজকাল দেখা যাচ্ছে তা যে সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে ঐ সমাজের নীতিবোধের প্রতিফলন হিসেবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ঐসব ছবিকে উচ্চতর শিল্পোত্তীর্ণ সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার যে চেষ্টা চলেছে তা

ছবির পর ছবিতে দিগম্বর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রত্যক্ষভাবে অভিনীত যৌন সংসর্গের দৃশ্যের মতই হাস্যকর এবং অসত্য। বোঝা যাচ্ছে, আজকের পশ্চিম-সমাজে যৌন বিষয়ে অতিরক্ষণশীল বলে চিহ্নিত হওয়াকে সকলে এত ভয় করেন যে অপ্রয়োজনীয় অশালীন যৌন দৃশ্যের অবতারণা আর কাহিনীর প্রসঙ্গনির্ভর যৌনতার মধ্যে যে পার্থক্য তাও অধিকাংশ চলচ্চিত্র-সমালোচক এড়িয়ে যেতে চান।)

এই বইটির প্রথম তেরোটি প্রবন্ধ বাংলা আর অন্য ভারতীয় ভাষায় তৈরি চলচ্চিত্রে উৎসর্গীকৃত। প্রথম প্রবন্ধ 'What is wrong with Indian Film ?' এ সত্যজিৎ ভারতীয় চলচ্চিত্রের বিভিন্ন দোষের পেছনে সবচেয়ে বড কারণ হিসেবে দেখেছেন এ-দেশের সংস্কৃতির ওপর পশ্চিমের প্রভাবকে। 'The infulence of Western civilisation has created anomalies which are apparent in almost every aspect of our life'—পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাব আমাদের জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে তা সহজেই চোখে পড়ে। ফলে চলচ্চিত্র তৈরির ক্ষেত্রেও আমরা পুরোপুরি ভারতীয় মানসিকতার ভিত্তিতে চিন্তা, দৃশ্যগ্রন্থনা ইত্যাদি করতে অপারগ হই। উদয়শঙ্করের যে 'কল্পনা' ছবিটি দর্শকগণের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল তাও 'used such dissonances in a couscious and consistent manner so that they become a part of his (Udayshanker's) cinematic styles) সত্যজিৎ যথার্থ ই বলেছেন যে প্রকৃত ভারতীয় চলচ্চিত্র এই ধরণের অসামঞ্জস্য এড়িয়ে চলবে এবং ভারতীয় জনজীবনের মৌল সত্যের মধ্য থেকে তার বিষয়বস্তু ও উপাদান খুঁজে নেবে—যেখানে মানুষের জীবনযাত্রার ছন্দ, তার বাচনভঙ্গী, তার স্পন্দন, পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, পটভূমি এবং ঘটনাস্থল সমস্ত কিছু একটা সুসমঞ্জস সম্পূর্ণতার রূপ নেবে। নিজের অনেক ছবিতে তিনি সফলভাবে এই সামঞ্জস্যপূর্ণ চিত্রকল্পের অবতারণা করেছেন, একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি।

সত্যজিতের এই ইংরেজী বইটি মাত্র ২১২ পাতার হলেও তার প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধ চিন্তাশীল পাঠকের কাছে মূল্যবান বলে মনে হবে, এই আমার বিশ্বাস। এই নাতিদীর্ঘ আলোচনায় সবগুলি প্রবন্ধের বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই, তবে কয়েকটি প্রবন্ধ থেকে কিছু কিছু অংশ তুলে না ধরলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। 'Film making' প্রবন্ধটিতে বাংলা চলচ্চিত্র-নির্মাণের সবচেয়ে বড় সমস্যা সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ইংরেজিতে বলেছেন, 'The striving to find a balance between means and ends applies particularly to a place like Bengal where the smallness of the market and the circumstances of distribution provide an automatic check on technical

expansion.' শুধু কল্পনা, এমনকি বৃত্তিগত দক্ষতাও ভাল চলচ্চিত্র তৈরি করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। কারণ, চলচ্চিত্রের যে অর্থনৈতিক আর বাণিজ্যিক দিক আছে তাকে মনে না রেখে চলচ্চিত্র তৈরির কল্পনা নিছক বাতুলতা। সত্যজিৎ যদিও সব সময় 'অন্যধরণের' চলচ্চিত্র করেছেন, তবু চলচ্চিত্রের ব্যবসায়িক দিক সম্বন্ধে তিনি কখনও চিন্তাহীন থাকেন নি।

'The Odds Against Us' প্রবন্ধে সত্যজিৎ ভারতীয় নৈতিক এবং সামাজিক আচার-আচরণ কিভাবে বিশেষ বিশেষ ধরণের কাহিনীর চিত্ররূপ সৃষ্টির পরিপন্থী পরিবেশের সৃষ্টি করে তা পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন : Balancing the b dg t, tricky as it is, is unfortunately the only problem that a serious filmmaker (in India) faces. In the choice of story itself, he is faced with limiting factors non-existent in other countries For instance, a full-blooded treatment of the story of physical passion and such stories, great ones even—are not lacking in our literature—is unthinkable on the Indian screen. I used a shot of a couple kissing in Devi, but did not venture beyond a long shot with the lovers silhouetted behind a mosquito netting. I am sure if I had gone in for a close-up and lit the action more clearly, cat calls from the lower stalls would have ruined my delicate moo l etting sound track of shilling criekets and distant howling jack l The scences of love-making in Indian films have therefore been reduced to a formula of clasping hands, longing looks, and rapid, supposedly amorous verbal exchanges—not to speak of love duets sung against artificial romantic backdrops. It is the dead weight of ultra-Victorian moral conventions which reduces the best of directors to taking refuge in these devices.

সত্যজিতের এই বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে তিনি একদিকে যেমন অশালীন এবং অপ্রাসঙ্গিক যৌনমিলনের দৃশ্যের অবতারণার বিরোধী, তেমনি কাহিনীর পূর্ণ উপস্থাপনার জন্য যদি নরনারীর নিবিড় মিলন দৃশ্যের প্রয়োজন থাকে তাতে আপত্তি করার তিনি বিরোধী। আসলে কপট নৈতিকতা এবং কুরুচিপূর্ণ অশ্লীলতা দুইই যে প্রকৃত শিল্পের পক্ষে হানিকর তা তিনি অন্য অনেক সৎশিল্পীর মত বুঝতেন।

'Calm Within, Fire Without' প্রবন্ধে সত্যজিৎ দেখিয়েছেন কি ভাবে যে কোন জাতশিল্পী নতুন পশ্চিমে উদ্ভাবিত চলচ্চিত্র মাধ্যমকেও নিজের জাতীয়

এবং ব্যক্তিগত উপলব্ধি প্রকাশের বাহন হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। জাপানী চিত্র-পরিচালকরা—যাঁদের মধ্যে আছেন মিসোগুচি, কুরোসাওয়া ও সিগো—এঁদের ছবির বহিরাবরণ ও তাদের আভ্যন্তরীণ সত্তার মধ্যে যে পারম্পর্য স্থাপন করেছেন তাকে সত্যজিৎ অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন : **'I am struck by the search for inner truth that marks the best Japanese movies, as it marks their other arts'.** এই আন্তর সত্যকে চলচ্চিত্রোপযোগী দৃশ্যগ্রন্থনার সাহায্যে ফুটিয়ে তোলাই যে-কোন বড চিত্রপরিচালকের একমাত্র ধ্যান হওয়া উচিত, তা সত্যজিৎ পরিষ্কারভাবে আমাদের বলতে চেয়েছেন।

পরিশেষে, চ্যাপলিন সম্বন্ধে সত্যজিতের কয়েকটি মন্তব্য নিয়ে আলোচনা করেই বর্তমান নিবন্ধের যবনিকা টানতে চাই। চ্যাপলিন নিয়ে তাঁর দুটি প্রবন্ধ এই সঙ্কলনটিতে স্থান পেয়েছে। প্রথমটি ঐ বিখ্যাত শিল্পীর বিখ্যাত ছবি **'Gold Rush'** নিযে, আর দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে চ্যাপলিনের আত্মজীবনী **'My Autobiograpy'** নিযে সত্যজিৎ আলোচনা করেছেন। **'Gold Rush'** ছবিটির আলোচনা আমাদের শেখায কিভাবে মহৎ চলচ্চিত্র দেখতে হয়। কিভাবে তার ভেতরকার বক্তব্যকে বুঝতে হয। নির্বাক চলচ্চিত্রের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতাকে চ্যাপলিন কি ভাবে অনবদ্য হাস্যরসঋদ্ধ সমাজচেতনা প্রতিবিম্বনেব কাজে লাগিযেছেন, তা সত্যজিতের অন্তর্দৃষ্টিসমৃদ্ধ আলোচনা স্পষ্ট করে তুলেছে।

সবশেষে আমি পাঠকদের কাছে একটি বিশেষ বক্তব্য রাখব। সত্যজিৎকে চলচ্চিত্র পবিচালক, সংগীত স্রষ্টা, ছোট ছোট কাহিনীর রচয়িতা ইত্যাদি বিভিন্ন ভূমিকায দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। গভীর তাত্ত্বিক আলোচনাকেও তিনি কত আকর্ষণীয এবং সহজবোধ্য করে তুলতে পারেন, প্রাবন্ধিক হিসেবেও তাঁর মুন্সিযানা কত বেশি তা বুঝতে হলে এই তিনখানি বই পডা দরকার।

আমার বিশ্বাস এই বইগুলি স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যহিসেবে স্বীকৃত হওয়া উচিত, যাতে ছোটবেলা থেকেই চলচ্চিত্র সম্বন্ধে একটা সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন ধারণা তাদের মনে গডে ওঠে, যাতে বেযাডা অশালীন হিন্দী ও বাংলা ছবির গ্লানিকর প্রভাব সম্বন্ধে তারা অল্পবয়স থেকেই সচেতন হতে পারে।

লেখক সত্যজিৎ

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

এ, বি, সি, ডি

১৮৪১-এ এডগার অ্যালেন পো তাঁর লেখা 'মার্ডার ইন্ দি রু মর্গ' নামে গল্পটি লিখে সাহিত্যক্ষেত্রে একটি নতুন প্রজাতির জন্ম দিলেন—তা হল গোয়েন্দা কাহিনী। কিন্তু অনুসন্ধান জনিত বিস্ময়কে রসে ও শিল্পে রূপান্তরিত করার প্রাচীনতর কালজয়ী নিদর্শনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় অনিবার্য হয়েছে দুটি প্রধান নাটকের উপভোগে। একটি 'রাজা অয়দিপাউস', অপরটি 'হ্যামলেট প্রিন্স অফ ডেন্‌মার্ক'। তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই পো তাঁর গল্পটির ভিতর দিয়ে এই নতুন ধারাটিকে নির্ভুল পরিচয় পদক পরিয়ে দিলেন। তারপর একশতাব্দী আগে কন্যান্ ডয়েলের কল্পনায় প্রবেশ করেছিলেন হোম্‌স্। কন্যান্ ডয়েলের নোট বইয়ে লেখা আছে কী ভাবে শেরিংফোর্ড হোম্‌স্ এবং শেরিংটন হোপকে পাশ কাটিয়ে 'এ স্টাডি ইন্ স্কারলেট'-এ শার্লক হোম্‌স্ দৃঢ় আসন পাতলেন চিরকালের জন্য। হোম্‌সীয় সত্য নিষ্কাশন পদ্ধতি অচিরকালের মধ্যে একটা ধ্রুবলোকের ছাড়পত্র পেয়ে গেল। এ যদি শুধুই হ'ত একটা বুদ্ধির ব্যায়াম, কৌশলের কারসাজি, তা হলে এর দাম একটা যান্ত্রিক ধাঁধাঁর বেশী হত না। কিন্তু ডিটেক্‌শন স্টোরি তার জন্মমুহূর্ত থেকে একটা কথা প্রমাণ করে চলেছে। তা হল সমাজ এবং ব্যক্তির জীবনে প্রতীয়মান নিস্তরঙ্গ স্রোতের তলায় আছে অনেক চোরাটান, অনেক হিংস্র আবর্ত। সভ্যতা মানুষকে নিশ্চয় এগিয়ে দিয়েছে অনেকখানি। কিন্তু সব অন্ধকার গহ্বরকে সে বুজিয়ে দিতে পারে নি। পুরাকাহিনীর বিচার করলেও একথা অবশ্য স্বীকার্য যে অপরাধ মানুষের জীবনে প্রবেশ করেছে অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে—কিন্তু তার প্রবৃত্তির মধ্যেই ছিল তার পতনের বীজ। এই পতনকে প্রকৃত উপন্যাস গুরুত্ব দিয়েছে একদিক থেকে—তার মূল্য আলাদা। তদন্তের গল্প বা ডিটেক্‌শন স্টোরি তাকে গুরুত্ব দিয়েছে আরেকভাবে। মূল্যের তারতম্য মেনে নিয়েও তার বিচারের কাঠগড়া অন্য। গল্প হিসাবে বিচার করলে বলা যায় 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র গল্প রোহিণী খুনের গল্প। কিন্তু আসল গল্পটা যখন দাঁড়িয়ে যায় গোবিন্দলালের সুমতি হত্যার গল্প, তখনই এ গল্পে বাইরের রক্তপাতের থেকে অনেক বেশী মর্মান্তিক হয়ে ওঠে একটা মানুষের ভিতরের রক্তাক্ত হাহাকার। আবার ব্যাপারটাকে একটু অন্যভাবে দেখা যায়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আদিম রিপু' গল্পটাকে লেখক যদি উল্টোদিক থেকে ধরতেন তা হলে কাহিনীটি চলে আসতো যথাযথ উপন্যাসের এলাকায়—হয়তো

তা কিছুটা হয়েওছে। এমনভাবে যে দেখা যায়, তার প্রমাণ মেলে উল্টোদিক থেকে সাজানো 'হ্যামলেট' গল্পে।

আধুনিক সমাজেই অপরাধ তদন্ত কাহিনীর বাড-বাডন্ত ঘটেছে। আধুনিক সমাজের—বিশেষ ধনতান্ত্রিক সমাজের আপাত চকচকে মোড়কটি সরিয়ে এর ভিতরকার সমস্ত স্ববিরোধকে দেখিযে দেয় গোয়েন্দাকাহিনী। বুর্জোয়া জীবনাচরণের মধ্যে কোনখানে কতরকমের গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা লুকিয়ে রয়েছে সেদিকে আঙ্গুল দেখিয়ে যায় এই জাতীয় কাহিনী। মধ্যবিত্ত সমাজের আপাত আত্মতৃপ্তির আবরণটি মাঝে মাঝে ছিঁডে ফেলে দেয কৌশলী তদন্তকারী। যেহেতু প্রায়ক্ষেত্রেই সে রাষ্ট্রীয় পুলিশের কেউ নয়, সেজন্যই তার স্বাধীন তদন্ত মেধাবী সামাজিকের চরিত্রবীক্ষণ। কবে কোথায দেডদশক আগে হয়ে গিয়েছে বিচার বিভ্রাট, কোন বিচারকের মোহ সুদূরপরিণামী হযেছে কোথায়, কোথায় আপাত ভব্যতার অন্তরালে লুকিযে ছিল বিষাক্ত ছুরিকা, কেমন করে বিশ্বাসের সুযোগ নিযে হননেচ্ছা কার্যকর হতে চেয়েছিল, হত্যা সব সমযে দণ্ডনীয় হওয়া সত্ত্বেও কখন হত্যাকেই মনে হযেছে জাস্টিস—এই সমস্ত ঘটনার ভিতর দিয়ে আধুনিক সমাজ ও পরিবারের যক্ষ্মাকীট কোথায়, বেসরকারী গোয়েন্দা তা দেখিয়ে দেন।

বেসরকারী গোযেন্দা এই অভিধাটির মধ্যেই আছে বুঝি একটা ভূমিকার আভিজাত্য। পোযারো বা হোম্‌স্‌ বা বোমকেশ অথবা ফেলুদা যদি পুলিশ বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতেন তা হলে তাঁরা কেউই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারতেন না। 'পুলিশ' এই কথাটির ভাবানুষঙ্গে তৎক্ষণাৎ দুটো বিমুখতা গডে ওঠে। এক, পুলিশী তৎপরতা সমষ্টিগত প্রাতিষ্ঠানিক তৎপরতা—বেসরকারী গোয়েন্দা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। দুই, পুলিশ পেশী প্রাবল্যে নির্ভরশীল। বেসরকারী গোয়েন্দা বুদ্ধির জাল নিক্ষেপে গভীর জলের মাছকে বন্দী করেন। গোয়েন্দা কাহিনীকে যদি পঞ্চসন্ধি নাটক বলি তাহলে পুলিশ আসবে পঞ্চমাঙ্কের শেষ দৃশ্যে। ততক্ষণ পর্যন্ত বেসরকারী গোয়েন্দা একা। এই একক মানুষটির সত্যান্বেষণ পদ্ধতি এক এক জনের এক এক রকম। হোম্‌স্‌ জেনেছিলেন বস্তু ও পাত্রকে ঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। পরশুরামের 'নীলতারা' গল্পে রাখাল মুস্তফি হোমস এবং ওয়াটসনের সামনে যে ভারতীয় কবিরাজসম্মত অবরোহ পদ্ধতির পরিচয় দিয়েছিলেন, তা অতি-হোমসীয় হলেও এই পদ্ধতির কার্যকরতার প্রমাণ। পোয়ারো ভিন্ন পথে হাঁটেন। তিনি সম্ভাব্যতার সূত্র খোঁজেন চরিত্র বিশ্লেষণ করে—তিনি জানেন খুনেরও একটা চরিত্র থাকে। শুধু তাই নয়, নিহত ব্যক্তির চরিত্রগহনটি আরো জরুরী। আগাথা ক্রিস্টি এই অর্থে আধুনিক তদন্ত কাহিনী লেখক যে, তাঁর গল্পে জটিল সমাজ জীবন, যা কালের হাতে দুই মহাযুদ্ধের মাঝে ও পরে নানা ভাবে স্পৃষ্ট হয়েছে, সেই সমাজকে চিনে নেওয়া যায়। ইংরাজের পল্লীসমাজকে চিনিয়ে দেবার জন্য রয়েছেন সেই প্রবীনা কুমারী মিস মারপল—নাগরিক পোয়ারো আর

গ্রামীণ মারপল যেন পরস্পরের পরিপূরক। আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না 'ফোরফিফটি ফ্রম্ প্যাডিংটন'-এর ডিনোমা অংশটি।

২

সত্যজিৎ রায়ের প্রদোষ চন্দ্র মিত্র, লালমোহন বাবুর ভাষায় মিস্টার মিত্তির, এবং তাঁরই প্রদত্ত আখ্যায় ভূষিত এ.বি.সি.ডি—অর্থাৎ এশিয়াজ ব্রাইটেস্ট ক্রাইম ডিটেক্টর আর তপেশ বা তোপসের ভাষায় ফেলুদা বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় তদন্তকারী। ছোটদের জন্য লেখা 'ফেলুদা কাহিনী' 'দেশ' শারদীয় সংখ্যায় বয়স্ক পাঠকদের জন্য লেখা উপন্যাস ও গল্পমালার সংকলনে সর্বাগ্রে স্থান পেয়েছে। আরো বলার কথা, ছেলেমেয়েরা এবং বুড়োরা সবচেয়ে আগে কাড়াকাড়ি করে পড়েছে 'ফেলুদা-কাহিনী'। বাংলা অপরাধ তদন্তমূলক সাহিত্যের পরম্পরাটি এখানে একবারের জন্য স্মরণীয়। সেই প্রথম যুগের অরিন্দম দেবেন্দ্রবিজয় প্রথম জনপ্রিয় তদন্তকারী। বঙ্কিমী যুগের ছায়াবহ সেইসব রোমান্স-রসঘন গোয়েন্দা কাহিনী। আজও ভুলতে পরি না নারী সৌন্দর্যের অপরূপা প্রতিমা জুলেখাকে—অপরাধিনী জুলেখা, অথচ দেবেন্দ্রবিজয়ের প্রতি তার গোপন পক্ষপাত। সন্দেহ হয় পাঁচকড়িবাবু যেন শেষপর্যন্ত দোলাচলতায় ভুগেছেন—স্বকীয় পথে তাঁর সিদ্ধিকেই তিনি সর্বস্ব জ্ঞান করবেন, না কি বঙ্কিমী পথে একটু হেঁটে দেখবেন! বাংলা গোয়েন্দা গল্পকে যথার্থ প্রতিষ্ঠা দিলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—তাঁর 'ব্যোমকেশ-কাহিনীর' ভিত্তিতে। চরিত্র পরিকল্পনায়, প্লটগঠনে, কথন শৈলীতে শরদিন্দুর 'ব্যোমকেশ-কাহিনী' প্রথাসিদ্ধতার বাইরে চলে গেল। এ কাহিনী পড়তে পড়তে একবারও মনে হবে না বিদেশী গল্পের দেশী রূপান্তর পড়ছি। এক আধটি গল্পে কখনো সখনো বাইরের ছায়া পড়েছে বটে, যেমন বলতে পারি আগাথা ক্রিস্টির 'মার্ডার ইন দি মিউজ' গল্পের ঘটনাসংস্থানের সঙ্গে শরদিন্দুর 'আদিম রিপু' গল্পের সাদৃশ্যের কথা। গাইফক্স নাইট ও কালী পূজার রাতের বাজিপুড়ানোর ধুমধারাক্কাকে খুনী সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করেছে দু'জায়গাতেই। আবার শরদিন্দুর 'বহ্নিপতঙ্গ' গল্পের রহস্য উদ্‌ঘাটনের অন্তিম মুহূর্তের মনস্তাত্ত্বিক প্যাঁচ মনে করিয়ে দেয় আগাথা ক্রিস্টির 'ফাইভ লিট্‌ল পিগস্' গল্পের শেষকালের চমকপ্রদ উদ্‌ঘাটনকে। কিন্তু এ সব তুচ্ছ সাদৃশ্যকে পেরিয়ে যায় ব্যোমকেশের বাঙালিয়ানা, তার সত্যান্বেষণ পদ্ধতির দেশীয় কলা প্রকরণ। একেবারেই ধুতি-পাঞ্জাবি পরা গোয়েন্দা। কোনো রোমহর্ষক সংঘর্ষের মধ্যে সে যায় না। যে বৌদ্ধিক কসরত খাঁটি ডিটেকশনের আনন্দকে অম্লান রাখে ব্যোমকেশ বক্সির কাজেকর্মে তাকে পাওয়া যায় বলে সে আমাদের এত প্রিয়।

ব্যোমকেশ বিদায় নেবার পর বাঙালী গোয়েন্দার শূন্য আসনটি শূন্যই থেকে যেত, যদি না এ আসরে দেখা দিতেন ফেলু মিত্তির। ফেলু মিত্তিরের পাশে দাঁড় করানো যায় এমন বাঙালী গোয়েন্দা একজনই ব্যোমকেশ পরবর্তী যুগে আমরা পেয়েছি—প্রেমেন্দ্র মিত্রের পরাশর। কিন্তু পরাশরকে প্রেমেন্দ্র মিত্র কৌতুকাবহ করে তুলেছেন বলেই তার কবিতাবাতিক ও আর্ট অফ ডিটেকশনকে মিলিয়ে তিনি বড় রকমের সার্থকতার প্রমাণ দিতে পারলেন না। আরেকটু স্পষ্ট করে বলি, প্রেমেন্দ্রের ঘনাদা যেমন সমস্ত অসম্ভাব্যতার মাঝেও চরিত্র বিচারে বিশ্বাস্য হয়ে উঠল পরাশর তা হয় নি। পরাশরকে গোয়েন্দা চরিত্রের স্থূল দ্বিমাত্রিকতা পার করে দেবার জন্য তার ব্যর্থ কবিত্বকে আবাহন করা হয়েছে। কিন্তু প্রমাণিত হয় নি তার অনিবার্যতা। এমন সময়ে বাংলা পাঠকেরা দেখা পেলেন ফেলুদার। যখন প্রথম প্রকাশিত হল 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি' (১৯৬৫-র শেষের দিকে) আমরা একমুহূর্তে ফেলুদাকে আমাদের লোক বলে চিনে নিলাম। এই প্রথম গোয়েন্দা গল্পটি বেরিয়ে ছিল 'সন্দেশ'-এ। কিন্তু যাদের জন্য এ গল্পটি লেখা তারা যেমন মুগ্ধ হল ফেলুদা ও তোপসের সম্পর্কের কৌতুকে মাধুর্যে, আমরা বড়োরা তৃপ্তি পেলাম এ কারণে যে ফেলুদার ডিটেকশন পদ্ধতির মধ্যে কোনো হামবড়ামি নেই। সবটাই যেন একটা ধাঁধা—এবং ফেলুদা সহজ অকাট্য বুদ্ধিতে সেই ধাঁধাটির জট খুললেন। আরো দুটি ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলাম। সত্যজিৎবাবুর বেশ কিছু সংখ্যক গল্পে ছোটবেলার স্কুল জীবনের জের ব্যবহৃত হয়েছে—যেমন ধরা যায় 'চিলেকোঠা' গল্পটি—এই গোয়েন্দা গল্পে তার প্রথম সূচনা। এই প্রথম গোয়েন্দা গল্পটি প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলার আছে। তিনকড়িবাবু এই গল্পের একটি চরিত্র। তিনকড়িবাবু আর রাজেন-বাবুর সম্পর্কের মধ্যেই রয়েছে এ গল্পের রহস্যের হদিস। কিন্তু তিনকড়িবাবু ছিলেন 'গুপ্তচর' ছদ্মনামে রহস্য কাহিনীর বিখ্যাত লেখক। সত্যজিৎ রায়ের তিনকড়ি চরিত্র এমন কিছু নয। কিন্তু রহস্য কাহিনীর বাজারে বিক্রয়ধন্য লাল-মোহন গাঙ্গুলী বা 'জটায়ু' পূর্ণ চরিত্র হিসাবে যে পরে দেখা দিল, তার বীজ রয়েছে তিনকড়ি চরিত্রে। লালমোহনের কথায় আমরা পরে আসছি। এখন ফেলুদার কথা।

ফেলুদার জন্ম ১৯৩৮-এ। সে যখন অপরাধ উদ্ঘাটন শুরু করেছে অর্থাৎ ১৯৬৫-তে তার বয়স সাতাশ। আমি জ্যোতিষ মানি না। সম্ভবত ফেলু মিত্তিরও মানত না। তবু জেনে রাখা ভাল কুম্ভ রাশিতে তার জন্ম। সে নিজেই এ খবর আমাদের সহসা দিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল গোয়েন্দার পক্ষে কুম্ভরাশি ভাল কি না। আমার এবিষয়ে সামান্য জ্ঞান অনুসারে বলছি ফেলুর পক্ষে কুম্ভ রাশি মানানসই নয়—সিংহ, তুলা বা বৃশ্চিক হলেই তাকে মানাতো ভাল। তবে ফেলুর অক্ষয় কৌতুক বোধে 'কুম্ভ' কথাটি আলাদা তাৎপর্য পায়। ফেলু কথা কম বলে, অনেক কিছু তার মাথায় সে ধরে রাখে। সে পূর্ণ কুম্ভ। বৃথা টন্‌টন্ করে না।

ধারালো বাক্যবিন্যাসের ফলে সাহিত্যিক লালমোহনের এই অব্যর্থ অভিধা। দ্বিতীয় ব্যাপার হল কলকাতায় ফিলু মিত্তিরের জমাটি কেসের অভাব হয় নি—যেমন 'গোরস্থানে সাবধান', তথাপি ফেলু মিত্তির খোলতাই হয় অবাঙ্গালী পটভূমিকায়—রাজস্থান (সোনারকেল্লা), সিমলা (বাক্সরহস্য), কাশী (জয়বাবা ফেলুনাথ), নেপাল (যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে), সিকিম (গ্যাংটকে গণ্ডগোল)। এমন কি লণ্ডন ও হংকং পর্যন্ত তার কর্মক্ষেত্র বিস্তারিত হয়েছে। বাগদাদ, মেসপটেমিয়া অথবা ক্যারিবিয়ান অঞ্চল যেমন আগাথা ক্রিস্টির রচনায় একটা আলাদা স্বাদ আনে—অথচ তা ভ্রমণকারীর গাইডবুক হযে ওঠে না, তেমনি ফেলু মিত্তিরের কীর্তিকাহিনী ট্রাভেলোগযুক্ত রোমাঞ্চ কাহিনী হয় নি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আছে এক চির-চঞ্চল কিশোর। দূর তাকে টানে। সেই প্রাণবন্ত সুদূরাভিযানের শাশ্বত বাসনায় ফেলু মিত্তির কিশোর ও বযস্ক সকলের বন্ধু।

৩

লালমোহন বা জটায়ু ফেলু মিত্তিরের সঙ্গে যোগ দিয়েছে 'সোনারকেল্লা'য়। তারপব থেকে সে হয়ে উঠেছে অপরিহার্য—অনিবার্যও বটে। তার সম্বন্ধে ফেলু মিত্তিরের উক্তিটি এখানে স্মরণীয়—'আপনি-আমি তো পরস্পরের সম্পূরক। সোনায় সোহাগা। অ্যারালডাইট দিয়ে আমার সঙ্গে সেঁটে রয়েছেন আপনি সেই সোনার-কেল্লার সময় থেকেই। আমাকে ছাড়া আপনার অস্তিত্বই নেই—অ্যাণ্ড, ভাইসি ভারসা।' লালমোহনবাবুর মতো চরিত্র কোনো গোয়েন্দা কাহিনীতে কখনো আসে নি। আগাথা ক্রিস্টির পোয়ারো কাহিনীতে কখনো কখনো পোয়ারোর এক লেখিকা বান্ধবীর চরিত্রের দেখা পাই—আরিয়াডনে অলিভার। তিনিও হত্যা-রহস্যের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী, তিনিও উদ্ভট কল্পনায় বিহার করতে ভালবাসেন। তাঁর ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের কিছু কিছু লক্ষণ—যেমন কীভাবে কেশবিন্যাস করবেন তা নিয়ে মতিস্থিরতার অভাব খুবই উপভোগ্য। কিন্তু লালমোহন চরিত্র-কল্পনা এ সব থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যে মুহূর্ত থেকে লালমোহনবাবু ফেলু মিত্তির-তোপশে কাহিনীতে যোগ দিলেন সেই মুহূর্তেই একটি বৃত্ত পূর্ণতা পেল। সেটাই প্রসিদ্ধ ত্রিরত্ন—থ্রিমাস্কেটিয়াস—বা প্রদোষ-লালমোহন-তপেশ ত্রিমূর্তির বৃত্ত। ফেলু কেন লালমোহনকে ভালবাসত এটা একটা ভাবার কথা বটে। বোধহয় ফেলু যা, লালমোহনবাবু সম্পূর্ণ তার বিপরীত বলেই এই বিচিত্র সখ্যরস জমে উঠেছিল। কিন্তু আসল কথাটা হল লালমোহনবাবু মনে মনে যা হতে চান ফেলু মিত্তির বাস্তবে তাই। লালমোহনবাবুর সৃষ্ট গোয়েন্দা চরিত্র যে শেষ পর্যন্ত এক স্ট্রেঞ্জ ফিকশন-চরিত্র, ফেলু যে তার থেকেও স্ট্রেঞ্জার—এবং বাস্তব চরিত্র, এই বোধ লালমোহন-বাবুর ষোল আনা। লালমোহনবাবুর চরিত্রটি সাম্প্রতিক বইয়ের বাজার থেকে

তুলে নেওয়া হয়েছে। তাঁর বই বাজারে পড়তে পায় না। মাসে মাসে পুনর্মুদ্রণ হয়—'সেলিং লাইক হট কচুরিজ'। তাতে অনেক ভুলভাল থাকে। কিন্তু তাতে জটায়ু টসকান না—পরের সংস্করণে শুধরে দেওয়া যাবে। অদ্ভুত অদ্ভুত যত নামকরণ তাঁর বইয়ের 'হণ্ডুরাসে হাহাকার', 'অতলান্তিকে আতঙ্ক', 'মাঞ্চুরিয়ায় রোমাঞ্চ'—এই সব। লক্ষণীয় দুটি ব্যাপার, ফেলু মিত্তিরের স্রষ্টার বইও বাজারে পডতে পায় না। এবং তারও বইয়ের নামকরণে অনুপ্রাসের দিকে একটা ঝোঁক থাকে। লালমোহনবাবুর বয়স কত হবে? তাঁর কথা থেকেই বোঝা যায় তিনি ফেলুর থেকে বয়সে একটু বড হবেন। সাড়ে তিন বছরের বড। তাই তিনি ফেলুকে ঘডি উপহার দেবার সময় আশীর্বাদ করেছিলেন। সমবয়সী হলে এতদিন কি দুজনে 'আপনি' সম্পর্কে আটকে থাকতেন! দূরত্ববাচক 'মিস্টার মিত্তির' সম্বোধনটিও বয়সের একটু ব্যবধানের দিকেই আঙুল দেখায়। লালমোহনবাবু তোপশেকে কখনো 'তোপশে' বলে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেন নি। সব সময় বলেছেন 'ভাই তপশে'। এটাও লক্ষ্য করার মতো। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। বিবাহাদি করেন নি। তিন ভাই ছিলেন তাঁর বাবারা। তাঁর বাবা মেজ ছেলে। ছোটকাকা উনত্রিশ সালে সন্ত্রাসবাদীদের দলে যোগ দিয়েছিলেন। খুলনার পুলিশ কমিশনারকে গুলি করে তিনি অ্যাবস্কণ্ড করেন। মনে হয় সাহস ও রোমাঞ্চ অভিযানেব প্রতি শ্রদ্ধা এখান থেকে লালমোহন বংশসূত্রে পেয়ে থাকবেন। গোপন অস্ত্রের প্রতি অনুরক্তিও হয়তো সেখান থেকেই পেয়েছেন ভদ্রলোক। নেপালী কুকরি, ব্যুমেরাং, স্মোকবম্ব। সব কয়েকটি অস্ত্র ফেলু মিত্তিবের নানা অভিযানে শেষ অধ্যায়ে মোক্ষম কাজে লাগে। লালমোহনবাবু সম্বন্ধে আরেকটা কথা বলার আছে। হোম্‌স্‌-ওয়াটসন, পোয়ারো-হেস্টিংও, ব্যোমকেশ-অজিত সম্পর্কের সঙ্গে ফেলু-লালমোহন সম্পর্কের গুরুত্ব এক তৌলে মাপা সমীচীন হবে না। প্রথম কথা, লালমোহনবাবু ফেলু মিত্তির কাহিনীর কথক বা লিপিকার নন। তিনি মোটেই অজিত নন, ওয়াটসন নন। ফেলুদা কাহিনীর কথক বা লিপিকার শ্রীমান তপেশ। তাহলে লালমোহনবাবু কি ফেলু মিত্তিরের সহকারী? তাও তো তিনি নন। 'বাদশাহী আংটি'তে লালমোহন আসেন নি। প্লট তো কিছু কম জমে নি। 'সোনারকেল্লা'-য় তিনি এলেন, এবং তারপর থেকে তাঁকে বাদ দিয়ে ফেলু কাহিনী ভাবাই যায় না। ফেলুদার মতো আত্মসচেতন ও বুঝিবা আত্মপ্রত্যয়ী মানুষকেও লালমোহনবাবুকে বলতে হয়েছে, আপনি আমার সম্পূরক। কেন? অবশ্যই কারণ আছে।

ফেলু মিত্তির ও লালমোহনবাবু দুজনেই খাঁটি বাঙ্গালী। কিন্তু দুজনে দুই রকম। দৈর্ঘ্যে বাঙ্গালীর যা হওয়া উচিত ফেলু মিত্তির তাই। দৈর্ঘ্যে বাঙ্গালী যা সচরাচর হয়ে থাকে, লালমোহনবাবু তাই। ফেলু মিত্তির গণিতসিদ্ধ, লালমোহন কল্পনাজীবী। ফেলু মিত্তিরের রোমাঞ্চ হয় না। লালমোহন সহজেই রোমাঞ্চিত।

ছ'ফুট লম্বা, বিরল দৈর্ঘ্যের বাঙ্গালী সে। কিন্তু অলস দেহ ক্লিষ্টগতি বহুরে বড বাঙ্গালী সন্তান সে নয়। নির্মেদ, ব্যায়াম ও আসনপোক্ত, পেটা চেহারা তার। আরো একটা জায়গায় সাধারণ বাঙ্গালীর সঙ্গে তার অমিল। সে বাগাডম্বর ভালবাসে না। কমকথায় সে অনেক কথা বলতে পারে। অথচ সেই কম-কথাতেই সে বাক্‌পতি। 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি' গল্পে সে যখন বলে—'কিউরিও সম্বন্ধে একটা কিউরিয়সিটি বোধ করছি', অথবা 'বাদশাহী আংটি' গল্পে বনবিহারী-বাবুর বাড়ির দিক থেকে একটা বিকট চিৎকার শুনে ফেলুদা একটা হাই তুলে বলল—'হাইনা'—তখন আমরা ফেলুদার স্রষ্টার বংশ পরম্পরাকে চিনতে ভুল করি না। উপেন্দ্রকিশোরের নাতি এবং সুকুমার রায়ের ছেলেই পারেন তাঁর এবং এ যুগের সর্বাধিক জনপ্রিয় নায়ককে এভাবে বাণীসিদ্ধ করে তুলতে। ফেলু মিত্তির চকিতে লক্ষ্যভেদে সিদ্ধহস্ত, ফেলু শারীরিক তৎপরতায় সাধারণ বাঙ্গালীকে হার মানায়, অন্যদিকে বাঙ্গালীর খাদ্য খুঁতখুঁতি তার নেই। যে কোন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সে পারে। কিন্তু সে খাঁটি বাঙ্গালী। তার সখ্যে আর তার স্নেহে তার সেই বাঙ্গালিয়ানাকে বোঝা যায়। তাই লালমোহনবাবুর সঙ্গে সকৌতুক সম্পর্কটিকে সে লালন করে। শ্রীমান তপেশকে সে কখনো বড রকমের আঁচ লাগতে দেয় না। এই দুটো সম্পর্কের মাত্রায় আমরা উপলব্ধি করি তার মানবিক সরসতা। তার বাঙ্গালিয়ানাকে আমরা উপভোগ করি আরেক জায়গাতেও—সে যদিও যে কোন নতুন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে, যে কোনো খাদ্য সম্বন্ধেই যদিও সে উদার, তথাপি যথার্থ খাদ্যরুচির বিচারে সে খাঁটি বাঙ্গালী। ভাত, মুগের ডাল, মাছের ঝাল, চাটনি, দই এবং সব শেষে মিঠে পানে তার পক্ষপাত। অবশ্য তার সব থেকে প্রিয় খাবার নতুন গুডের সন্দেশ আর মিহিদানা। ফেলুদা কলকাতার ছেলে। কলকাতার খাস্তা কচুরি, ডালমুট তার প্রিয় বৈকালী। অতিথি আপ্যায়নে চা কফি অপেক্ষা সাবেক সরবতে সন্দেশে তার আগ্রহ বেশী। ফেলু মিত্তির প্রথম দিকে চাকরি একটা জুটিয়েছিল বটে—কিন্তু সে কিছুদিনের জন্য। তারপর সে চাকরি ছেড়ে দেয়। টাকা পয়সা সে খুব একটা করে উঠতে পেরেছে বলে মনে হয় না। কেননা অনেক সময় সে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাডিয়েছে। 'এবার কাণ্ড কেদারনাথে'-তে দেখা গেল যিনি তাকে নিয়োগ করেছিলেন, তিনি তাঁর নিজস্ব কারণে সে নিয়োগ-পত্র প্রত্যাহার করে নিলেন। কিন্তু ফেলু মিত্তির একবার যখন রহস্যের গন্ধ পেয়েছে তখন সে অদম্য। নিয়োগ-পত্র অথবা প্রত্যাহার-পত্র কিছুরই সে আর অপেক্ষা করে না। এখানেই প্রমাণ পেলাম টাকা পয়সা সে বিশেষ করে উঠতে পারে নি। হরিদ্বার গেল সে-লালমোহন-তপসে থ্রি-টায়ারে। কেননা তখন সে নিজের পয়সায় যাচ্ছে। গাডি সে কেনে নি। লালমোহনবাবুর সবুজ অ্যামবাসডার গাড়িতেই তারা চলে গেল। বাড়ি সম্বন্ধেও সে নিস্পৃহ। তার শ্রদ্ধার্হ ব্যক্তিদের প্রধানতম সিধু

জ্যাঠা তারই শ্রদ্ধা পাবার উপযুক্ত—জ্ঞানব্রতী, ভারত-প্রেমিক এবং বহিঃস্বীকৃতি সম্বন্ধে উদাসীন। এই তীক্ষ্ণধী যুবক কথার জট খুলতে খুবই ওস্তাদ। বলতে কি অপরাধের জট খুলতে তার যে দক্ষতা তার চেয়েও অনেক বেশী উপভোগ্য তার কথার প্যাঁচ খুলে ফেলার দক্ষতা। 'বাদশাহী আংটি'-তে 'স্পাই' শব্দটি যে 'স্পাইডার' শব্দের প্রথমার্ধ এই উন্মোচনের মধ্যেই ছিল অপরাধীর হদিস এবং ঠিকানা। রয়েল বেঙ্গল রহস্যের বিখ্যাত ধাঁধা—যা প্রায় রবীন্দ্রনাথের গুপ্তধনের ধাঁধাকে স্মরণ করিয়ে দেয়—সে ধাঁধার জট খুলতে ফেলু মিত্তিরের ক্ষুরধার বুদ্ধির শৈল্পিক কসরৎ পাঠককে যুগপৎ বিস্মিত ও পুলকিত করে। তার নিজের নিভৃত নোটবইখানির গ্রীক হরফে ইংরাজি শব্দ সমাবেশ তার বাণী কৌতুকেরই আরেক নিদর্শন। থ্রি নাইন থ্রি নাইন এইট টু জিরো যে পাখীর মুখে দাঁড়িয়ে গেল ত্রিন'নী ত্রিনয়নী একটু জিরো। এইসব উপভোগ্য উদ্ভাবনার জন্যই ফেলু মিত্তিরের গোয়েন্দাকাহিনী একটা আলাদা মাত্রা পেয়ে যায়। এই ধারার সব সেরা লেখা 'ছিন্নমস্তার অভিশাপ'। 'কৈলাস' যে হতে পারে 'হোয়্যার ইজ দি ডেড বডি'— 'কী পাইনি কী খুঁজছি'-র 'কী' যে ইংরাজি 'Key' এবং বাঁদর শব্দের অর্থভেদে যখন বেরিয়ে আসে ঐতিহাসিক গিবন, তখন কিশোর পাঠকরা তো বটেই, আমরা বয়স্করাও সাবাস না বলে পারি না। সত্যজিৎ রায়ের সমৃদ্ধ শৈশবের ইতিবৃত্তে শব্দ নিয়ে নানা খেলার স্মৃতি জোরালো। আর সব থেকে জোরালো ম্যাজিকের স্মৃতি। লক্ষণীয় তাঁর প্রায় গোয়েন্দা কাহিনীতেই আর্ট অফ ডিটেকশন ম্যাজিক ধরে ফেলার কলাকৌশলে চমকপ্রদ হয়ে উঠেছে। হত্যা বা ক্রাইমের গ্রিমনেশ বা রক্তাক্ত ভয়াল বাতাবরণে তাঁর বিমুখতার কারণ সহজে অনুমেয়। যে কোন ভূমিকাতেই সত্যজিৎ মহাপ্রাণ শিল্পী। তা সে ফিল্মেই হোক, অথবা কাগজে কলমেই হোক। ছোটদের জন্য লেখা গল্পের ক্ষেত্রেও তিনি ভুলে যেতে পারেন না তিনি কিশোরদের জন্য গল্প লিখছেন—খুনের ভয়াবহ পরিবেশ গল্পের মধ্যে ভারি হয়ে থাকুক, এ তিনি অবশ্যই চাইবেন না। তাই তাঁর গল্পে স্ট্রাকচারের মেজাজে তিনি প্রায়ই একটা কোনো ম্যাজিক এবং ধাঁধার সাসপেন্স নিয়ে আসেন। আগাথা ক্রিস্টির অনেক গল্পে যেমন লোক কবিতার বা বালকভোগ্য ছড়ার কৌশলী প্রয়োগ দেখা যায়, শরদিন্দুর গল্পের নামকরণে যেমন কালিদাস নামাঙ্কিত লোকপ্রবাদের ব্যবহার স্মরণ করা যায়, সত্যজিতের 'ফেলুদা কাহিনী'তে সে জাতীয় প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু একটি পরিশীলিত মনের বৌদ্ধিক পরিবেশের মগজের খেলার মজা সেখানে অবশ্য প্রাপ্য। এই প্রাপ্যটুকুর জন্য ছোটরা এবং বড়রা কেউই আমরা ফেলু মিত্তিরকে ছাড়তে চাই না। এর সঙ্গে আর দুটো ব্যাপার যুক্ত হয়েছে—যেটা অন্য কোন গোয়েন্দার মধ্যে আমরা পাই না যে তা নয়—কিন্তু এই মাত্রায় পাই না। এই ব্যাপারটাকে বলা যায় জটায়ুর ভাষায় ফেলুদার 'মজারু সজারু' দিক। এটা ফেলু মিত্তিরের মুডের ব্যাপার, ব্যঙ্গ ও পরিহাসের উপভোগ্যতা ও তীক্ষ্ণতাকে মিলিয়ে তার সংক্ষিপ্ত ও

সব পাথর ডিঙিয়ে পাশ কাটিয়ে যুগ যুগ ধরে সেগুলোকে মোলায়েম করে, পালিশ করে ব্যস্তবাগীশ ভেডা নদী তড়িঘড়ি ছুটে চলেছে দামোদরে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে। এই ঝাঁপের জায়গাই হল রাজরাপ্পা।'

তখন আমরা তার বাক্যের চালে চলতি নদীর ছুটে যাবার ভঙ্গি ও ছাঁদকে চোখের সামনে দেখতে পাই। তুলনীয় আরেকটি বর্ণনা :

'হংকং-এ ল্যাণ্ডিং করতে হলে পাইলটের যথেষ্ট কেরামতি দরকার হয় সেটা আগেই শুনেছি। তিনদিকে সমুদ্রের মাঝখানে এক চিলতে ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপ—হিশাব একটু গণ্ডগোল হলে ঝপাং, আর বেশি গণ্ডগোল হলে সামনের পাহাড়ের সঙ্গে দড়াম।'

দুটিমাত্র ধ্বন্যাত্মক শব্দের সহযোগে একটা বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিকে এভাবে চাক্ষুষ করিয়ে দিতে পারে বলেই তোপসের বলা কাহিনী আমাদের এত প্রিয়। সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ্য তার অনুচ্চ কণ্ঠ, নির্লিপ্ত হিউমার। 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি'তে ফাইট ডাই-রেক্টর আপ্পারাওয়ের গুহার মধ্যে সত্যি সত্যি লাশ দেখে অজ্ঞান হয়ে গেল—একটা সংক্ষিপ্ত বাক্যে এমন অতর্কিত হাসির আয়োজন যথার্থ হাস্যরসিকের কাজ।

তপেশ অনাড়ম্বর এবং বুদ্ধিমান। সে এক স্বাতন্ত্র্য দীপিত শান্ত অথচ সতেজ কিশোর। জ্ঞান দাতাদের 'ঘ্যানঘ্যানানি' সে পছন্দ করে না। মাইকেল এঞ্জেলোর সঙ্গে 'ছেলো'-মিল দেওয়ায় সে খুশি হয় না। শারীরিক ও মানসিক তৎপরতায় সে বেতের মতো সহিষ্ণু এবং তীরের মতো লক্ষ্যভেদী। কিন্তু তার সব থেকে বড় গুণ সে নিজের বিষয়ে প্রায় মূক। সে কোন স্কুলের ছাত্র, কারা তার বন্ধু-বান্ধব, তার ইংরাজি জ্ঞান মোক্ষম, সে কি ইংরাজি মাধ্যম স্কুলের ছাত্র? —এ সব ব্যাপারে সে প্রায় নীরব। জটায়ুর এথিনিয়ম স্কুলের বাংলার শিক্ষক কবি বৈকুণ্ঠবাবুর কথা সে আমাদের বলেছে বটে, কিন্তু নিজের স্কুলের কোনো মাস্টার মশায়ের কথা সে একবারও বলে নি। প্রশংসনীয় তার নিজস্ব মুখরতা বৈমুখ্য। ফেলু মিত্তির যখন লালমোহনকে পরিহাস সকৌতুক কথার খোঁচাখুঁচি দিয়েছেন—তখন তপেশ একবারের জন্যও হেসে ফেলে নি। গম্ভীর মুখে তা উপভোগ করেছে। তার রসটুকু যে সে উপলব্ধি করেছে, সেটা বোঝা গেছে তার লেখায়। তাকে বাদ দিয়ে—তার প্রেক্ষক ভূমিকার বাইরে নিয়ে গেলে সত্যজিৎবাবু হয়তো তথাকথিত বয়স্ক পাঠ্য ক্রাইম স্টোরি লিখতে পারতেন। আমাকে লেখা একটি চিঠিতে (২২/১/৮৪) শ্রীরায় বলেছিলেন—

'একটা ব্যক্তিগত সমস্যার কথা বলে চিঠি শেষ করি। শঙ্কু ও ফেলুদা দুজনকে নিয়েই গভীর সমস্যা দেখা দিয়েছে। Science fiction বা fantasy গল্পের প্রধান উপাদান বা Staples—তা সবই শঙ্কুর গল্পে ব্যবহার করে ফেলেছি। সুতরাং ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা আছে। ফেলুদার ব্যাপারেও একই কথা। কিশোর-দের উপযোগী গোয়েন্দা কাহিনী লেখার limitation অনেক। সেখানে

অধিকাংশ শ্রেণীর ক্রাইমই adult বলে বাদ দিতে হয়। শরদিন্দুবাবুকে এ সমস্যায় পড়তে হয়নি, কিন্তু আমাকে হচ্ছে। যদিও এরা সকলেই আমার এত কাছের লোক যে এদের দূরে সরিয়ে ফেলার কথা ভাবতে ভাল লাগে না।'

আমরাও তোপশেকে বাদ দিয়ে ফেলুদা কাহিনীর কথা ভাবতে পারি না। তোপসে প্রেক্ষাপটের বাইরে চলে গেলে ন্যারেশন কত নিস্তেজ হয়ে যায় তার প্রমাণ 'গোলাপী মুক্তা রহস্য'-এর চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 'জয়চাঁদ বড়ালের কথা' তোপশের শোনা কথা। ফেলুদা কাহিনীর সমস্ত লবণ, সমস্ত কৌতুক, সমস্ত টান অবশ্যই তিনটে খিলানের উপর দাঁড়িয়ে আছে—ফেলু মিত্তির, জটায়ু এবং তপেশ। সেই স্ট্রাক্চারের একটা অংশও যদি বাদ দেওয়া যায় তা হলে সেটা আর যাই হোক, ফেলু মিত্তিরের গল্প থাকবে না। বাংলা গোয়েন্দা গল্পের প্রচলিত ধারায় সম্পূর্ণ নতুন একটা স্রোত ফেলুদা কাহিনী। তপেশের বাকশৈলী সেই স্রোতে যে বেগ, যে নাটকীয়তা আছে, তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশক। কত কম কথায় কত বেশি কথা বলা যায়, ফেনায়িত নিরর্থক বাক্যধারা যে সদাই পরিহার্য, এ প্রসঙ্গে উজ্জ্বল প্রমাণ এতদিন ছিলেন অবিস্মরণীয় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—উজ্জ্বলতম প্রমাণ এবার থেকে ফেলুদা কাহিনী। তোপসে সেই কাহিনীর কথক।

প্রত্যেকবার আশ্বিন মাস আসবে। আমরা আর নতুন ফেলুদা কাহিনী তোপসের কাছ থেকে শুনতে পাবো না। আমাদের আশ্বিন অনেকখানি বিরস হয়ে গেল।

ফেলু মিত্তির অ্যাডভেঞ্চারের নায়ক—লালমোহন অ্যাডভেঞ্চারের উপভোক্তা। ফেলুবাবু কথা কম বলেন—সেই নোটবইটা নিয়ে মাঝে মাঝেই তার নির্জনবাস। লালমোহন কথা একটু বেশী বলেন। সাধারণ বাঙ্গালী নাম পেটাতে পারলে বড় খুশি। ফেলুদা অসাধারণ বাঙ্গালী বলে একটু জনতাবিমুখ। ফেলু মিত্তির উইট নির্ভর হাস্যরসের স্রষ্টা। লালমোহন চরিত্রটাই হাস্যরসাত্মক—পরিস্থিতিতে পরিস্থিতিতে তার নতুন নতুন বিকাশ। লালমোহনকে দিয়ে সকৌতুক স্নিগ্ধ ভঙ্গিতে লেখক দু'একটা কথা বলে নিয়েছেন। একটা হল বাজারবিজয়ী বেস্ট সেলার চরিত্র সম্বন্ধে কটাক্ষ। এ জাতীয় লেখক হিসাবে লালমোহন সদাই গদগদ। লেখায় প্রায় ভুল থাকে। ফেলু মিত্তির শুধরে দেন। 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' গল্পে লালমোহনের বোম্বে মার্কা গল্পের খসড়া ফেলু করে দিয়েছিল। সে খসড়ায় ফেলু মিত্তিরকে যত চেনা যায়, ফেলু মিত্তিরের স্রষ্টাকে তার চেয়ে বেশী চেনা যায়। বিনীত লালমোহন যখন গল্পটিকে 'আমাদের গল্প' বলে অভিহিত করতে চান, তখন ফেলু মিত্তির বাধা দেয়—শেক্সপীয়রের হ্যামলেট তো নানা জনের উপাদানের কাছে ঋণী, তা বলে শেক্সপীয়র কি বলবেন, 'আমাদের হ্যামলেট'। আটপৌরে মেজাজে লালমোহন সতত সরস। মেজাজের দিক থেকে ফেলু মিত্তির সংযত, সুগম্ভীর। নিজের খ্যাতিকে তিনি ভালই জানেন—কিন্তু লালমোহনবাবুর মতো তিনি খ্যাতি পুলকিত মানুষ নন। সত্যজিৎ রায়ের ফেলু কাহিনীর প্রধান কৃতিত্ব এখানে যে, গোয়েন্দা কাহিনীর দ্বিতীয় চরিত্রের বিবর্ণতা থেকে তিনি লাল-মোহনকে সম্পূর্ণ মুক্তি দিয়েছেন। যেটুকু মূল্যেই তিনি মূল্যবান হয়ে থাকুন না কেন, সেটুকু তাঁর নিজের মূল্য। বহু বিখ্যাত উক্তি তিনি উচ্চারণ করেছেন তাদের মধ্যে কয়েকটি অবিস্মরণীয়—(ক) 'তাহলে মানে হল গিয়ে আপনার বেঙ্গলে, আর বোম্বেতে হচ্ছে মানি?' (খ) 'আরে মশাই, আমি তো বলেইছি আমার কল্পনাশক্তিটা সাধারণ লোকের চেয়ে একটু বেশি। আপনারা বলছেন বাঘ, আর আমি দেখছি একটা লেলিহান অগ্নিশিখা, আর তার মধ্যে একটা পৈশাচিক দানব দাঁত খিঁচুচ্ছে, আর সেই সঙ্গে কর্ণপটাহ বিদীর্ণ করা এক হুঙ্কার ছেড়ে একটা জেট প্লেন টেক অফ করছে। এতেও যদি সংজ্ঞা না হারাই ত' সংজ্ঞা জিনিসটা রয়েছে কী করতে'? আরো বিখ্যাত লালমোহনবাবুর বাবু মার্কা ইংরাজি—'চিকেন হ্যাড ইয়েসটারডে, মাটনই হোক টুমরো', অথবা, 'শের তো ভাগা, বাট হাউ'। আমরা কিছুতেই ভুলতে পারি না লালমোহনবাবুর টেলিফোন ইংরাজি—'দি সার্কাস হুইচ এসকেপ্‌ড ফ্রম্‌ দি গ্রেট ম্যাজেস্টিক টাইগার'। তবে সব কিছুকে ছাড়িয়ে যায় তাঁর আতঙ্কিত উচ্চারণ 'হ্যাঁয়েস' (হাঁ+ইয়েস)।

আগেই বলেছি কথা নিয়ে খেলা 'ফেলুদা কাহিনী'র একটা আলাদা আকর্ষণ। 'গোঁসাইপুর সরগরম'-এ রহস্যভেদ এই কথার খেলা থেকেই প্রথম ইশারা পেয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে লালমোহনবাবু হাস্যকর পরিস্থিতি রচনা করলেন, 'যত কাণ্ড

কাঠমাণ্ডুতে'। মগনলাল 'আঙ্কল'-কে, মানে লালমোহনবাবুকে চায়ের সঙ্গে সুগার কিউবের বদলে এল এস ডি খাইয়ে দিয়েছিল। ঘোরের মধ্যে যখন লালমোহন বলেন 'ওঁ মণিপদ্মে হুমকি' এবং 'এ্যান্টি বায়োটিকটিকি' তখন ক্রাইম স্টোরি খাঁটি হিউমারের এলাকায় ঢুকে পড়ে। এল এস ডির নামান্তর পাউণ্ড শিলিঙ পেন্স এটা অবশ্য ফেলু মিত্তিরের বুদ্ধিতৎপর উদ্‌ভাবনার নিদর্শন। পাঁচকড়িদের দেবেন্দ্রবিজয় ছিলেন অরিন্দমের সহকারী ও সাগরেদ। তিনি অচিরকালের মধ্যে ওস্তাদকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। লালমোহনবাবুর পক্ষে তা সম্ভব হয় নি— হবার কথাও নয়। কিন্তু লালমোহনবাবু ফেলু মিত্তিরের কাছ থেকে একটা যুক্তকর নমস্কার আদায় করে নিয়েছিলেন 'গোলাপী মুক্তায়'। বস্তুত এই 'কেস'টিতে লালমোহনের স্বাধীন চকিতবুদ্ধির বিদ্যুৎলীলাই ফেলু মিত্তিরকে পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। লালমোহনবাবু বা জটায়ুকেই আলাদা করে খুঁজেছিল অম্বর সেনের বাড়ির ছোট্ট মেয়েটি। আমরা সবাই তাঁকে এমনভাবে খুঁজি— এমনই তাঁর জনপ্রিয়তা। তার স্রষ্টাও তাঁকে কম ভালবাসেন নি। তাই লালমোহন-বাবুর ভাগ্যেই তিনি জুটিয়ে দিয়েছেন সবশেষে সোনার বালগোপাল—যদি কোনদিন জটায়ুর হট্টকচুরি ঠাণ্ডা হয়ে যায়, সোনার বালগোপাল তাহলে এই টগবগে সদাহাস্য মানুষটিকে আর্থিক সঙ্কট থেকে বাঁচাবে।

৪

সবশেষে তোপসে—শ্রীমান তপেশ রঞ্জন মিত্র। ফেলু মিত্তির কাহিনীর লিপিকার তপেশ। তার বলা গল্প বলেই প্লটের কোন কোন খামতি আমরা নজর করি না। যেমন 'দার্জিলিঙ জমজমাট'-এ নিহত ব্যক্তির পোস্টমর্টেম হলেই তো বিষের ব্যাপারটা আগেই ধরা যেত। তপেশের বয়ঃক্রম, শিক্ষাক্রম আর তার বাক্‌-রীতি এমন একটা সাযুজ্য পেয়েছে বলে 'ফেলুদা কাহিনী' এত সুখপাঠ্য। এই যে বিবরণকে উপভোগ্য করে তোলার ব্যাপারে তপেশের সহজ সিদ্ধি, তার একটা প্রধান কারণ তপেশের ভাষা। অধিকাংশ কিশোর উপন্যাস ঝুলে যায় জোর করে লিখনশৈলীতে কিশোর সজীবতা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টায়। গোঁফ কামিয়ে হাফ-প্যাণ্ট পরে জোর করে হাফ টিকেটে ভ্রমণ করার মতো তা হয় হাস্যকর। মহৎ ব্যতিক্রম লীলা মজুমদার। আমার ধারণা ফেলু মিত্তির কাহিনী এত জনপ্রিয় হয়েছে তোপসের গদ্যের জন্য। এই গদ্য সত্যজিৎ রায়ের ফিল্মের নিহিত শক্তিতে বিশিষ্ট। ঠিক ততটুকু বলা হয়, যতটুকু দরকার। সমগ্র তোপসে বিবরণে একটা বাক্য নেই যা বাহুল্য। চোখে ধরিয়ে দিতে পারে তার বর্ণনা। তোপসে যখন বলে :

'ছোট বড় মেজ সেজো নানান সাইজের কালো সাদা খয়েরি পাটকিলে ছিটদার

২

তারিণী খুড়ো তাঁর শ্রোতাদের কেউ নন। ঢাকায় লেখকের বাবার সঙ্গে চেনা, পড়শিসূত্রে খুড়ো। তাই সকলেরই খুড়ো। সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছেন। রোজগারের জন্যে তেত্রিশটা শহরে ছাপ্পান্ন রকম কাজ করেছেন। কাজ করেছেন ব্যবসা এবং চাকরি দুই-ই। কোথাও একবছরের বেশি টেঁকেন নি। চৌষট্টি বছর বয়সে কলকাতায় ফিরে এসে বেনেটোলায় একটা ফ্ল্যাট কিনে বালিগঞ্জে যান ন্যাপলাদের দলে 'গল্পদাদু' হয়ে বসবার জন্যে। বাস না পেলে হেঁটেই যান। র-টি খান। সঙ্গে এক্সপোর্ট-কোয়ালিটির বিড়ি।

তারিণী খুড়োর এই ভারত-ভ্রমণের স্বভাবটি তৈরী হয়েছে লেখকের নিজেরই ভৌগোলিক ও তথ্যগত কৌতূহলকে পরিবেশন করার অদম্য ইচ্ছার জন্যে। ডুমনিগড়ের অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে তারিণীকে ন্যাপলা প্রশ্ন করেছিল, 'ডুমনিগড় ম্যাপে আছে?' তার উত্তরে শুনতে হয়েছিল, 'ম্যাপে নেই ডুমনিগড। এই নিয়ে ফিলিপসের অ্যাটলাস কোম্পানিকে কড়া চিঠি দিয়েছিলাম সেই সময়। তারা লিখলে, ভেরি সরি, আগামী সংস্করণে শুধরে দেবে। দেয় নি যে, সেটা স্রেফ গাফিলতি। ডুমনিগড হচ্ছে মধ্যপ্রদেশের বাঘেলখণ্ডে। মাইহার অবধি ট্রেন, তারপর একশো বত্রিশ কিলোমিটার পূবে গাড়িতে। হল?' শুনে ন্যাপলা চুপ মেরে যায়। যেমন ফেলুদার নিখুঁত তথ্যজ্ঞানে জটায়ুকে চুপ মেরে যেতে দেখেছি।

তেমনি, পুনের কনওয়ে ক্যাসেলেরও ইতিহাস শুনতে হয় তারিণীর মুখে। ব্রিটিশ আমলে 'পুনা' ছিল সাহেবদের একটা বড ঘাঁটি। মিলিটারি তো বটেই, সিভিলিয়ানও অনেকে থাকতেন পুনাতে। ব্রিগেডিয়ার কনওয়ে-রা তৈরী বাড়ি এই কনওয়ে ক্যাস্‌ল। বাড়িটা তৈরি হয় কুইন ভিক্টোরিয়া যে বছর ভারত-সম্রাজ্ঞী হন সেই বছর। অর্থাৎ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। আবার শেঠ গঙ্গারামের আজমীরের বাড়িতে তাঁর সেক্রেটারির কাজ করতে গিয়ে তারিণীর মুখে শোনা গেছে রাজস্থানের রোম্যান্টিক আকর্ষণের কথা। 'সোনার কেল্লা'র সত্যজিৎকে অবশ্যই মনে পড়বে। ফলে, জয়পুর হয়ে আজমীর যাবার পথের আকর্ষণটি কেমন তা তারিণীর মুখেই শুনতে হলো, 'একবার অম্বর প্যালেসটায় ঢুঁ মেরে জয়পুর থেকে চলে গেলাম মুসলমানদের পবিত্র তীর্থস্থান আজমীরে। আকবর একটা প্রাসাদ বানিয়েছিলেন এই শহরে। আজমীর থেকে সাত মাইল পশ্চিমে হিন্দুদের তীর্থস্থান পুষ্কর। সব মিলিয়ে যাকে বলে ঐতিহ্যে মহীয়ান। প্রথম রাতটায় থাকলাম সার্কিট হাউসে।...আনাসাগর নামে বিরাট লেকের ধারে এমন সার্কিট হাউস ভারতবর্ষে আর দুটি আছে কি না সন্দেহ। বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে যে দৃশ্য দেখলুম তা জীবনে ভুলব না। হাজার হাঁস চরে বেড়াচ্ছে লেকে, পশ্চিমে তারাগড় পাহাড়, তার পেছনে টেক্‌নিকালার ছবির মতো সানসেট হচ্ছে।'

তারিণীর মুখে আর একটি অভিজ্ঞতা টিন-এজারদের তো বটেই, সকলেরই পছন্দ হবে। সে হলো 'লখ্‌নৌ ডুয়েলে' গল্পে ডুয়েলের ইতিহাস। ডুয়েল নিয়ে পড়াশোনা-করা তারিণীর মুখে ন্যাপ্‌লার দল শুনেছে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ইটালি থেকে কীভাবে ডুয়েলিং-এর রেওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে সারা ইয়োরোপে। তলোয়ার ছিল তখন পোষাকের অঙ্গ। আর অসি-চালনা বা ফেন্‌সিং ছিল শিক্ষার অঙ্গ। অপমানিত হলেই লোকে ডুয়েলে চ্যালেঞ্জ করতো। বন্দুক-পিস্তলের যুগে পিস্তল হয়ে পড়ে ডুয়েলের অস্ত্র। সে হলো অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘটনা। ডুয়েলে লোকে মরতো বা জখম হতো বলে ডুয়েল বেআইনীও হয়েছে মাঝে-মধ্যে। ডুয়েলের নানা আইনকানুনও ছিল। দু'জনকেই একই রকম অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে। দু'জনেরই একটি করে 'সেকেণ্ড' বা আম্পায়ার থাকবে। সমান দূরত্বে দু'জনকেই দাঁড়াতে হবে। দু'জনকেই 'সেকেণ্ড ফায়ার' বলামাত্র এক সঙ্গে গুলি চালাতে হবে। ইত্যাদি।

তেমনি জানা গেছে, ধুমলগড়ের কথা। মধ্যপ্রদেশের একটা ছোট্ট শহর, চাঁদা থেকে সত্তর কিলোমিটার পশ্চিমে। চারদিকে জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যেই হান্টিং লজ। কিংবা শীতের মিঠে রোদে সবুজ বেঞ্চে সবুজ ঘাসে-ঢাকা মাঠে জর্ডিনের এম. সি. সি টিমের সঙ্গে ইণ্ডিয়ান টিমের খেলা। ওত-পেতে কোলাব্যাঙের মতো ব্যাট-ধরে-থাকা দিলওয়ার হোসেনের লাখটাকা দামের চৌষট্টি রান। কিংবা, গাছের ছায়া পড়েছে ইডেনের মাঠে, মাঝে মাঝে গঙ্গার স্টীমারের ভোঁ বাজছে। সব মিলিয়ে দর্শক সাজানো ইডেন যেন মূর্তিমান নস্ট্যালজিয়া। তার ওপর হাতে প্রিন্‌স্ রন্‌জির ব্যাট। সে ব্যাটের জাদুতে তারিণীর দুশো তেতাল্লিশ রান। তুলনা নেই।

আরো আছে। বেয়াল্লিশ সালে যুদ্ধত্রস্ত কলকাতার ছবি। রাস্তাঘাটে খাকি-পরা জি-আই সেনা ঘুরে বেড়াচ্ছে। চৌরঙ্গীতে মার্কিন মিলিটারি পুলিশ। তাদের জামার আস্তিনে কনুই-তে লেখা এম-পি.। ওদিকে সিনেমা হাউসগুলো খালি পড়ে থাকে না। দিশি-বিলিতি সব ছবিই হিট। টলিউডের স্টুডিওগুলো গম্‌গম্‌ করছে। কুইক মানির লোভে রোজই টাকাওয়ালা প্রোডিউসার আসছে। সেই সময় তারিণী হয়েছেন প্রোডাক্‌শন ম্যানেজার। কিন্তু আসলে তারিণীর অভিনয়ের শখ আছে। হলিউডের ছবির পোকা তিনি। আবার পেশাদারী বাংলা থিয়েটারেরও ভক্ত। শিশির ভাদুড়ী, যোগেশ চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের ফ্যান। টলিউডের তারিণীর সঙ্গে মিশে গেছে কুড়ি-পেরোনো সতেজ, উদ্দীপ্ত, ভবিষ্যতের ফিল্মওয়ার্ল্ডের রাজা সত্যজিৎ। কিংবা দেখেছি হায়দ্রাবাদের যে আর্টিস্ট, ধনরাজ মার্তণ্ড, পৌরাণিক ছবি আঁকেন রাজা রবি বর্মার স্টাইলে, সেই আর্টিস্টের পৌরাণিক ছবি-আঁকার জন্যে পুরুষ মডেল হয়ে গেলেন তারিণী। সেই সূত্রে হায়দ্রাবাদ শহর, মিউজিয়ানায়, স্টুডিও, রবি বর্মার পরিচয়, পৌরাণিক ছবি আর রাজা বিক্রমাদিত্যের কাঁধে হিন্দী ফিল্মের 'জিন্দা লাশে'র মতো ভূতে-

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

তারিণী খুড়োর কীর্তিকলাপ : এক ভক্ত পাঠকের চোখে

গল্প পড়ার নেশা যাদের সবে ধরেছে, গল্পের পরিবেশ সৃষ্টিতে লেখকের নানা আয়োজন যাদের আকর্ষণ করছে, আর পড়তে পড়তে যারা বুঝতে পারছে, কতো বিচিত্র বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করে নিতে পারলে তবেই লেখকের পক্ষে এতো বৈচিত্র্য সৃষ্টি করাটা সম্ভব, সেই টিন-এজারদের পক্ষে হয়তো 'তারিণী খুড়োর কীর্তিকলাপ' নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্যের মতোই প্রিয় বলে মনে হবে।

কিন্তু যে বয়সের পাঠকের জন্যেই লেখা হোক গল্প যারা ভালোবাসে তারিণী খুড়ো তাদেরই ভালোবাসা পাবে। বয়স তাদের যাই হোক। অন্তত তারিণী খুড়ো সব বয়সের মানুষেরই খুড়ো, শুধু তারিণীর পাঁচজন শ্রোতার—লেখক, ভুলু, চঠপটি, সুনন্দ আর ন্যাপলারই খুড়ো নয়।

তারিণী ব্যানার্জির অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য এবং সে বৈচিত্র্য পরিবেশনের নৈপুণ্য সম্পর্কে কিছু বলার আগে তারিণীর বয়স সম্পর্কে একটু খট্‌কার কথা বলি।

'ডুমনিগড়ের মানুষখেকো' গল্পে দেখছি, গল্প বলতে গিয়ে তারিণী বলছেন, 'আমার তখন জোয়ান বয়স, সবে ত্রিশ পেরিয়েছে।' একটু পরে বলছেন, 'তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে, তবে ডুমনিগড়ে জীপ আসে নি।' কাজেই মহাযুদ্ধের সময়ে, ১৯৩৯-৪৫-এ, যে সবে তিরিশ পেরিয়েছে তার জন্ম ১৯১০ থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে হবে। 'কনওয়ে ক্যাসেলের প্রেতাত্মা' গল্পে দেখছি, তারিণী বলছেন, 'কোডার্মায় মাইকা মাইন্‌সের কাজে ইস্তফা দিয়ে শিবাজীর দেশে এসেছি একটা হোটেলের ম্যানেজারি নিয়ে। আমার বয়স তখন চৌত্রিশ।' তারিণী তখন পুনেতে। যদি ১৯১০-১৫ সালের মধ্যেই তারিণীর জন্ম হয়ে থাকে, তাহলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষাশেষি থেকে ১৯৪৮-৪৯-এর মধ্যে এসেছেন পুনেতে, হোটেলের ম্যানেজারি করতে। কিন্তু 'শেঠ গঙ্গারামের ধনদৌলত' গল্পে তারিণীর বয়সের স্পষ্ট ধারণাই করা যায়। দেখা যাচ্ছে, আগ্রার একটা ব্যাঙ্কের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আজমীরে শেঠ গঙ্গারামের সেক্রেটারি হয়েছেন তারিণী। র-টি-তে চুমুক দিয়ে তারিণী গল্প শুরু করেছেন 'নাইনটিন ফর্টি ফোরে আজমীর। তখন আমার বয়স আটাশ।' তাহলে তারিণীর জন্মসাল ১৯১৬। আর তাহলে, ডুমনিগড়ে উল্লিখিত বয়স ঠিক নয়। সবে তিরিশ পেরোলে ১৯৪৬ সাল হয়। অথচ বলা হচ্ছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। হতে পারে না। ১৯৪৫-এ যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। কনওয়ে

ক্যাসেলের ঘটনাটা চৌত্রিশ বছর বয়সে হলে সালটা হবে ১৯৫০। ১৯৪৮-৪৯-এর মধ্যে নয়।

লখ্‌নৌ ডুয়েলের অলৌকিক ঘটনাটা ঘটেছে তারিণীর নিজের হিসেব অনুযায়ী ১৯৫১-তে। তারিণী বলছেন, 'তার বছর দেড়েক আগে রেস্তার্সের লটারিতে লাখ-দেড়েক টাকা পেয়ে তার সুদে দিব্যি চলে যাচ্ছে।' 'রেগুলার চাকরি বলে কিছু নেই।' তাহলে, ১৯৫০ সালের প্রথম দিক থেকেই তারিণী বেকার। ১৯৫১ পর্যন্ত। অথচ হিসেব অনুযায়ী, ১৯৫০ সালে পুনেতে হোটেলের ম্যানেজার। তাহলে তারিণীর কথাটা ঠিক নয়। 'ধুমলগড়ের হান্টিং লজে'-র ঘটনাটায় বলাই আছে, 'সিক্সটি ফোর—আমার বয়স তখন চল্লিশের ঘরে।' জন্মসন ১৯১৬ হলে বয়স হয় আটচল্লিশ। চল্লিশের ঘরে বললে অন্যায় হয় না। খেলোয়াড় তারিণী খুড়ো ত্রিশ-বছর বয়সে উত্তরপ্রদেশে উত্তর হিমালয়ের গায়ে তিনহাজার ফুট এলিভেশনে মার্তণ্ডপুর নেটিভ স্টেটে প্ল্যান্টার্স ক্লাবের সঙ্গে মার্তণ্ডপুর ক্রিকেট ক্লাবের (এম সি সি) হয়ে অজান্তে রন্‌জি-র ব্যাট নিয়ে ডাব্‌ল্‌ সেঞ্চুরি করেছিলেন। তখন তিনি মার্তণ্ডপুরের রাজার সেক্রেটারি। হিসেব মতো, সালটা হয় ১৯৪৬। কিন্তু ১৯৪৬-এ এ তারিণী ছিলেন ডুমনিগড়ে। অথচ এই মার্তণ্ডপুরে এসেছেন ভগবানগড়ের রাজার রেকমেণ্ডেশনে। তাহলে, এই ১৯৪৬ সালেই ডুমনিগড় থেকে ভগবানগড় হয়ে মার্তণ্ডপুরে! খুবই দ্রুত চাকরি বদল! আসলে তা নয়। তারিণীর মতে, খেলাটা হয়েছিল ১৯৪৯'-এ। সন-তারিখের গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। আবার গণ্ডগোল হয়েছে টলিউডে-র ঘটনায়। তারিণী বলছেন, 'আমার তখন তেইশ বছর বয়স। তবে একটা তেকোনা ফ্রেঞ্চকাট গোছের দাড়ি রেখেছিলাম বলে মনে হতো তেত্রিশ। বেয়াল্লিশ সালের কথা বলছি।' তারিণীর জন্ম ১৯১৬ সালে হলে বিয়াল্লিশ সালে তার বয়স হওয়া উচিত ছাব্বিশ বছর। আর তারিণী যখন তাঁর নিজের জীবনে বেতালের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন শেষ গল্পে, তখন তিনি মালাবারে এলাচের ব্যবসা-তে দু'পয়সা করে নানা জায়গা ঘুরে হায়দ্রাবাদে এসেছেন। কিন্তু সন-তারিখ উল্লেখ করেন নি।

লেখকের তাড়াহুড়োতে তারিণীর বয়সের হেরফের ঘটে গেছে, একথা মানতেই হবে। মানতেই হবে যে, একই কারণে তারিণীর ভারতবর্ষ ঘোরার অভিজ্ঞতা ধুমলগড়ে হান্টিং লজের অভিজ্ঞতার সময়ে বলা হচ্ছে চল্লিশ বছরের এক্‌সপিরিয়েন্‌স্‌। বেতালের গল্পে বলা হয়েছে পঁয়তাল্লিশ বছরের এক্‌সপিরিয়েন্‌স্‌। এক সঙ্গে গল্পগুলো গ্রথিত হয়েছে বলেই এই ত্রুটিগুলো চোখে পড়ে। যাঁর গল্পের তথ্যের বৈচিত্র্য বিস্ময়কর তিনি একটা সিরিজের গল্পে আর একটু সচেতন হবেন এইটেই সকলের প্রত্যাশিত। কিন্তু এই সব বাইরের কিছু অসঙ্গতি ছাড়া গোয়েন্দা ফেলুদা আর প্রোফেসর শঙ্কুর চেনা ভাবভঙ্গির বাইরে তারিণী খুড়ো তাঁর চারিত্রিক নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য এবং অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য নিয়ে হাজির হয়েছেন।

মৃত্যু বলে সেটা চালানো হয়। দ্বিতীয়জন কঙ্কালরূপী আদিত্যনারায়ণ—যাকে খুন করা হয়েছিল বলে ভাই প্রতাপনারায়ণকে গুলি করে সে প্রতিশোধ নিল। বলা যেতে পারে, দুটি ভূতেরই যুদ্ধ। ছায়ামূর্তির সঙ্গে কঙ্কালের যুদ্ধ। তারিণী চার রকমের ভূত দেখেছিলেন। তার মধ্যে দুটির কথা এখানে আছে। কিন্তু খেলোয়াড তারিণীর মধ্যে এই জাতীয় ভৌতিক ব্যাপার নেই। তবে বলা যেতে পারে, প্রিন্‌স্‌ রন্‌জির ব্যাট নিয়ে তারিণী মার্তণ্ডপুর ক্রিকেট ক্লাবের অর্থাৎ এম. সি. সির হয়ে যে ডাব্‌ল সেঞ্চুরি করেছিলেন তাতে রন্‌জির ভূত চেপেছিল তারিণীর হাতে-পড়া রনজির ব্যাটে এবং জীবনে যে সব স্ট্রোক তারিণী মারেন নি সে-সব স্ট্রোকই তারিণীর হাতে বেরিয়ে গিয়েছিল। কাজেই এও এক অলৌকিক ক্ষমতা সঞ্চারের গল্প।

কিন্তু 'টলিউডে তারিণী খুড়ো' গল্পে তারিণী যেভাবে অভিনেতা জ্যোতির্ষার্ণব সেজে অভিনেতা রমণীমোহনকে 'অভিনয়ে তার কোনো ভবিষ্যৎ নেই' বলে নার্ভাস ব্রেক ডাউন ঘটিয়ে আলমগীরের ভূমিকাটি ছিনিয়ে নিয়েছেন তাতে অলৌকিকতা কিছু নেই। চালাকি আছে। এবং ডাব্‌ল্‌ রোলেরই চালাকি। জ্যোতির্ষার্ণব সেজে রমণীমোহনকে ভড়কে দেওয়া আর আলমগীরের পার্টটা রমণীমোহনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অভিনয় দক্ষতা দেখানো। 'শেঠ গঙ্গারামের ধনদৌলত' গল্পে যেমন তারিণীর ছাত্র মহাবীরের বুদ্ধিতে তারিণী বেঁচে যান। এখানে তেমনি, তারিণীর নিজের চালাকিতে সম্ভাব্য এক অভিনেতাকে দমিয়ে দিয়ে নিজেই তিনি অভিনেতা হয়ে বসেন। আবার একটি কমন মোটিফও এ দুটি গল্পে আছে। সেটি হলো, চেহারার মিল। 'শেঠ গঙ্গারামের গল্পে' টোটা সিং-তারিণীর চেহারার মিল, টলিউডের তারিণীর সঙ্গে তেমনি রমণীর চেহারার মিল। প্রথম মিলটির জন্যে তারিণী বিপদে পড়েছিলেন। দ্বিতীয় মিলটির জন্যে তারিণীর সাফল্য অনেকটা সহজ হয়েছিল।

শেষ গল্প 'তারিণী খুড়ো ও বেতালে' আবার অলৌকিকতা এসেছে। বিক্রমাদিত্যের বেতাল সিরিজের জন্যে এক আর্টিস্টের মডেল হবার সুযোগ পেয়েও শেষ পর্যন্ত আহত হয়ে তারিণীকে মডেল হবার আশা ছাড়তে হয়। কিন্তু আর্টিস্টের অনুরোধে তারিণী এক ম্যাজিসিয়ানের কাছে গিয়ে এক সিদ্ধ পুরুষের কঙ্কাল জোগাড় করে। সে কঙ্কালটি ম্যাজিসিয়ানকে তার ভোজবাজিতে সাহায্য করতো। ম্যাজিসিয়ানের গুরুজী বলেছিলেন, কাজ ফুরিয়ে গেলে তাকে নদীর জলে ফেলে দিতে। জলে না ডুবলে বুঝতে হবে তাকে দিয়ে কাজ বাকি আছে। তখনও কাজ বাকি আছে এমন অবস্থায় তারিণী কঙ্কালটি নিয়ে এসে আর্টিস্টকে দিলেন। কিন্তু নতুন মডেল কঙ্কাল কাঁধে নিয়ে আর্টিস্টের ছবির জন্যে বসে থাকতে থাকতে মডেলকে কঙ্কালটি মরণালিঙ্গনে চেপে ধরে। তখন বিক্রমাদিত্য-মডেলের সাজ-পোশাক খসে গিয়ে বেরিয়ে পড়ে আসল চেহারা। সেই লোকটিই

তারিণীর মডেলের জায়গাটা দখল করার জন্যে তারিণীকে মার খাইয়ে আহত করেছিল। লোকটিকে পুলিশের হেপাজতে রেখে তারিণী শেষ পর্যন্ত সিদ্ধপুরুষের কঙ্কালের জোরে শত্রুকে হটিয়ে বিক্রমাদিত্য সিরিজের হিরো হতে পেরেছিলেন।

দেখা যায়, তারিণী খুড়োর আটটি কীর্তিকলাপের গল্পে অলৌকিক ও লৌকিক নানা শক্তিই সক্রিয় হয়েছে। অন্তত ছ'টি গল্পের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু অলৌকিক শক্তি এবং দুটি গল্পে, 'শেঠ গঙ্গারামের ধনদৌলত' এবং 'টলিউডে তারিণী খুড়ো'-তে বুদ্ধির কলাকৌশলই আকর্ষণের মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তারিণী ন্যাপলাদের গল্প বলতে বলতে ইস্কুল-মাস্টারি ঢঙে একবার বলেছিলেন, ভূত সচরাচর চার প্রকার হয়। এক অশরীরী আত্মা, যাকে চোখে দেখা যায় না। দুই, ছায়ামূর্তি। তিন, নিরেট ভূত,—দেখলে মনে হবে জ্যান্ত মানুষ, কিন্তু চোখের সামনে ভ্যানিশ হয়ে যাবে। চার, নরকঙ্কাল—চলে ফিরে বেড়ায় এবং কথা বলে। কনওয়ে ক্যাস্‌লের প্রেতাত্মা 'অশরীরী আত্মা'। অদৃশ্য হাতে চিরকালই টানা-পাখা চালাচ্ছে। লখনৌ ডুয়েলের হিউ ড্রামণ্ড 'নিরেট ভূত'। চোখের সামনে ভ্যানিশ হয়ে গেছে। ধুমলগড়ের হান্টিং লজের বড় রাজকুমার আদিত্যনারায়ণ কঙ্কাল-ভূত। ভাই প্রতাপনারায়ণ 'ছায়ামূর্তি'। আর তারিণী খুড়ো ও বেতালের গল্পের কঙ্কালও ভূত। তারই শক্তিতে তারিণী মডেল-হিরো হতে পেরেছিল। কাজেই চার রকম ভূতকেই আমরা তারিণীর গল্পে পেয়েছি। সঙ্গে আছে ভারতবর্ষের নানা জায়গার স্থানিক বৈচিত্র্য এবং তথ্যগত আকর্ষণ।

পাওয়া লাশের (বেতালের) গল্প—কতো কী এসে পড়েছে ছবি আর গল্পের রাজা সত্যজিতের নিজস্ব কৌতূহলেই।

আসলে তারিণীর কাঁধে বেতালের মতোই ভর করেছেন এনসাইক্লোপিডিস্ট সত্যজিৎ। আর সেইজন্যেই বিচিত্র তথ্যসন্ধানী তারিণী ব্যানার্জির নানা অভিজ্ঞতার নিছক বৈচিত্র্যই তাঁর কীর্তিকলাপের একটা আলাদা স্বাদ এনে দিয়েছে।

৩

এইবার তারিণী খুড়োর গল্পগুলোর আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুগুলো লক্ষ্য করা যাক :

ডুমনিগড়ের মানুষখেকো গল্পের মূল আকর্ষণ হলো একটি খুন। ডুমনিগড়ের রাজা ভূদেব সিং-এর বড়ছেলে শ্রীপত সিং খুন হয়েছে। জুয়োর আড্ডা বসতো শ্রীপতের এক বন্ধু নারায়ণ শ্রীমলের বাড়িতে। জুয়োতে শ্রীপত একবার জিতলে নারায়ণের সঙ্গে তর্কাতর্কি হয়। তারপর ফেরার পথে লেকের ধারে শ্রীপত গুলিতে খুন হয়। নারায়ণকে সেই বচসার ভিত্তিতে ধরা হয়। কিন্তু প্রমাণের অভাবে নারায়ণ ছাড়া পায়। তারিণী অবশ্য গুলি করা দেখেছিলেন। কিন্তু অন্যমনস্ক থাকায় গুলিটা কে করেছে তা ধরতে পারেন নি। ইতিমধ্যে স্টেটে বিদেশী হাণ্টারের ঘা-খাওয়া একটি বাঘ উৎপাত শুরু করলে তারিণীকেই বাঘটা মারতে ভার দেওয়া হয়। জঙ্গলে যাবার আগে তারিণী এক সাধুবাবার কাছে রাজার জন্যে এবং বাঘের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে টোটকা নিয়ে রেস্ট হাউসে গেলেন। হঠাৎ দেখেন রাজার মেজছেলে ভূপত সিং হাজির। তিনি বললেন, তারিণীকে সাহায্য করতেই তিনি এসেছেন—বাবাকে রাজি করিয়েই। মাচার নিচে টোপ রেখে ওপরে উঠে বসতেই বৃষ্টি এলো। শীতের বৃষ্টিতে ঠাণ্ডালেগে হাঁচি শুরু হতেই বুঝলেন শব্দ পেলে শিকার আসবে না। ভূপতকে মাচায় রেখেই তিনি নেমে পড়লেন। তারপরে অন্ধকারে একটা গুহার মেঝেতে বসলেন। দেখলেন, অন্ধকারে ভূপতও বন্দুক হাতে ঢুকলো। শ্রীপত যেদিন খুন হয় সেদিন হত্যাকারীকে তারিণী চিনতে না পারলেও হত্যাকারী-ভূপত তারিণীকে দেখেছে। তাই শত্রুর শেষ রাখতে সে চায় না। দাদাকে হটিয়ে রাজার গদি পাওয়াই তার লক্ষ্য ছিল। ভূপত যখন গুহার অন্ধকারে তারিণীকে গুলি করতে যাবে তখন একজোড়া মার্বেল চোখ তাকে টেনে নিয়ে গেল। ভোর হতেই তারিণী মাচার কাছে গিয়ে দেখেন, বজ্রপাতে গাছটা পুড়ে গেছে। নিচে মৃত মোষের কাঁধে দাঁত বসিয়ে পড়ে আছে মৃত বাঘ। সাধুবাবার ওষুধের কৃপায় বাঘ তো তারিণীকে ছোঁয় নি। তার ওপর তাঁর হত্যাকারীকে মেরে তাঁকে বাঁচিয়ে গেছে। কাজেই তারিণীর প্রাণরক্ষার পেছনে বাবাজীর ওষুধের অলৌকিক শক্তি কাজ করেছে। প্রাণে বাঁচার ব্যাপারটা হয়তো অসম্ভব ছিল না। কিন্তু ব্যাপারটা তারিণীর চোখে অলৌকিক। কিন্তু 'কনওয়ে ক্যাসেলের প্রেতাত্মা'

গল্পে হুতোম প্যাঁচার ডাকের রেকর্ডিং করতে গিয়ে রেকর্ডে যে অদ্ভুত অন্য একটা শব্দ এলো তাকে অনেকেই ট্রেড্‌ল মেশিনের শব্দ মনে করে। তারপর সবাই মিলে ক্যাসেলে গিয়েও একটা ঘরে কঙ্কাল আর ট্রেড্‌ল মেশিন দেখার মধ্যে বাজি জেতার কারসাজি ছিল ঠিকই। কিন্তু মূল আকর্ষণটা অন্য। সাহেবী আমলে পাংখাবরদারকে লাথি মেরে মেরে-ফেলার ঘটনা আর বৈঠকখানায় অশরীরী হাতে-টানা পাখার অবিশ্রাম চলার যোগটা ভৌতিক, বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা মেলে না। 'শেঠ গঙ্গারামের ধনদৌলত' গল্পে গঙ্গারামের ধনদৌলতের খবর পেয়ে বাড়িতে যে ডাকাত টোটা সিং লুঠতরাজ করেছে সেই টোটা সিং-এর সঙ্গে গঙ্গারামের ছেলে মহাবীরের প্রাইভেট টিউটর তারিণীর হুবহু চেহারার মিল যেমন বিস্ময় সৃষ্টি করেছে, তেমনি বিপদ হয়েছে টোটা সিং-এর সন্ধানে পুলিশ এসে হুবহু একই চেহারার তারিণীকে ধরবার সম্ভাবনায়। কিন্তু উদ্ধার পেয়েছেন তারিণী প্রায়-অবাধ্য ছাত্র মহাবীরের অসাধারণ বুদ্ধিতে। মাস্টারমশাইকে সরবতের সঙ্গে বাবার বরাদ্দ চারটে ঘুমের বড়ি খাইয়ে মহাবীর তারিণীর টোটা সিং-মার্কা গোঁফ কামিয়ে দিয়েছে, চুল ছেঁটে দিয়েছে। ফলে টোটা সিং-মার্কা চেহারার তারিণী ক্লীন-শেভ্‌ন্ কদম-ছাঁট হয়ে সে যাত্রা বেঁচে গেছে। কাজেই এ গল্পে বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা মেলে না এমন অলৌকিক কিছু নেই। চেহারার অতি-সাদৃশ্য সম্ভব। কেবল ছাত্রের অপ্রত্যাশিত অসাধারণ বুদ্ধির কৌশলে তারিণীর মুক্তিই একই সঙ্গে গল্পে বিস্ময় আর কৌতুক সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু লখ্‌নৌ ডুয়েলের সমস্ত ঘটনাটা দেড়শো বছর আগেকার একটা ডুয়েলের ঘটনার পুনরাবৃত্তি এবং যার কাছে ঘটনাটা প্রথমে শোনা এবং পরে তার পুনরাবৃত্তি দেখা সেই ঘটনারই একটি চরিত্র হিউ ড্রামণ্ড। সে-ই এসে পুরো ঘটনাটা বলেছে। এবং হঠাৎই ড্রামণ্ড রূপান্তরিত হয়ে পুরোনো পোশাকে মিলিয়ে গেছে। ডুয়েলের আড়ালে সে-ই হলো তৃতীয় জন যাকে আনাবেলা ভালোবাসতো। শেষ বিস্ময় অপেক্ষা করছিল তারিণীর জন্যে। যখন ডুয়েলের ফায়ারিং দেখে বাড়িতে ফিরে সেই ডুয়েলে ব্যবহার-করা পিস্তলে হাত দিয়ে দেখলো গরম, বারুদের গন্ধ। হয়তো রোম্যান্টিক বলেই ঘটনার অলৌকিকত্ব আর কল্পনার চমৎকারিত্ব আরও আকর্ষণ করে। অতীত প্রেমের ডুয়েলে চ্যালেঞ্জ এবং সেই চ্যালেঞ্জের আড়ালে আবার তৃতীয় এক গোপন প্রেমিক রয়েছে, এবং সেই প্রেমিকেরই ভৌতিক রূপ তারিণীকে গুমতি নদীর ধারে সেই দৃশ্য দেখিয়ে তার আদি পোশাকে রূপান্তরিত হয়ে ঘন কুয়াশায় মিলিয়ে যাচ্ছে—সমস্ত কল্পনাটার মধ্যেই একটা নতুনত্ব আছে। আছে অলৌকিকতার একটা নতুন মাত্রাও।

ধুমলগড়ের হান্টিং লজেও এক ভৌতিক কাণ্ডই ঘটেছে। কিন্তু নতুনত্বও আছে। একজন সত্যোমৃত দেহসম্পন্ন ধুমলগড়ের রাজা প্রতাপনারায়ণ। ইনি দশ বছর আগে সম্পত্তি আর গদির লোভে দাদা আদিত্যনারায়ণকে খুন করেছিলেন, পরে অপঘাত

অলোক রায়

বড়দের গল্প না কি একালের গল্প

সত্যজিৎ রায় যখন গল্প লেখা শুরু করেন তখন সম্ভবত পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ছোটদের কথাই প্রথমে ভাবেন। অবশ্য ছোটদের জন্য, অথবা কিশোরদের জন্য বলাই উচিত, লেখা গল্প যে প্রাপ্তবয়স্করা পড়েন না বা পড়ে আনন্দ পান না— এমন নয়। তবু মানবজীবনে এমন কিছু সমস্যা আছে, জীবনের এমন কিছু জট ও জটিলতা আছে যা নিয়ে গল্প লেখা হলে তাকে আমরা বড়োদের জন্য লেখা বলি। নরনারীর প্রেম-অপ্রেম, স্বার্থ-পরার্থপরতা, নিঃসঙ্গতা-সঙ্গলাভের আকুলতা, সমকালের রাজনীতি-অর্থনীতি গল্পকারের বিশেষ বক্তব্য প্রকাশের সহায়ক হয়ে ওঠে। অবশ্যই গল্পের একটা নিজস্ব আকর্ষণ আছে, বিশেষত গোয়েন্দাগল্পে বা কল্প-বিজ্ঞান-আশ্রয়ী কাহিনীতে। সত্যজিৎ গল্প বলতে জানতেন—গল্প বলার জন্য তিনি বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করেছেন—কিন্তু মনে হয় শুধুই গল্প বলে তাঁর তৃপ্তি ছিল না। কিশোরদের জন্য যখন তিনি লেখেন তখন হয়তো অনেক সময়ই শুধু কৌতূহল উদ্রেক ও কৌতূহল চরিতার্থ করার মধ্যেই তাঁর প্রয়াস সীমাবদ্ধ থেকেছে। কিন্তু 'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' (শব্দবন্ধটি তাঁর নিজের) যখন তিনি লেখেন 'পিকুর ডায়রি' ও চিত্রনাট্য 'পিকু', 'আর্যশেখরের জন্ম ও মৃত্যু', ময়ূরকণ্ঠি জেলি ও সবুজ মানুষ, কিংবা চিত্রনাট্য 'শাখা-প্রশাখা', তখন মনে হয় সত্যজিৎ প্রবেশ করেছেন এক অন্য জগতে, যেখানে প্রথামতো গল্প আর গল্পের প্রয়োজনে চরিত্র আছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে আরও বেশি কিছু আছে—সাহিত্যসৃষ্টি হিসাবেই যা মূল্যবান, যদিও এখনও পর্যন্ত সাহিত্যসমালোচকদের কাছে এই লেখাগুলি যেন কিছুটা অবহেলিত।

'আর্যশেখরের জন্ম ও মৃত্যু'কে সত্যজিৎ 'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য লেখা আমার প্রথম গল্প' বলেছেন। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য কেন? 'চাইল্ড প্রডিজি'কে নিয়ে কিশোর-দের জন্যও গল্প লেখা যেত। কিন্তু আর্যশেখর তো চিরকাল 'চাইল্ড' থাকবে না, ফলে কৈশোরেই পিতার ব্যবহারে তার মনে প্রশ্ন জেগেছে 'এমন প্রতিভাবান পুত্রের এমন হীন মনোভাবাপন্ন বাবা হয় কী করে? পিতাপুত্রের চরিত্রের এই বৈপরীত্য স্বাভাবিক, না এটা একটা ব্যতিক্রম?' এই থেকেই হেরিডিটি ও প্রজনন সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়নের সূত্রপাত। সাতপুরুষে বাপের দিক থেকে প্রতিভাবান

কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না; মাতৃকুলেও তথৈবচ। তাহলে কি আর্যশেখর জারজ সন্তান? পিতাকে পুত্র এই প্রশ্ন করলে পিতার প্রতিক্রিয়া সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু আর্যশেখরের প্রশ্নাকুলতা এখানে শেষ হয় নি। মাধ্যাকর্ষণ কেন—এই প্রশ্নের উত্তর-সন্ধানে আর্যশেখর এরপর আত্মনিয়োগ করেছে। কৌতুককর মনে হতে পারে তার অন্বেষণ। মাধ্যাকর্ষণের প্রতিবাদেই যে প্রাণের সৃষ্টি এবং মানুষের যত হীন প্রবৃত্তি, সমাজের যত অনাচার অবিচার দুঃখ দারিদ্র্য যুদ্ধবিগ্রহ সবই মাধ্যাকর্ষণ-জনিত—এই তত্ত্ব 'মোস্ট ইন্টি্রগিং' তাতে আর সন্দেহ কি! কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অগ্রাহ্য করে সূর্যের প্রভাবে উর্ধ্বগামী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তো পাগলামি বা সাময়িক আত্মবিস্মৃতি নয়। আর্যশেখর নিজের প্রজনন ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে, বা প্রতিবেশী ফণীন্দ্রনাথ বসাকের সপ্তদশ বর্ষীয়া কন্যা ডলির বাহু উত্তোলন দেখে মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে নতুন জ্ঞান লাভ করে—সেইজন্যই গল্পটি প্রাপ্ত-বয়স্কদের জন্য চিহ্নিত করা হয় নি। মার্কিন যুবকেব কাছ থেকে 'ড্রাগ' গ্রহণ করাও নায়কের জীবনের মূল সমস্যা বা পরিণতিব উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। আর্যশেখরের 'বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা' যার সূচনা হযেছিল তার শৈশবে, ধীরে ধীরে তাকে শুধু জীবনজিজ্ঞাসু করে তোলে নি, এক অখণ্ড-মুক্ত-জীবনসন্ধানী করে তুলেছে। বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন পিতা সৌম্যশেখর বা প্রেম ও আলোর পশ্চাদ্ধাবনে ভারতাগত মার্কিন যুবা—কেউই আর্যশেখরকে বোঝে নি, বোঝা সম্ভব ছিল না। আর্যশেখরের 'ব্যক্তিগত ধর্ম', যার নামকরণ এখনও হয় নি—তার বিশদ পরিচয় এই গল্পে নেই। কিন্তু সত্যজিতের গল্পধারার ভূমিকা হিসাবে এই গল্পটিকে রাখলে খুব ভুল হবে না, কারণ এখানেই হয়তো প্রথম সেই প্রত্যয়ের প্রকাশ ঘটেছে—'যা কিছু সুন্দর ও সতেজ, যা কিছু উন্নত, যা কিছু মঙ্গলকর' তা একেবারে ধ্বংস হতে পারে না; 'ধ্বংসের পাশে সৃষ্টির কাজ চলে এসেছে আবহমান কাল থেকে।'

ধ্বংস এবং সৃষ্টি, মৃত্যু এবং জন্ম, হীন প্রবৃত্তি ও উন্নত মনোভাব—'মানুষের কাজে, চিন্তায়, হৃদয়াবেগে, মানুষে মানুষে সম্পর্কে—সব কিছুতেই এটা বর্তমান।' সত্যজিতের গল্পে, বিশেষভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য লেখা গল্পে, 'থীম' হিসেবে এই জীবনসত্যটি প্রায় সর্বত্র কাজ করেছে। তিনি প্রোফেসর শঙ্কুকে নিয়ে ছোটদের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনী বা সায়ান্স ফ্যাণ্টাসি অনেক লিখেছেন। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য এরকম গল্প তিনি লিখেছেন মাত্র দুটি—'ময়ূরকণ্ঠি জেলি' ও 'নীল মানুষ'। গল্প হিসেবে খুব উল্লেখযোগ্য বা সার্থক রচনা নয়। যদিও ফ্যাণ্টাসি, তবু দেশকালের উল্লেখে, অথবা শুধু সেইজন্যই নয়, মানবমনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণের জন্য 'ময়ূরকণ্ঠি জেলি' সত্যজিতের গল্পধারায় মূল্যবান সংযোজন। প্রদোষ সরকারের মৃত্যু হয়েছে ১৯৭১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর। গল্পের সূচনাকাল এই ঘটনার অল্পদিন পরে, অর্থাৎ নিতান্তই একালের ব্যাপার। প্রদোষের গবেষণার বিষয় ছিল মানুষের আয়ুবৃদ্ধি (আলডস

হাক্সলির উপন্যাসে আয়ুবৃদ্ধি নিয়ে গবেষণার কথা মনে পড়বে)। কিন্তু তাকে নিয়ে গল্প লেখা হয় নি—প্রদোষের মৃত্যুর পর সেই খাতা যার হাতে এলো, তার বন্ধু শশাঙ্কশেখর বোসকে নিয়ে গল্প। শশাঙ্কশেখরের পরিণাম অনেকটা আর্যশেখরের মতো—তবে এখানে মৃত্যু 'সান স্ট্রোকে'র মতো কোনো লৌকিক কারণে ঘটে নি, এখানে ফ্যান্টাসির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে—আয়ুবিবর্ধক ময়ূরকণ্ঠি জেলি প্রথমে ফুল, তারপর সাপের আকার ধারণ করেছে, আর সেই জেলিসর্পের শ্বাসরোধী ফাঁসে শশাঙ্কের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু ময়ূরকণ্ঠি জেলি তৈরি করা বা তার নানা রূপান্তর বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের জন্য প্রয়োজন হলেও শশাঙ্কের মৃত্যু ও সুইসাইড নোট মানব জীবনের অন্য একটি গভীরতর সত্যকে পরিস্ফুট করেছে—'আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী আমার বিবেক।' এই বিবেকের সঙ্গে যুদ্ধই শশাঙ্কের গল্পকে মানবরসপুষ্ট করে তুলেছে। বন্ধুর খাতা চুরি, বন্ধুর গবেষণার ফল নিজে ভোগ করার চেষ্টা, আর সেজন্য শুধু মিথ্যাভাষণ নয়, বন্ধু অমিতাভকে হত্যা—'দ্বন্দ্ব তো কেবল নিজের মনের সঙ্গে, বিবেকের সঙ্গে—আর তো কেউ জানবেও না, বুঝবেও না।' ফলে শশাঙ্ক বিবেককে বিসর্জন দিয়েছে—আর্যশেখর যাকে হয়তো বলতো মাধ্যাকর্ষণেরই ফল। আধুনিক মানুষ যে-কোনো অন্যায় কাজ করতে পারে, বুদ্ধিজীবী আবার সেই অন্যায় কাজের সমর্থনে তৈরি করতে পারে অজস্র যুক্তি—'আজকের দিনে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে গেলে সত্যিই কি ওই বস্তুটির (বিবেকের) কোনো প্রয়োজন আছে? গত কয়েক দশকের পৃথিবীর ইতিহাসে কতকগুলি প্রধান ঘটনা বিশ্লেষণ করলে কি এই সত্যটাই প্রমাণ হয় না যে, বিংশ শতাব্দীতে বিবেক জিনিস-টার কোনো মূল্য নেই? হিটলারকে আজ যারা নিন্দা করে, সাময়িক হলেও হিটলারের মতো প্রতিপত্তি তাদের ক'জনের ভাগ্যে জুটেছে? হিরোশিমার উপর আণবিক বোমা বর্ষণ করেও আমেরিকার সম্মানে কোনো হানি হয়েছে কি? আসলে আজকের দিনে বিজ্ঞানের প্রসারই যখন মানুষের মন থেকে পরলোক পরজন্ম ইত্যাদির চিন্তা মুছে ফেলে দিয়েছে, তখন বিবেক জিনিসটার সত্যিই আর কোন প্রয়োজন নেই।' বিবেক বিসর্জনের সঙ্গে কি লঞ্জিভিটি নিয়ে গবেষণার কোনো যোগ আছে? কিন্তু গবেষণায় সফল হলেও শশাঙ্কশেখরকে মরতে হয়েছে —ময়ূরকণ্ঠি জেলি হয়ে উঠেছে বিবেকের রূপক।

সবুজ মানুষ কি তাহলে বিবেকশূন্য মানুষের রূপক? দেশকালের কথা এখানেও এসেছে। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের ছাত্র নারায়ণ ভাণ্ডারকর একদা বিশ্বমৈত্রীর বাণীকে জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিল। সে বলতো 'যতদিন না জাতিবিদ্বেষের বিষ মানুষের মন থেকে দূর হচ্ছে ততদিন শান্তি আসবে না। আমার অধ্যাপক জীবনে সবটুকু আমি আমার ছাত্রদের মনে বিশ্বমৈত্রীর বীজ বপন করে কাটিয়ে দিতে চাই।' কিন্তু, অধ্যাপক ভাণ্ডারকর সুইডেনে উপসালা শহরে অনুষ্ঠিত দার্শনিক সম্মেলন থেকে ফিরে একেবারে অন্য মানুষ। ভাণ্ডারকরের সারা-

জীবনের বিশ্বাস-সংস্কার-সাধনা এখন মূল্যহীন—এখন তার মধ্যে মৈত্রীভাবনার পরিবর্তে বিভেদবুদ্ধি প্রবল, তবে তার নবলব্ধ চিন্তাধারাকে সে যতটা অভিনব মনে করেছে আসলে তা নয়। তার মুখে শুনি 'মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে সৌহার্দ্যে আর আমি বিশ্বাস করি না। দুর্বলের সঙ্গে সবলের, ধনীর সঙ্গে দরিদ্রের, মূর্খের সঙ্গে মনীষার সৌহার্দ্য হবে কী করে? আমরা মানবিকতা বলে একটা জিনিসে বিশ্বাস করি, যেটার আসলে কোনো ভিত্তিই নেই। ইকুয়েটর-এর মানুষের সঙ্গে মেরুর দেশের মানুষের মিল হবে কোত্থেকে? মঙ্গোলয়েড আর এরিয়ান-এর যা মিল, বা নর্ডিক ও পলিনেশিয়ানে যা মিল, বাঘে আর গরুতেও ঠিক ততখানি মিল। হেরেডিটি, এনভাইরনমেণ্ট ও অদৃষ্ট—এই তিনে মিলে মানুষে মানুষে যে প্রভেদের সৃষ্টি করে—সেখানে মৈত্রীর বুলি কোন্ কাজটা করতে পারে? কালো মানুষ নির্যাতিত হবে না? তাদের চেহারা দেখ নি, ফিজিওগনোমি লক্ষ্য করো নি? মানুষের চেয়ে বানরের সঙ্গেই যে তাদের মিলটা বেশি, সেটা লক্ষ্য করো নি?'—এই চিন্তাধারা থেকেই একালে ফ্যাসিজম্-এর জন্ম। মুসোলিনি হিটলারের বক্তব্যের সারাৎসার খুব সুন্দরভাবে এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। মানবিকতা বা মানবতাবোধ বিসর্জন দিতে পারলে বিবেকের আর প্রয়োজন হয় না। সবুজ রক্ত ফ্যাণ্টাসি হতে পারে, শয়তানের স্পর্শে স্বর্গোদ্যানে প্রাণের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে সবুজ রঙ পাংশুটে ভস্মের রঙে পরিণত হতে পারে। কিন্তু ভাণ্ডারকরের উক্তিকে উন্মাদের প্রলাপ মনে করার কারণ নেই—'আমার চোখ খুলে গেছে। আমার ছাত্ররা যাতে আমার পথে' চলতে পারে, এখন থেকে. সেটাই হবে আমার লক্ষ্য। আমি ওদের বুঝিয়ে দেব যে, আজকের দিনেও যে কথাটা সত্যি সেটা হল সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা—সারভাইভ্যাল অফ দি ফিটেস্ট। যারা -বল, তারা যদি তাদের শক্তি প্রকাশ করে দুর্বলদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে, তবেই জগতের মঙ্গল।'

ভাণ্ডারকরের আবির্ভাবে অবনীশের প্রিয় সবুজ ঘরের ক্যাকটাস ও অর্কিড মরে গেছে তাই নয়, আমাদের পরিবার জীবনেও নিত্য দেখছি সততা, সরলতা, স্বতঃস্ফূর্ততা ও অকৃত্রিমতা কিভাবে মানুষের হিংসা, লোভ আর কামনার স্পর্শে বিনষ্ট হচ্ছে। পিকুর ডায়রির পিকু বাস করে সরলতার শৈশবস্বর্গে, রবীন্দ্রনাথের ভাষা ধার করে বলতে পারি, "এই স্বর্গটি বড়ো মৃদু এবং অরক্ষিত। যদিও তাহা সুন্দর এবং সম্পূর্ণ বটে, কিন্তু পদ্মপত্রে শিশিরের মতো তাহা সদ্যঃপাতী।" কিন্তু শৈশবেই যদি স্বর্গভ্রষ্ট হতে হয় শিশুকে! একালে অনেকেই মনে করছেন, অথচ এটা মনে করার ব্যাপারও নয়—হেরেডিটি, এনভাইরনমেণ্ট, অদৃষ্ট কোনো কিছুই স্বর্গ রচনা বা স্বর্গরক্ষার অনুকূল নয়। শিশুর বোঝা-না-বোঝার জগতেও একালের প্রভাব অনুভব করা যায়—'কাল রাতত্তিরে খুব জোরসে বম ফাটলো বাবা বল্লো বম মা বোল্ল না না গুলি বোধহয় পুলিস-টুলিস বাবা বল্লো না বম আজকাল প্রায়ই দুম

দুম আওয়াজ হয় জালনা দিয়ে।' অন্যদিকে 'দাদা নেই পরসু কিমবা তরসু থেকেই নেই তা জানি না কোথায়। দাদা তো পলিটিস করে তাই হোপলেস বাবা খালি বলে আর মাও বলে।' সময়টা কোন সময় বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু শুধু বাইরের পরিবেশ নয়, পরিবার জীবনেও ভাঙন ধরেছে। অসুস্থ বৃদ্ধ দাদু পাখার দিকে তাকিয়ে একা শুয়ে থাকেন আর শিশু পুত্র পিকু ভাবে 'যদি এবার মা যদি যায় তাহলেই মুশকিল একবার কাল রাত্তিরে মা বল্লেন যে চলে যাবেন বাবাকে আমি তো দুপুরে ঘুমিয়েছিলাম তাই একটু জেগেছিলাম তাই চোখটা জোরসে বন্ধো করে তাই মা জানে পিকু তো ঘুমোচ্ছে আর বাবাও ভাবছিলেন তাই খুব জোরসে কথা বলছিলেন।' চিত্রনাট্যে প্রসঙ্গটি আরও বিশদ তাই ওরা ও স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত—মা সীমার সঙ্গে হিতেশকাকুর প্রণয়সম্পর্ক, বাবা রঞ্জনের প্রতিক্রিয়া, দাদু লোকনাথের সব জেনেও অসহায়ভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা—শিশু পিকুর শৈশবস্বর্গ ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। দাদুকে পিকু জানায়—'কাল রাত্তিরে মা আর বাবা ফাইটিং করছিল।...একবার মা বাবাকে বকছে, একবার বাবা মাকে বকছে, একবার মা বাবাকে বকছে, একবার বাবা মাকে বকছে। একবার আমার বিষয় বলল, আর একবার তোমার বিষয়ও বলল।...হ্যাঁ—ওল্ড ম্যান ওল্ড ম্যান বলছিল। আর তারপর সব ইংরিজিতে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে, আর আমি কিছু বুঝতে পারলাম না।' কিন্তু পিকু সত্যই কিছু বুঝতে পারেনি তা নয়। সীমা আর হিতেশের মধ্যে যখন কথা কাটাকাটি চলেছে 'মেজাজটা যে কলহের তাতে কোনো সন্দেহ নেই', তখন পিকু দরজায় কান দিয়ে কিছুক্ষণ শোনে, তারপর তারস্বরে চিৎকার করে ওঠে 'চোপ্'—সঙ্গে সঙ্গে ঝগড়া থেমে যায়। আর শেষে 'এবার কাছ থেকে দেখি পিকুর চোখ ছল-ছল।...পিকু মা-র ঘরের দিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিল।'

ভেঙে যাচ্ছে, সব কিছু ভেঙে যাচ্ছে। ছ'বছরের পিকু আর সাত বছরের (সম্পূর্ণ চিত্রনাট্যে পাঁচ বছরের) ডিঙ্গো দুজনেরই এয়ার গান আছে, যা দিয়ে পাখি মারা যায়। ডিঙ্গো আবার আমেরিকান কমিক্স-এর ভক্ত, সুপারম্যান তার আরাধ্য দেবতা। কিন্তু পিকু যেমন দাদুর কাছে মা-বাবার ফাইটিং-এর কথা না বলে পারে নি, ডিঙ্গোও তেমনি দাদুর কাছে জেঠুর দু-নম্বরি টাকা থাকার কথা বলেছে। শিশুরা কিছু বোঝে, না বোঝে না? বড়োদের জগতে যে সব ঘটনা ঘটে, শিশু তার কিছুটা বোঝে, কিছুটা বোঝে না। কিন্তু একদিকে আমেরিকান কমিকস্-সুপারম্যান, অন্যদিকে দু-নম্বরি টাকা সম্বন্ধে আবছা জ্ঞান একালের শিশুকে বেশিদিন শৈশব-স্বর্গে থাকতে দেয় না।

'শাখা-প্রশাখা : একটি চিত্রনাট্যের অংশ' (১৯৬৬) প্রথমে লেখা হয়। অনেক দিন পরে প্রকাশিত হয়েছে 'সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য শাখা-প্রশাখা' (এক্ষণ ১৯৯১)। কিছু তফাৎ আছে, তবু মূল ভাবনাটা একই। সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য লেখার অনেক আগেই

সম্পূর্ণ কাহিনী, কাহিনী না বলে বক্তব্য বলাই ভালো, সত্যজিতের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে একটি সাক্ষাৎকারে (২১.৮.৮১) সত্যজিৎ খুব স্পষ্টভাবে শাখা-প্রশাখার বক্তব্য ব্যাখ্যা করেছেন—

> ভারতে দুর্নীতি কেবলই মাথা তুলছে—আর সব থেকে খারাপ ব্যাপার, লোকে সেটাতে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। যেহেতু গোটা দেশ দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে, কেউ আর দুর্নীতির জন্যে অনুতাপ করে না। তাদের নানা অজুহাত আছে—ট্যাক্সের বোঝা, ভালোভাবে বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি।…
>
> আপনার ছবি তাহলে জনসাধারণকে একরকম সতর্কীকরণ? হ্যাঁ, ঐ অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা ভেঙে দেওয়া—অর্থাৎ অসাধুতাকে লঘু করে দেখিয়ে তাকে কম অসাধু প্রমাণ করার চেষ্টা না করা। সোজাসুজি বলতে গেলে 'শাখা-প্রশাখা' আমার সব থেকে নৈরাশ্যবাদী ছবি, কারণ এতে দেখানো আছে রাস্কেলরাই এখন জীবনে সাফল্য লাভ করছে।…যদি আমাকে তাঁর [কুবোসাওয়ার] থেকে এখানে কম আশাবাদী মনে হয় তার কারণ হবে আমার ছবির বাচ্চা ছেলেটি, যার নাম ডিঙ্গো—যে তার বাবার কু-প্রভাব এড়াতে পারবে না। আজকের ছোটরা হযত টেলিভিশন ইত্যাদির দৌলতে আমাদের ঐ বয়সের তুলনায় বেশি বুদ্ধিমান। কিন্তু তারা কি আগেকার নৈতিক মূল্যবোধ বজায় রাখতে পারবে?

এ অবস্থায় পিকুর দাদুর মতো ডিঙ্গোর দাদুও সম্ভবত নিঃসঙ্গ মৃত্যুবরণ কাম্য বিবেচনা করেছেন। আনন্দনগরের প্রতিষ্ঠাতা আনন্দ মজুমদার পরিশ্রম ও সততার সাহায্যে বড়ো হয়েছেন, তাঁর কাছে **Work is worship** এবং **Honesty is the best Policy**—সম্ভবত এ সব হলো সে-কালের আদর্শ। তাঁর তিন ছেলে 'মানুষ' হয়েছে, অন্তত সমাজের চোখে, যে-সমাজে 'দু-নম্বরি ছাড়া—আজকাল আর কেউ মাথা উঁচু করে চলতে পারে না—**Impossible**! যারা **honest** থাকতে চায় তারা রসাতলে তলিয়ে যাবে—**They will Perish**!—তুমি একটা বড় কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার, আমি একজন ব্যবসাদার—আসলে কিন্তু দুজনের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই—দুজনেই দু-নম্বরির জোরে ফুটানি করে বেড়াচ্ছি।' নীতিবোধ বিবেকবোধ বিসর্জন দিয়ে প্রবীর প্রবোধ উন্নতি করেছে। ছোটভাই প্রতাপ এই জীবনেই অভ্যস্ত ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর সহ্য করতে না পেরে চাকরি ছেড়েছে—'চাকরি জীবনে আজকের দিনের **Values ethics**—যাই বল, সেটা আমি মানতে পারলাম না। দু-নম্বরি যে মানুষকে কোথায় নিয়ে যায় সেটা আমি দেখেছি, সেটা আমার চোখ খুলে দিয়েছে—আমি ওর মধ্যে নেই। কোনো আপিসের চাকরিতে আমি নেই—কোনো ব্যবসার ধান্ধাতে আমি নেই—আমি

জুড়িগাড়ি হাঁকাতে চাই না।' দুর্নীতি থেকে যথাসম্ভব দূরে থেকে, আমি সাধারণভাবে বাঁচতে চাই।' কিন্তু এটা প্রবীর প্রবোধ রমেনের যুগ; রমেনের ভাষায় 'তুই অ্যাদ্দিনেও বুঝলি না হাল বদলে গেছে; হাওয়া বদলে গেছে? —তোর বাপের আদর্শ আর আজকের দিনে চলে না? আমরা যেটা করছি সেটাই আজকের নীতি, আজকের রীতি—তুই যদি এটা মানতে না পারিস তাহলে এ লাইন ছেড়ে চলে যা—কারণ এ লাইনে তোর ভবিষ্যৎ নেই।' জীবনে 'সাফল্য' চাই, আর সাফল্যের জন্য একালের মানুষ যে কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত। দু-নম্বরি ব্যাপারটা কিছু নয়—'এই নিয়ে কেউ প্রবোধ মজুমদারকে ছ্যা ছ্যা করবে না। কিন্তু তিনটের জায়গায় যদি একটা গাড়ি হয়, কিংবা Scotch-এর জায়গায় যদি দেশি Whisky দিতে হয়, তাহলে করবে।'—'সততা বলে কি তাহলে আর কিছুই নেই?'—'যে অর্থে বাবা সৎ ছিলেন সে অর্থে নেই। কথাটা শুনতে খারাপ লাগবে মেনে নিতে কষ্ট হবে—কিন্তু Just নেই।'

প্রশান্ত (চিত্রনাট্যের প্রথম পাঠে প্রবোধ) অসুস্থ বা অপ্রকৃতিস্থ বলেই সৎ থাকতে পেরেছে, আর প্রতাপ (চিত্রনাট্যের প্রথম পাঠে প্রদ্যুম্ন) সত্যজিতের ভাষায় 'কিছুটা নৈতিক শক্তির প্রমাণ রাখলেও কোনো রকম লড়াই করে না—সে পালিয়ে যায়। সে তার জীবিকা বদল করে অভিনেতা হয়।' প্রবোধ (প্রতুল), প্রবীর (প্রতাপ) বাবার অসুস্থতায় চিন্তিত, কিন্তু সে চিন্তা কতটা বাবার জন্য, আর কতটা নিজেদের কাজকর্মের ক্ষতি করে আনন্দনগরে থাকার জন্য তা বলা মুশকিল। প্রবীর তো বাবার সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ পাওয়ার জন্য মনে মনে বাবার মৃত্যু কামনা করছে। এই অবস্থায় আনন্দ মজুমদারের সাফল্যেরই কি কোনো মূল্য আছে? তিনি যখন ছেলেদের দু-নম্বরি কাজ-কারবারের কথা শোনেন—'আনন্দর মধ্যে চূড়ান্ত হতাশা। তাঁর চোখে জল। তিনি বিলাপ করছেন।' এছাড়া আর কী-ই বা করা সম্ভব! পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্যের শেষে অপ্রকৃতিস্থ প্রসান্তর হাতটা টেনে বুকের উপর রেখে আনন্দ যখন বলে ওঠেন 'শান্তি! শান্তি! শান্তি!' তখন তাই তাকে স্বস্তিবাচন হিসাবে গ্রহণ করতে পারি না। আনন্দর বেঁচে থাকার মধ্যে আর কি কোনো শান্তি আছে! আনন্দর তথা কাহিনীর পরিণতি তার আগেই সম্পূর্ণ হয়েছে। অন্যদিকে চিত্রনাট্যের প্রাথমিক অসম্পূর্ণ পাঠে শেষ কয়েকটি পংক্তি এক হিসাবে আরও তাৎপর্যপূর্ণ।—

প্রতুল প্রতাপ ও প্রদ্যুম্ন ব্যগ্রভাবে আনন্দমোহনের দিকে চেয়ে আছে। কী বলতে চান আনন্দমোহন। অবশেষে বাক্য উচ্চারিত হয়।

আনন্দ অ্যা…অ্যাতো…আ…আনন্…

আর বলতে পারেন না। তাঁর ঠোঁটের কোণে হাসিটি লেগে থাকে। বাইরে বাগানে ডিঙ্গোর বন্দুক গর্জিয়ে ওঠে—পটাং!

সব কিছুর পিছনে রূপক বা সংকেতের সন্ধান সবসময় কার্যকর নয়। কিন্তু আনন্দ মজুমদারের আনন্দের জগৎ যে বন্দুকের আওয়াজে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় এমন মনে করলে অন্যায় হবে না।

শুধু উনিশ শতকের উত্তরাধিকার বহন নয়, একজন বড়ো লেখক জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে কতকগুলি মূল্যবোধ রক্ষা করে চলেন। একে মানবিক মূল্যবোধ বলতে পারি। নৈতিক অধঃপতনের যুগে মানবিক মূল্যবোধ রক্ষা করা কঠিন। শিল্প পৃথিবীকে বাঁচাতে পারে এমন কোনো অযৌক্তিক ধারণা সত্যজিৎ পোষণ করতেন না। কিন্তু তবু শিল্পীকে সৃষ্টি করতে হয় শিল্প, এবং সেই শিল্পের শেষ কথা হবে (তাঁর ভাষায়) 'চারিত্রশক্তির অবক্ষয়কে আমি ভয়ংকর বিকার মনে করি।' এই অবক্ষয়ের পটেই তিনি স্থাপন করেছেন প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য লেখা তাঁর কয়েকটি গল্পের কাহিনী ও চরিত্র—প্রশ্ন তুলেছেন, প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, এবং সেই জীবনবোধই তাঁর গল্প ও চিত্রনাট্যকে সাময়িক পাঠক বা দর্শকের মনোরঞ্জনের প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির দাবি পূর্ণ করেছে।

ধ্রুব গুপ্ত

প্রাপ্তবয়স্কের জন্য লেখা দুটি গল্প

আমাদের সমাজ জীবনে আজকাল আনুষ্ঠানিকতা একটা মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব পেয়ে যাচ্ছে। পুরস্কারপ্রাপ্তি এবং জন্ম ও মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যে ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হচ্ছে তাতে পুরস্কারপ্রাপকের বা জাতক বা প্রয়াতের নামটি একটি পূজনীয় মূর্তির চরিত্রপ্রাপ্ত হচ্ছে, এমন কি তার নামে গেঞ্জির বিজ্ঞাপনও দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তার আসল কাজের মূল্যটা সেখানে গৌণ হয়ে যাচ্ছে। খুব বিপজ্জনকভাবে ব্যাপারটা "তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ" হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সম্প্রতি সত্যজিৎ রায়কে ঘিরে-ও সেই রকম একটি "বাতাবরণ" সৃষ্টি হয়েছে।

ফলে যা হয় তা হল যে ব্যক্তির কীর্তির যথার্থ অনুধাবন ক্ষেত্রে নানাধরণের অসুবিধা সৃষ্টি। দেখা দেয় তাকে হয় দেব, না হয় দানব বানাবার প্রবণতা। দেব বানাতে যারা চান এ রকম আবহাওয়াটা তাদের পক্ষে খুবই অনুকূল হয়। দানব প্রতিপন্ন করতে যারা চান তাদের হয়ত একটু অপেক্ষা করতে হয়, উত্তেজনা প্রশমনের জন্য। কীর্তির সযত্ন আলোচনার প্রচেষ্টাতেও নানা ধন্দের সৃষ্টি হয়। সম্প্রতি একজন লেখক চারুর সাহিত্য সম্পৃক্তি ক্ষেত্রে 'ডিরোজিও-প্রাবল্যে'র কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে বলেন সত্যজিৎ 'গবেষণা'য় (গবেষণা কথাটিকেও সত্যজিৎ-এর মৃত্যু উপলক্ষে একাধিকবার অত্যন্ত অসঙ্গতভাবে প্রয়োগ করতে দেখা গেছে, যার ফলে কথাটির গুরুত্ব হ্রাস পাবে)। এ পর্যন্ত নাকি ইতিহাস ও সমাজ প্রসঙ্গকে অবহেলা করার শৈথিল্যে পীড়িত হয়ে তিনি এই মহৎ কাজে অবতীর্ণ হয়েছেন। ১৯৬৪ সাল থেকে আরম্ভ করে একাধিক লেখাতে বহু ব্যক্তি 'চারুলতা'তে 'বেঙ্গল রেনেসাঁস' প্রসঙ্গ নিয়ে একাধিকবার আলোচনা করেছেন বহু জায়গায়। আর চারুর ব্যক্তিত্ববিকাশ প্রসঙ্গে তা হলে কেবল 'ডিরোজিও প্রাবল্য' কেন, রামমোহন থেকে শুরু করে একাধিক ব্যক্তি প্রাবল্য থাকা উচিত এমন গবেষণাতে। রামমোহন ছবিতে বিশেষভাবে উপস্থাপিত, তাছাড়া ভূপতি সূত্রে এ ছবিতে যে মতাদর্শ ব্যাপ্ত হয়ে আছে তা 'লিবারালিজম', সেখানে ডিরোজিওকে ঘিরে বাড়াবাড়ির কোনো প্রয়োজন 'চারুলতা' ছবির অনুধাবনে আছে বলে মনে হয় না। অমলকে বিলেতে যাবার লোভ দেখাবার জন্য ভূপতির সংলাপে 'ইয়ং বেঙ্গল', 'দৃপ্ত পদক্ষেপ' কথাদুটি 'ডিরোজিও প্রাবল্যে'র পক্ষে তেমন উপযোগী সাক্ষ্য নয়। সবচেয়ে বড় কথা হল, রবীন্দ্রনাথের মূল গল্পে এবং সত্যজিতের ছবিতেও, চারুর সাহিত্য সম্পৃক্তির তার নিজস্ব তাগিদেই জন্ম, অমলের মাধ্যমে ভূপতি তাকে পুষ্ট

করার মতলব নেয় মাত্র—যে খবর জানবার সঙ্গে সঙ্গে চারুর অভিমান আহত হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর নারীজাগরণ প্রধানত পুরুষ পরিচালিত হবার দরুণ তার কী ধরণের অসম্পূর্ণতা ছিল এ নিয়ে অনেক যথার্থ-গবেষক অনেক আলোচনা করেছেন, কিন্তু সব নারীই যে Passive ছিল না (সত্যজিতের ছবির বিমলার মত, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নয়) তার ঐতিহাসিক প্রমাণও আজকাল মিলছে। চারুকে পুরোপুরি ডিরোজিও বা ভূপতি বা অমল চালিত করে ভাবলে তার মধ্যে সত্যজিতের তৈরী একটি অত্যন্ত উজ্জ্বল নারী প্রতিমা (Image of women)-কে কিঞ্চিৎ হেয় করা হয়। তাছাডা শিল্পকর্মে ইতিহাসের প্রতিফলনকেও সরলীকৃত যে করা উচিত নয়—এ প্রশ্নকে ঘিরেও অনেক গবেষণা হয়ে গেছে, সেখানে শুধু গল্পের সময়কাল নয়, কোন কালে ছবিটি তৈরী হচ্ছে, তখন তার মানসিকতা-মতাদর্শ ইতিহাসকে "ব্যবহার" করতে কীভাবে প্রণোদিত করছে এসবও ভাবতে হবে 'চারুলতা'কে শুধু উনবিংশ শতাব্দীর প্রতিচ্ছবি (তারিখ নিয়ে ছবিতে সত্যজিতের একটা ছোট্ট ভুল আছে—ছবির কাল ১৮৭৯-৮০, কিন্তু অমলকে ঐ লোভ দেখাবার সময়ই ভূপতি বলছে, শতাব্দীর last decade) হিসেবে তো আমরা নিতে পারি না।

'চারুলতা' নিয়ে এত কথা বলাকে হযত অনেকে 'ধান ভানতে শিবের গীত' বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু 'চারুলতা' শুধু একটি মহৎ ছবিই নয়, এটি সত্যজিতের নিজের সাহিত্য-সম্পৃক্ত প্রসঙ্গের আলোচনা ক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় সৃষ্টি। নকল নয়, কী করে সাহিত্যের শিক্ষাগ্রহণ করে নিজস্ব সৃষ্টিকর্মে সমৃদ্ধ হওযা যায়, সে ক্ষেত্রে 'চারুলতা' বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন ধরুন চারুর সাহিত্যাকর্ষণ প্রসঙ্গেই আবার ফিরে আসছি। মূল গল্পে দেখি, "লেখাপডার দিকে চারুলতার একটি স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল বলিয়া তাহার দিনগুলি অত্যন্ত বোঝা হইয়া উঠে নাই। সে নিজের চেষ্টায় নানা কৌশলে পডিবার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল।" তার পর আছে নানা কৌশলে নিজের উদ্যোগে অমলকে দিয়ে বই যোগাড করত চারু নিজে, এবং অমলের কাছ থেকে পড়া বলিযে নিত। সত্যজিতের ছবিতে গোডাতেই যে চারু "বঙ্কিম বঙ্কিম" স্বরে ভাঁজে, এবং স্বামীকে প্রশ্ন ছুঁডে দেয় "তুমি স্বর্ণলতা পডেছ ?"—সে হল ঐ লেখাপডার প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁক বিশিষ্ট চারু, যে চারু সেই ঝোঁকের জন্যই অমলের সঙ্গে "নবীনা" হিসাবে সাহিত্যবিষয়ক তর্কে রত হত। গল্পে ও ছবিতে এসব প্রসঙ্গ নজর না করে শুধু ভূপতির মুখের 'ইয়ং বেঙ্গল' নির্ভর করে 'চারুলতা'য় ডিরোজিও প্রাবল্য প্রতিষ্ঠা খুব একটা শিল্পচেতনা বা ইতিহাস চেতনার পরিচয় দেয় না।

সত্যিই বোধ হয 'ধান ভানতে শিবের গীত' গাওযা হয়ে যাচ্ছে, কেননা এ প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য 'চারুলতা' ছবির আলোচনা নয়; 'চারুলতা'র সাহিত্য সম্পৃক্তিকে এখানে শুধু প্রেক্ষিত হিসাবে রাখা হল সত্যজিতের সামগ্রিক সাহিত্য-

সম্পৃক্তির এবং সে সম্পৃক্তি শুধু সাহিত্য থেকে রসদ নিয়ে ছবি করা, ছবির মধ্যে সাহিত্যের 'ব্যাখ্যা' বা 'সমালোচনা' করার মধ্যেই আবদ্ধ নয়, সে সম্পৃক্তির একটা উল্লেখযোগ্য ফসল সত্যজিতের নিজের সাহিত্যরচনা। কিশোর সাহিত্যে তার স্থান, যেখানে তার পারিবারিক উত্তরাধিকার, এসব নিয়ে বিশেষজ্ঞরা আলোচনা করেছেন, করবেন। আমি শুধু তাঁর দুটি বড়দের জন্য লেখার প্রতি এখানে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ইচ্ছুক।

"পিকুর ডায়রী" গল্পটি লেখা হয় আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয় সংখ্যার জন্য রমাপদ চৌধুরীর অনুরোধে। অনুরূপ কারণে লেখা হয়েছিল "আর্যশেখরের জন্ম ও মৃত্যু" মনীন্দ্র রায়ের অনুরোধে। নিজের আত্মপ্রকাশের তাগিদে লেখা এবং ফরমাসের লেখার মধ্যে একটা পার্থক্যের সম্ভাবনা থেকে যায়, এবং ফরমাসে লেখা যদি ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয় তবে সম্ভাবনা আরো প্রবল হতে পারে। সত্যজিতের কিশোরদের জন্য শেষদিকের লেখায় সে সম্ভাবনাকে মাঝে মাঝে সত্যে পরিণত হতে দেখা গেছে। কিন্তু অন্যের অনুরোধে লেখা হলেও প্রাপ্তবয়স্কের জন্য লেখা এই দুটি রচনার সাহিত্যিক গুণ অনস্বীকার্য।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 'পোনুর চিঠি' নামে যে অনবদ্য রচনাটি সম্ভব করেছিলেন, 'পিকুর ডায়রী' পড়তে গিয়ে তার কথা মনে পড়তে পারে একটি বিশেষ কারণে। দুটি রচনাতেই বয়স্কের জগৎকে শিশুর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে কেমন দেখায় সেটি বয়স্ক লেখকের কল্পনাতে ধরা পড়েছে। অবশ্যই সে কল্পনার মধ্যে সেই বয়স্ক লেখক যখন ছোট ছিলেন তার তখনকার অভিজ্ঞতা (সরাসরিভাবে না হলেও) তখনকার মানসিকতার স্মৃতি মিশে থাকতে পারে। দুটি গল্পের পার্থক্যও আছে। 'পোনুর চিঠি'র ব্যাপ্তি সত্যজিতের রচনাটিতে নেই। 'পোনুর চিঠি'র হিউমার সত্যজিতের ছোট লেখাটির হিউমারের মত তিক্ত নয়। তবু মিল আছে ভাষার স্বেচ্ছাকৃত বিকৃতির মাধ্যমে উত্তমপুরুষ একবচনীয় বর্ণনায় শিশুর মনটিকে ধরবার ক্ষেত্রে। ভাষাকে দুই লেখক শিশুর দৃষ্টিকোণ বোঝাতে কীভাবে প্রয়োগ করেছেন দেখা যাক। বিভূতিভূষণের পোনু ভগবানকে চিঠি লিখছে (ঠিকানা : পুরীধাম) "ভগবান, বেটাছেলেদের বিয়ে হয় বিয়ে পাশ করলে, চাকরি করলে আর বকাটে হয়ে গেলে। ···মেয়েদের বিয়ে হয় ধিংগি হয়ে উঠলে। নলিত ঘোষের ছেলে পনচানন বকাটে মেরে গেছল আর বোমপাড়ার নাটু বোসেদের মেয়ে মালোতি ধিংগি হয়ে উঠেছিল তাই গেলো রোববার শুবো লগনে ওদের দুজনের বিয়ে হোয়ে গেল। ···তুমি তো হাওয়ার মতন সব্বোত্রো যেতে পার। আমাদের চোন্ডিমোনডোপে সোনদের সময় একবারটি এসো না মাচির রুপ ধরে সব শুনবে।" সত্যজিতের পিকু অনেক বেশি 'আর্বানাইজড্'। তার জগৎ ঠিক 'চোন্ডি-মোনডোপ'কে ঘিরে নয়, হাল আমলের কলকাতার। সে 'টিসট' ঘড়িকে যে টিসো বলতে হয় তা তার 'হিতেসকাকু'র কাছে শোনে, সে পেরি লুইস দেখে মন্তব্য

করতে পারে যে তার মা বাবার সঙ্গে ঝগড়া করার সময় খুব তাড়াতাড়ি কথা বলে "ঠিক সিনেমার মত"। সে অবশ্য ভগবানকে চিঠি লেখে না 'ডাইরি' লেখে। সেটা কেউ দেখতে পারে না, কারণ "ডাইরি দাদু বলেছে যে কেউ কাউকেই দেখাবে না খালি নিজে লেখে আর পড়ে খালি নিজেই আর কেউ না।" একটি যতিচিহ্নহীন বাক্যে পিকু বাবা-মা-হিতেসকাকুর সম্পর্কের ব্যাপারটা তার মত করে লিপিবদ্ধ করছে দেখি, "টেলিফোন একটু আগেই কিরিং কিরিং কিরিং হল আর আমি দৌড়ে এলাম আর এসে হ্যাল বল্লাম ওমা দেখি বাবা বাবা বল্লেন কে পিকু আমি বল্লাম হ্যা আমি বাবা বল্লেন মা হিতেসকাকুর সঙ্গে সিনেমা বড়দের যেটা সিনেমা সেটা দেখতে গেছে তাই মা নেই বাবা বল্লেন ও বলে তড়াক করে ফোনটা রেখে দিলেন আমি আওজ পেলাম।" বানানের স্বাধীনতা নিয়ে পিকুর দৃষ্টিকোণ থেকে বয়স্কের জগৎ, যার অবোধ্য নিষ্ঠুরতার তাপ তাকে বোধ করতে হচ্ছে—সে জগৎকে এই ভাবে ধরা হয়েছে, "কিন্তু পারটি তেতো ঝগড়াই না তাই পারটি ভালো পারটিতে খালি ভূৎ আর একদিন একজন বমি করল মা বল্ল অসুক আমাকে কিন্তু ওমুকুল বলেছে মদ তাই।" এইভাবে পিকু তার না বোঝা বা একটু বোঝার তুনিয়াটাকে ধরে তার দিন-পঞ্জীতে। দাদুও তার ডায়রি লেখে, যার 'অসুক'টার নাম যে 'করোনানি থমবোসি' তাও সে জেনে ফেলেছে। গল্পে দাদুর মৃত্যুর কোনো নির্দিষ্ট উপস্থাপনা নেই, সেখানেও শিশুর চোখে দেখা একটা অনির্দিষ্টতা লিপিবদ্ধ : "গিয়ে দেখি চুপচাপ দাদু শুয়ে আছে আর কিন্তু ঘুমোচ্ছে না তাই বল্লাম দাদু কি বেপার কিন্তু দাদু কিন্তু কিছু বল্লনা খালি উপরের দিকেই দেখছে পাখাটার।"

'পিকু' ছবিতে শিশুর দৃষ্টিকোণ পরিত্যাগ করে একটি সাধারণ ন্যারেটারের (তৃতীয় পক্ষ) দৃষ্টিকোণ নেওয়াতে ছবিটির প্রকৃতিও বদলে গেছে, বিষয়বস্তু এক হলেও। এবং ছবিটি এমনভাবেই প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য হয়ে গেছে যে 'ফঠিকচাঁদ'-এর সঙ্গে এর একত্রে প্রদর্শন রীতিমত অস্বস্তির সৃষ্টি করেছিল। ছবিটির আলোচনা এখানে উদ্দেশ্য নয়, ছবিটির প্রথম দৃশ্যটি অর্থাৎ শোবার ঘরে স্বামী-স্ত্রী ও কথোপ-কথনের মধ্যে দিয়ে স্বামীর স্ত্রীর পরপুরুষ আসক্তির ব্যাপারটি জেনে যাওয়ার চিত্রণ অপ্রয়োজনীয় মনে হয়, বাবাকে অফিসে 'টা-টা' করা থেকেই ছবি শুরু হতে পারত। মোট কথা, পিকুর দৃষ্টিভঙ্গি (আংশিকভাবে আছে, যেমন যে কোনো ছবিতেই বিভিন্ন চরিত্রের পক্ষ থেকে সাধারণত থাকে)-র বিশেষ ধরণের প্রয়োগটি বাদ যাওয়াতে ছবির জাত আলাদা হয়ে গেছে। গল্পের ঘনসংবদ্ধতা ছবিতে অতটা বজায় থাকে নি।

কাহিনীকালের ব্যাপ্তি থাকলেও গঠনে ঘনসংবদ্ধতা রয়েছে 'আর্যশেখরের জন্ম ও মৃত্যু' গল্পটিতে। সৃষ্টিছাড়া "চাইল্ড্ প্রডিজি" আর্যশেখরের অসাধারণ জ্ঞান-

পিপাসার বিষয়টি সত্যজিৎ অনেক আপাতনিঃস্পৃহ নিরপেক্ষ সাংবাদিকের মত লিপিবদ্ধ করে চলেন, তারপর দেখা যায় তার বাবা যখন তার গাণিতিক প্রতিভাকে বাজারে পণ্য করে সংসারে অতিরিক্ত আয়ের পথ ('শাখা-প্রশাখা'র "দুনম্বরি") করতে চান তখন সেই ঘটনাকে অবলম্বন করে আর্যশেখর হেরিডিটি ও প্রজনন তত্ত্ব নিয়ে ভাবনা শুরু করে একদিন পিতাকে ঘাবড়ে দেয় সে তার জারজ সন্তান কিনা এই প্রশ্ন করে, তখন তার বয়স চোদ্দ/পনের। এরপর ক্রমাগত "অপ্রকৃতিস্থতা" একটা সমাজের পক্ষে অস্বস্তিকর পর্বে পৌঁছে যাচ্ছে তার একান্ত নিজস্ব "ব্যক্তিগত ধর্ম"কে কেন্দ্র করে বয়স্ক আর্যশেখর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নিয়ে মৌল প্রবন্ধ লিখে বাইরে সম্মান অর্জন করছেন, ঘরে সম্পূর্ণ একাকী, পাগল। এক আমেরিকান ভক্ত পাঠকের কাছ থেকে পাওয়া চারচৌকা চিনির ডেলা একদিন তিনি খেলেন মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে পরাস্ত করার উদ্দেশ্যে। তারপর তার যে অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা হল, তাকে সত্যজিৎ ভাষায় এইভাবে প্রকাশ করেছেন : "কয়েক ঘণ্টা কিছুই হল না। তারপর এক সময়ে আর্যশেখর অনুভব করলেন তিনি সূর্যের দিকে উত্থিত হচ্ছেন। এক অনির্বচনীয় মাদকতায় তাঁর দেহমন আচ্ছন্ন হল। নীচের দিকে চেয়ে দেখলেন ধূলি-ধূম্র-ধূসর কলকাতা শহরকে তেহেরানের গালিচার মত বর্ণাঢ্য ও মনোরম দেখাচ্ছে। মাথার উপরের আকাশ সর্পিল গতিবিশিষ্ট অজস্র বিচিত্র বর্ণখণ্ডে সমাকীর্ণ। আর্যশেখর বুঝলেন সেগুলো ঘুড়ি, কিন্তু এমন ঘুড়ি তিনি কখনো দেখেন নি। একটি বর্ণখণ্ড তাঁর দিকে এগিয়ে এলো। আর্যশেখর পরম আত্মীয়বোধে বাহু সম্প্রসারিত করে সেই বর্ণখণ্ডের দিকে নিজেকে নিক্ষেপ করলেন। তারপর তাঁর আর কিছু মনে নেই।" —এর মধ্যে হয়ত অনেকে শঙ্কু-কেন্দ্রিক কল্পবিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের ভাষার সাধর্ম্য দেখতে পাবেন। কথা হল এই যে যুক্তব্যঞ্জনের সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে সত্যজিৎ তার গদ্যময়তার মাঝখানে অকস্মাৎ এখানে যেভাবে ভাষায় কাব্যসৃষ্টি করেন তাতে মনে হয় তিনি আরো থিতিয়ে এ দিকে অগ্রসর হলে তার কাছ থেকে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য কিছু ভাল লেখা হয়ত পাওয়া যেত।

এরপর কাহিনী দ্রুতবেগে পরিসমাপ্তির দিকে যায়। আমরা দেখি সংসারের সম্পূর্ণ বহির্ভূত উন্মাদ আর্যশেখর প্রবল তাপকে অগ্রাহ্য করে বাবলা গাছের তলায় ঘুরে ঘুরে বাবুই পাখীর বাসা বাঁধার রহস্য উদ্ঘাটনে রত। সানস্ট্রোকে তার মৃত্যু হবার আগে যে আর্যশেখরের 'প্রায় বাক্‌রোধ হয়েছিল সেই দুনিয়াছাড়া' বৈজ্ঞানিক এত অনুসন্ধিৎসার পর "শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার ঠিক আগে একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন··· —মাগো !" গল্পে এইরকমভাবে উপসংহার টেনে অকস্মাৎ সত্যজিৎ একটি অবর্ণনীয় অনুভূতির সঞ্চার করেন—মৃত্যুর সম্মুখীন মানুষের একটি গভীরতামণ্ডিত ছবি এতে তৈরি হয়।

বড়দের জন্য এরকম আরো কিছু লিখলে হয়ত আমরা শুধু তার ক্যামেরা নয়, কলম থেকেও আরো কিছু পেতে পারতাম।

তার ক্যামেরার কাজের ও কলমের কাজের সঙ্গে সম্পৃক্তি প্রসঙ্গে একটি কৌতুকাবহ খবর দিয়ে লেখাটি শেষ করি। সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্রের 'স্বাধীনতা'-প্রাপ্তির একটি নিদর্শন হিসাবে একজন প্রাবন্ধিককে এ ছবির 'নষ্টনীড়'-এর পরিবর্তে 'চারুলতা' নামের সজ্ঞান নির্বাচন হিসাবে নির্দেশ করতে দেখেছি। প্রকৃতপক্ষে সত্যজিৎ 'নষ্টনীড়' নামটি ব্যবহার করতে পারেন নি ঐ নামে বছর কয়েক আগে পশুপতি চট্টোপাধ্যায় একটি ছবি তৈরি করেন বলে। সেই ক্ষোভ মেটাবার জন্যই যেন সত্যজিৎ 'চারুলতা' ছবির শেষ হিসাবে 'সমাপ্ত' কথাটার পরিবর্তে 'নষ্টনীড়' শব্দটি আমাদের দিকে ছুঁড়ে দেন। এটাই বাস্তব কথা—এর পেছনে সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের সম্পর্ক বিষয়ে গভীর কোনো তত্ত্বের স্থান নেই।

ক্ষেত্র গুপ্ত

বাস্তবে মুক্তি, অবাস্তবের বাস্তবতা : সত্যজিতের গল্প

অসমঞ্জের কুকুর ফিকফিক হাসে, কলের মানুষ অনুকূলকে তুই বললে খেপে যায়, নিজের চেহারার মানুষটাকে খুন না করা পর্যন্ত শান্তি নেই রতনবাবুর, অকারণে একটা গোখরো মারার পাপে ধূর্জটি মানুষের খোলসটা ফেলে রেখে সাপ হয়ে গর্তে ঢুকতে বাধ্য হয়, ভিন্নগ্রহ থেকে উড়ে এসে একজন অ্যাং বঙ্কুবাবুকে আত্মমর্যাদায় দীক্ষা দিয়ে যায়, যাদুকরের ভেন্ট্রিলোকুইজ্‌ম-এর পুতুল হার্ট-অ্যাটাকে মারা পড়ে। ˘

সত্যজিতের গল্পের এই আশ্চর্য জগৎকে ছেলেভুলানো রূপকথা বলা যাবে না, শুধুই আজগুবি বলে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। এ-সবের মধ্য থেকে জীবন, সমাজ ও প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু নিগূঢ় সত্য, একটু সতর্ক সাহিত্য-পাঠক অনুভব না করে পারে না।

পাশাপাশি সত্যজিতের গল্পে জীবনের অতি পরিচিত সমতল পোর্ট্রেট শিল্পী-দের নানা কথা, ধনী-দরিদ্র সফল-ব্যর্থ দুই বন্ধুকে নিয়ে বিচিত্র ঘটনা, ফিল্মে একস্ট্রার ভূমিকা নিয়ে অভিজ্ঞতা। সাঁওতাল পরগনায় পুজোর ছুটিতে মিথ্যে গল্প ফেঁদে আশি বছরের বুড়ো ঠকিয়ে দিল সবাইকে, ছোট বেলার শয়তানির প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দিল নিতাইবাবু, লোড শেডিংয়ের মহিমায় ভদ্রলোকও চোর হয়ে গেল।

সত্যজিতের গল্পের আর এক দিক—সোজাসুজি মানুষের কাজ আর মনের বিবরণ। সেখানেও কিন্তু, সেরা গল্পগুলো তো বটেই বাস্তবের বন্ধনে হাঁপিয়ে ওঠে, মুক্তি পেতে চায়, কখনো পেয়েও যায়।

তাঁর গল্পে প্রায়ই বাস্তব-অবাস্তবের সীমানা বিরোধ নেই।

২

প্রায় তিরিশ বছর তিনি গল্প লিখেছেন। শুরু ছয়ের দশকে, তাঁর বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গিয়েছে। চলচ্চিত্রকার হিসেবে ব্যাপক প্রতিষ্ঠা এর মধ্যেই ঘটেছে।

তাঁর ছোট গল্পগুলি 'এক ডজন গল্প', 'আরো এক ডজন', 'আরো বারো', 'এবারো বারো', 'একের পিঠে দুই', 'তারিণী খুড়োর কীর্তিকলাপ', 'পিকুর ডায়রি

ও অন্যান্য' এবং 'সুজন হরবোলা' বইয়ে প্রকাশিত। যে-সব ফেলুদা কাহিনী এই বইগুলোতে ছাপা হয়েছে, সেগুলি এবং 'মাস্টার অংশুমান', নামের ছোট উপন্যাস জাতীয় লেখাটি বাদ দিলে এখানে ছোটগল্প আছে ৬৬টি। পরে আরও ৬-৭টি কাগজে ছাপা হয়েছে। আরও ২-৪টি অপ্রকাশিত থেকে যাওয়া সম্ভব। এতগুলি ছোটগল্প—সংখ্যাটি তুচ্ছ করার নয়।

৩৩টা ফেলুদা, শঙ্কু ৩৮টা, ছোট উপন্যাস 'ফটিক চাঁদ' এবং 'অংশুমান'।[১] গল্পের এই আয়োজনের বাইরেও তাঁর সাহিত্য-চর্চার কম বিস্তার নয়। গল্প এবং ছড়ার ভাষান্তর, স্মৃতিচারণা, শুটিংয়ের সরস বিবরণ, চলচ্চিত্র বিষয়ে চিন্তাসমৃদ্ধ প্রবন্ধ। নিজের গল্পের চিত্রনাট্য—যার অনেকগুলিই প্রকাশিত লেখার চেয়ে পৃথক। স্বাধীন চিত্রনাট্য, যেমন 'নায়ক'। অন্যের গল্পের চিত্রনাট্য—যার মধ্যে অনেক কিছু নিজস্ব ; কোনো কোনোটি একেবারেই নিজের মৌলিক লেখা, যেমন 'বাক্সবদল'। চলচ্চিত্রের জন্য লেখা গান। 'সন্দেশে' ছোটদের জন্য নানা ধরণের লেখা' যেমন 'গেরিলার বন্ধু'। তার উপরে সন্দেশ সম্পাদনা—রীতিমতো সম্পাদনা, শুধু নামে নয়। নলিনী দাশের প্রবন্ধ এবং আরও সব চিঠি, মন্তব্য ইত্যাদি তার প্রমাণ। দ্রষ্টব্য 'সন্দেশ' সত্যজিৎ স্মরণ সংখ্যা। এর একটা বড অংশ তাঁর চলচ্চিত্র-সংশ্লিষ্ট। তবুও মানতেই হবে তিনি সাহিত্যিক না হলে এ কাজগুলি নিজে এভাবে করতেন না এবং এগুলির উপরে চলচ্চিত্রকার রূপে তাঁর প্রতিষ্ঠা নির্ভরশীল নয়।

সব মিলে এটুকু তো বলাই যায় যে সাহিত্যচর্চা তাঁর প্রথম প্রেম নয়। এরূপ পরিস্থিতিতে তিনি গোটা ৭৫ ছোটগল্পই লিখেছেন—এ কম কথা নয়। পরশুরামের গল্পের সংখ্যা ৯০টি। রবীন্দ্রনাথের লিপিকা ২/৩ এবং 'সে'-র ১৬টি ধরে দেড়শ মতো। তারাশঙ্কর লিখেছিলেন ১৯০, মানিক ২২০ এবং বনফুল প্রায় ৬০০। সংখ্যা চূড়ান্ত কিছু না হলেও, অবহেলার যোগ্য নয়। ছোটগল্প লেখা সত্যজিতের ক্ষেত্রে একটা নৈমিত্তিক ব্যাপারই ছিল না, ছিল তাঁর সৃষ্টিমূলক কর্মকাণ্ডের একটি প্রধান প্রবণতা।

৩

সত্যজিতের ছোট গল্পগুলিকে বিষয় এবং স্বাদের দিক থেকে একটা মোটারকম ভাগ করা যাক। তাতে প্রাথমিকভাবে বোঝা যাবে ছোটগল্প লিখতে গিয়ে কোন্ কোন্ দিকে তাঁর প্রবণতা।

১। আমার 'সত্যজিতের সাহিত্য' (আগস্ট '৯২) বইয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

১। বাস্তব জীবনের কথা। বাস্তব জীবন তো সব গল্পেই আছে, কিন্তু যেখানে তা সোজাসুজি। লেখকের ভাষায় 'Straight forward tales'[২] :

বিপিন চৌধুরীর স্মৃতিভ্রম। শিবু আর রাক্ষসের কথা। পটলবাবু ফিল্ম স্টার। সদানন্দের খুদে জগৎ। ভক্ত। বাৱীন ভৌমিকের ব্যারাম। লোডশেডিং। সহদেববাবুর পোর্ট্রেট। ক্লাসফ্রেণ্ড। পিন্টুর দাদু। চিলে কোঠা। অতিথি। সাধনবাবুর সন্দেহ। মানপত্র। স্পটলাইট। ধাপ্পা। অপদার্থ। শেঠ গঙ্গারামের ধনদৌলত। টলিউডে তারিণী খুড়ো। পিকুর ডায়রি। আর্যশেখরের জন্ম ও মৃত্যু। লাখপতি। গণেশ মুৎসুদ্দির পোর্ট্রেট। নিতাই ও মহাপুরুষ। নিধিরামের ইচ্ছাপূরণ। জুটি। নিতাইবাবুর ময়না। শিল্পী। দুই বন্ধু।

২। আজগুবি ও অতিলৌকিক কল্পনার গল্প। লেখক যাদের বলেছেন 'tales of the fantastic and the Supernatural'.[৩] :

সেপ্টোপাসের খিদে। বঙ্কুবাবুর বন্ধু। দুই ম্যাজিসিয়ান। অনাথবাবুর ভয়। টেরোড্যাকটিলের ডিম। বাদুড় বিভীষিকা। নীল আতঙ্ক। প্রোফেসর হিজিবিজবিজ। ফ্রিৎস। ব্রাউন সাহেবের বাড়ি। রতনবাবু আর সেই লোকটা। খগম। বাতিকবাবু। অসমঞ্জবাবুর কুকুর। ভুতো। বৃহচ্চঞ্চু। অঙ্কস্যার গোলাপীবাবু আর টিপু। বহুরূপী। ডুমনিগড়ের মানুষখেকো। কনওয়ে ক্যাসলের প্রেতাত্মা। লখনৌর ডুয়েল। ধুমলগড়ের হান্টিং লজ। খেলোয়াড় তারিণী খুড়ো। তারিণীখুড়ো ও বেতাল। ময়ূরকণ্ঠী জেলি। সবুজ মানুষ। সুজন হরবোলা। গঙ্গারামের কপাল। রতন আর লক্ষ্মী। কানাইয়ের কথা। অনুকূল। টেলিফোন। আমি ভূত। কাগতাড়ুয়া। কুটুম কাটাম। রামধনের বাঁশী।

৩। অল্প কয়েকটি গল্পে অতিলৌকিকতা যে স্বপ্নদর্শন-ভ্রান্তিদর্শন কিংবা তৈরি করে ঠকানো ব্যাপার তা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে তবুও বাস্তব-অবাস্তবের দুটি মাত্রা সমান্তরাল। যেমন :

বিষফুল। মি. শাসমলের শেষ রাত্রি। ম্যাকেঞ্জি ফ্রুট। ফার্স্ট ক্লাস কামরা। গগন চৌধুরীর স্টুডিও।

লক্ষ্য করবার, প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্গের গল্প সংখ্যার দিক থেকে খুব কাছে।

তিন শ্রেণীর গল্প মিলিয়ে বিষয় বিশ্লেষণ করলে লেখকের মনের আরও কিছু আগ্রহের খবর পাওয়া যাবে। যেমন,

১। দুই বন্ধুকে নিয়ে গল্প। প্রায়ই এর একজন অর্থে-সম্মানে প্রতিষ্ঠিত,

---

২। 'পেঙ্গুইন বুকস' প্রকাশিত সত্যজিৎ রায়ের ইংরেজী 'স্টোরিস' (১৯৮৭) বইয়ের ভূমিকায় লেখকের কথা।

৩। ঐ।

অন্যজন নয়। কৈশোরের স্মৃতি এদের মধ্যে নানা মাত্রায় কাজ করেছে। গল্পগুলির দৃষ্টিকোণে সফল বন্ধুটিকে রাখা হয়েছে। বিপিন চৌধুরীর স্মৃতিভ্রম, ক্লাসফ্রেণ্ড, চিলে-কোঠা, ধাপ্পা, জুটি, দুইবন্ধু, লাখপতি। অনেকগুলিতেই ছা-পোষা সাধারণ বন্ধুটির প্রতি লেখকের সহানুভূতি। আর শুধুই বয়স্ক পাঠকের উপযোগী লেখা ময়ূরকণ্ঠী জেলিতে ব্যর্থ বন্ধুর মনোবিকার এবং পাপ গল্পের বিষয়।

২। সত্যজিতের চলচ্চিত্রে, ফেলুদা-সিরিজে নানা ধরণের বালক-কিশোরের চরিত্র আছে। ছোটগল্পে ও গুটি চারেক গল্পে ছোটদের চরিত্রই শুধু নয়, তাদের মনের জগতের কথা। গল্পগুলি তাদের মনে চোখ রেখেই পডতে হয়। শিবু আর রাক্ষসের কথা, ফ্রিৎস, সদানন্দের খুদে জগৎ, পিণ্টুর দাদু, অতিথি, অঙ্ক স্যার গোলাপীবাবু আর টিপু, শেঠ গঙ্গারামের ধনদৌলত, পিকুর ডায়রি। ছোট উপন্যাস 'মাস্টার অংশুমান' এবং অবশ্যই 'ফটিকচাঁদ' এর ভালো নিদর্শন। নানা রঙের খেলায় এদের মন একে অন্য থেকে স্বতন্ত্র, কিন্তু এরা সবাই বালক স্বভাবে একেবারে বাস্তব।

৩। ভূতের গল্প বলা যায় এমন গল্প অনেক। তার মধ্যে বৈচিত্র্য আছে রূপে-স্বাদে। অনাথবাবুর ভয়, বাদুড় বিভীষিকা, দুই ম্যাজিশিয়ান, নীল আতঙ্ক, ফ্রিৎস, ব্রাউন সাহেবের বাড়ি, রতনবাবু আর সেই লোকটা, মি. সাসমলের শেষ রাত্রি, ভূতো, গগন চৌধুরীর স্টুডিও, ফার্স্ট ক্লাস কামরা, টেলিফোন, আমি ভূত, কাগতাডুয়া, কুটুম-কাটাম, রামধনের বাঁশী, কনওয়ে ক্যাসলের প্রেতাত্মা, লখনৌর ডুয়েল, ধুমলগডের হান্টিং লজ, খেলোয়াড তারিণী খুডো, তারিণী খুডো ও বেতাল। কোথাও স্বপ্নের অভিজ্ঞতা, জেগে উঠলে ভৌতিকতা থাকে না—যতক্ষণ থাকে—ভয়ের গাঢ় স্বাদ আর তাকেই কাহিনীতে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কখনও বাস্তবে অলৌকিকে মেশামেশি। কোনো লেখায় অপরাধীর মনের গহন থেকে উঠে এসেছে ভ্রান্ত দর্শন আবার অন্যত্র ভৌতিক অভিজ্ঞতার কোনো মনস্তাত্ত্বিক কারণ পাওয়া যায় না। কখনও ভৌতিকতা 'হররে'র কাছে পৌঁছয়, কখনও ভূতের আচরণে কৌতুকবোধ না করে পারা যায় না। সত্যজিতের কল্পনায় ভূতের রাজা এবং নানা স্বভাবের ও জাতিবর্ণের স্বদেশী বিদেশী ভূত যে ভাবে ধরা দিয়েছিল গুপীবাঘার ছবিতে অতখানি ঐশ্বর্যময় না হলেও তাঁর ছোটগল্পের ভূতেরাও বৈচিত্র্যে বড কম নয়। একশ বছর আগের অত্যাচারী নীলকর ভূত, আদর্শবাদী ম্যাজিশিয়নের ভূত, পোডো বাড়ির নির্জনতায় হাঁপিয়ে ওঠা ভূত, খুনে ভূত, ভীরু ভূত, ন্যায়বিচারক বেতাল, ব্যাটসম্যান ভূত, দেহহীন হাস্যসর্বস্ব ভূত, প্রতিহিংসাপরায়ণ ভূত, নীতিবাগীশ ভূত, আর্টিস্ট ভূত—'হাজার' ভূতের খেলা জমিয়ে তুলেছেন লেখক।

৪। ভৌতিক নয়, কিন্তু হরেক রকম আজগুবি আর বাস্তব কল্পনা তাঁর বহু গল্পের প্রাণ। তার মধ্যে—

৪ (১)। অন্যগ্রহের প্রাণীদের নিয়ে দুটি—বঙ্কুবাবুর বন্ধু, অঙ্ক স্যার গোলাপী-বাবু আর টিপু; শঙ্কু-সিরিজের বহু গল্পের বাইরে এই দুটি তাৎপর্যে কিছু কম নয়।

৪ (২)। একটি রোবটের গল্প—অনুকূল। শঙ্কু গল্পের বহু রোবটের ভীড়েও হারিয়ে যাবে না।

৪ (৩)। ভয়ানক প্রাণী ও গাছ নিয়ে সেপ্টোপাসের খিদে, বৃহচ্চঞ্চু।

৪ (৪)। উপরের তিন উপবর্গ ই কল্পবিজ্ঞান-কাহিনী বলে গণ্য হতে পারে। এই শ্রেণীতে পড়বে ময়ূরকণ্ঠী জেলি এবং সবুজ মানুষ।

৪ (৫)। সাধুদের অলৌকিক শক্তির গল্প বহুরূপী এবং ডুমনিগড়ের মানুষখেকো।

৪ (৬)। অন্য নানা ধরণের আজগুবি কল্পনা অসমঞ্জের কুকুর, প্রোফেসর হিজিবিজবিজ, খগম, বাতিকবাবু, টেরোড্যাকটিলের ডিম, ম্যাকেঞ্জি ফ্রুট। টেরোড্যাকটিলে শুধু বর্ণনায় টাইপ মেশিনের মায়াসৃষ্টি। ম্যাকেঞ্জিতে শুধু ফলটির উৎপত্তি আর গুণপনায় অলৌকিকতা।

৫। নানা ধরণের আর্টিস্টের গল্প বলতে পছন্দ করতেন সত্যজিৎ। যেমন—

৫ (১)। ম্যাজিশিয়ান এসেছে তিনটি গল্পে, দুই ম্যাজিশিয়ান, ভূতো, ধাপ্পা।

৫ (২)। পোর্ট্রেট পেণ্টারদের সম্পর্কে দেখি বিশেষ আগ্রহ। আজকাল এ-ধরণের আঁকা উঠে গিয়েছে বলেই কি? অথবা এর সঙ্গে জড়িত আভিজাত্যের জন্য। সহদেববাবুর পোর্ট্রেট, গগনচৌধুরীর স্টুডিও, গণেশ মুৎসুদ্দির পোর্ট্রেট, শিল্পী। তারিণীখুড়ো ও বেতাল গল্পে যে চিত্রাঙ্কন তারও রীতিনীতি অনেকটা একই রকম। মানপত্রে একজন ছোটদের বইয়ের ছবি আঁকিয়ের কথা।

৫ (৩)। আরও নানাধরণের মানুষের ভেতরের আর্টিস্টের সঙ্গে লেখক আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। পটলবাবু ফিল্ম স্টার—ছাপোষা ভদ্রলোকের মধ্যের অভিনেতাটির খবর দেয়। স্পটলাইট-বাস্তব জীবনে এক কাল্পনিক ভূমিকায় অভিনয়ের গল্প। বহুরূপী—এক অসাধারণ মেক-আপ ম্যানের কথা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ফটিকচাঁদ এক জাগলারের গল্প—রাস্তার আর্টিস্ট। অংশুমান এক স্টার ম্যানের কাহিনী—সিনেমার বিজ্ঞাপনে যার নামও থাকে না।

৪

সত্যজিতের ছোটগল্পের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য :

১। আঙ্গিকের দিক থেকে সচেতন শিল্পীর লেখা। পাশাপাশি তিনি ফেলুদা এবং শঙ্কুও লিখছিলেন। ফেলুদার অনেক কাহিনী উপন্যাস বলে পরিচিত—ছোট আকারের উপন্যাস বলাই ভালো। কয়েকটি প্রায় ছোট গল্প। কয়েকটি মাঝারি আকৃতির। শঙ্কুর গল্পে কয়েকটি ছোট লেখা, বেশির ভাগ মধ্যম মাপের। রহস্য ও অ্যাডভেঞ্চার গল্পের একটা নিজস্ব ফর্মাট থাকে। লেখককে তার মধ্যেই

নড়াচড়া করতে হয়। অবশ্য কোনো কোনো গল্পকার তার মধ্যে একটু হাত পা ছড়াবার সুযোগ করে নেন। কিঞ্চিৎ শাখা প্রশাখা বের করেন, সময় মতো গুটিয়েও নিতে হয়। সত্যজিৎ স্বভাবত সংযত বাক্‌শিল্পী। তাঁর ফেলুদা এবং শঙ্কু যখন আকারে বড় হয় তখনও কচিৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট। ছোটগল্প লেখার সময়ে তিনি আরও জাগ্রত ও সতর্ক। কোথাও মুঠি একটু শিথিল নয়। প্রথম দিকের গল্প গড়পড়তা ১৩ পৃষ্ঠার, শেষ দিকের গুলি ৭/৮। এমনভাবে বিষয় ভেবে নেওয়া যাতে ঐ আকারটিই তার স্বাভাবিক চৌহদ্দী মনে হয়। এমন কি যেগুলি কল্পনায় দীন, জীবন রহস্যভেদে হয় অসফল না-হয় নিশ্চেষ্ট, সেখানেও এই সংহত রূপের অন্যথা নেই।

২। অন্য শ্রেণীর গল্পের মতো ভালো—সাধারণ সব গল্প শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠককে আগ্রহী করে রাখে। তার একটা বড় কারণ ভাষার মেদহীন ঋজুতা। প্রায় কোথাও উচ্চকণ্ঠ নয়। আবেগ চড়া নয়, হাস্য উদ্বেল নয়, বিশ্লেষণ দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ নয়। বর্ণনায় সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য চেষ্টা নেই—উপমা ও বিশেষণ প্রয়োগে অতিসংযম। নাটকীয় চমক আছে ঘটনায়—চরিত্রের অন্দরে, কিন্তু হোচট্ খেতে হয় না, ভাষার রাশ এমনি টানা। অথচ এই নাট্য-মুহূর্তগুলি জরুরী, কারণ এখানেই গল্পের তর্জনী। সব গল্পে আছে। কোনো কোনো গল্পে দুবার। যেমন বঙ্কুবাবুর বন্ধুতে, ভিন্নগ্রহের অ্যাং দর্শনে গল্পের মাঝামাঝি আর বঙ্কুবাবুর বিস্ফোরিত আচরণে সমাপ্তিতে। অসমঞ্জের কুকুরের মতো দু-একটি গল্পে বার বার, যতবার কুকুর হেসেছে—ততবারই, আর তার চরম সাহেবের মুখের উপরে হাসায়। অথচ ভাষায় উত্তেজনা ছবিগুলি ছাপিয়ে ওঠে নি। চলচ্চিত্রে সিদ্ধি এখানে ভাষা-শিল্পকে সাহায্য করেছে।

অবশ্য ভাষা ছাড়াও ঘটনার বিন্যাস, কৌতূহল সৃষ্টি ও নিরসন কিংবা নিরসন না-করা, বাস্তবের মধ্যে অবাস্তবকে দেখা, অবাস্তবে বাস্তবতার আবিষ্কার গল্পগুলিকে এত বেশি ইণ্টারেস্টিং করে রাখে।

৩। সত্যজিৎ গুটি চারেক রূপকথা লিখেছিলেন 'সুজন হরবোলা' বইয়ে। সেখানেও ভাষাকে এলিয়ে পড়তে দেন নি। আধো আধো গদ্য এড়িয়ে রূপকথা-উপকথার ভাষায় যে পুরুবালি ঢঙের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল ওঁর ঠাকুর্দার লেখায় তারই উত্তরাধিকার ভাষায় বাইরে রঙ নেই, মনের রঙ আছে ভেতরে, যেমন সুজনের কণ্ঠে যখন প্রকৃতি পাখির ভাষায় গান করে। তবুও সত্যজিৎ সম্ভবত রূপকথার রীতি নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন মাত্র। আধুনিক রূপকথা কেমন হবে তা নিয়ে ভেবেছিলেন। একালেও রূপকথার পক্ষে তাঁর সমর্থন প্রকাশ করেছিলেন। লেখক হিসেবে খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করেন নি। যদিও সুজন হরবোলার মতো একটি অত্যুৎকৃষ্ট গল্প লিখে ফেলেছিলেন।

৪। গল্পকার হিসেবে সত্যজিতের ক্ষমতা তখন শীর্ষে এবং নেমে যাবার মুখে তিনি এক কথক-নায়ক চরিত্র তৈরি করতে চাইলেন—তারিণী খুড়ো, এরকম মানুষ বাংলা সাহিত্যে অনেক আছে, আছে তাদের গল্পের আসর। তারিণীকে কিন্তু লেখক দাঁড় করাতে পারলেন না। কথক তারিণী এবং তার আসর বিবর্ণ হয়েই রইল। ডমরু ধর—কেদার চাটুজ্জে দূরে ঘনাদা-টেনিদার সাফল্যেও পৌঁছতে পারলেন না। তারিণীকে নিয়ে ঐ একটি বই, আটটি গল্প—আর এগুলেন না। যদিও এই সঙ্কলনে লখনৌর ডুয়েল এবং বেতাল-এর মতো জমাট ভূতের গল্প আছে।

৫। সত্যজিতের এতগুলো গল্পের মধ্যে শুদ্ধ বয়স্ক উপাদান আছে দু-তিনটি গল্পে। পিকুর ডায়রি বইটিতে সেগুলি আছে। বিশেষ করে পিকুর ডায়রিতে ছোটদের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু সেখানেও বড়দের সমস্যা ইত্যাদি বালকের দেখা-বোঝার ফ্রেমে আটকে দেওয়া। ময়ূরকণ্ঠী জেলি বা আর্যশেখরের জন্ম ও মৃত্যু কিশোর পাঠ্য গল্প হতে বাধা নেই।

আমি পিকুর ডায়রিকে—যদিও বেশ ভালো, তবু ব্যতিক্রমী লেখা বলতে চাই। সত্যজিৎ শুদ্ধ বয়স্কদের জন্য প্রায় কিছুই লেখেন নি। প্রচলিত রীতিতে বালক-কিশোরদের উপভোগের গল্প যে সব বিষয় নিয়ে, সমস্যা নিয়ে লেখা হয় সত্যজিৎ তার মধ্যেই থেকেছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, কিশোর-বালকদের জন্য লেখা গল্প ইত্যাদিকে সাধারণ সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান দেওয়া হয় না। বিষয় হিসেবে যেমন গোয়েন্দা বা অ্যাডভেঞ্চার গল্প কুলীন সাহিত্যের আসরে স্থান পায় না, তেমনি ছোটদের জন্য যে কাহিনী তাকে শিষ্ট সাহিত্য থেকে নীচে জায়গা দেওয়া হয়। এরকমই চলে আসছে। এরকম কুসংস্কার না ছাড়লেই নয়। আগে থেকেই কতগুলি বর্ণকে অচ্ছ্যুৎ করে না রেখে শিল্পের মান বিচার করে তাদের গ্রহণ বা বর্জন করাই যুক্তিসঙ্গত। এবং এ কথা কে না মানবে যে কিশোরসেব্য সাহিত্যমাত্রে বয়স্কদের সমান অধিকার, যদিও সব বয়স্ক-সাহিত্যে ছোটদের প্রবেশ নেই।

বিশেষ করে বালক ও কিশোরসেব্য কাহিনীগুলির মধ্যে যেগুলি খুবই উঁচু-মানের তার পুরো তাৎপর্য পরিণত মনের অপেক্ষা রাখে। সুকুমার রায়ের মতো লেখককে ছোটদের সাহিত্যিক বলে একপাশে সরিয়ে রেখে নিশ্চয়ই আপনি বঞ্চিত হতে চাইবেন না কোনো রসিকপাঠক এবং বোদ্ধা সমালোচক।

তবে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের কথা মনে রেখে লিখলে কিছু সীমাবদ্ধতা এসে যায়। নরনারীর নানাবিধ জটিল সম্পর্ককে এড়িয়ে যেতে হয়, নানা সমস্যা—মনস্তত্ত্বঘটিত বিকার, রূঢ় বাস্তবতার কয়েকটি দিক গল্পে আনা যায় না। আবার কিছু জিনিস সরাসরি আনা না গেলেও যেমন বিবিধ সূক্ষ্ম জীবন ও সমাজ জিজ্ঞাসা—গল্পের আপাত উপভোগ্যতা ভেদ করে পরিণত মনের কাছেই মাত্র ব্যঞ্জিত হয়।

সত্যজিৎ ফেলুদা-সংক্রান্ত এক সাক্ষাৎকারে একবার বলেছিলেন—

'বয়স্ক উপাদান না থাকলে ছোটবড় সকলেই ফেলুদার গল্প পড়ত না। আমার যদি কোনো কৃতিত্ব থাকে তবে সে হল এই দুই উপাদানের মিশ্রণ।'[৫]

ওঁর সব গল্প সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য।

প্রসঙ্গত শঙ্কু-সিরিজের একটি গল্পের কথা মনে পড়বে। 'কম্পু' গল্পে বিশ্বের সবচেয়ে জটিল ও প্রজ্ঞাবান কম্পিউটারাইজড ব্রেনটি দুনিয়ার সেরা বৈজ্ঞানিকদের বলেছিল শিশু। তাদের দ্বারা নির্মিত বলে তার নিজেকেও মনে হচ্ছিল শিশু—যে শৈশবোত্তীর্ণ হবার আপ্রাণ সাধনা তার। এই গল্পেই দেখি সাধু তানাকার একটিমাত্র প্রশ্নের সমাধান করতে পারেন নি শঙ্কু এবং অন্যসব আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন মহাপণ্ডিতেরা। এঁরাই যেখানে অবোধ শিশু সেখানে প্রাপ্ত বয়স্কদের অস্তিত্বই কল্পনার বিষয়—বিশেষভাবে তাদের জন্য সাহিত্যরচনার প্রশ্নই ওঠে না। সত্যজিৎ কি মনের গভীরে এরকম কিছু ভেবেছিলেন? অথবা বাপ-ঠাকুর্দার আদর্শে ছোটদের জন্য লিখব এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে চালিয়ে গেলেন?

৬। গল্পের জগৎ জয় করতে করতে—খুব দ্রুত জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিলেন তো—তিনি বুঝেছিলেন বাংলা কথাসাহিত্যে পরশুরাম-তারাশঙ্কর-মানিক-বিভূতির মতো লেখকেরা চোখ-ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্য রেখে সদ্যই গত হয়েছেন। তার পরের সারির লেখকদের মধ্যেও সামর্থ্য ভীড় করেছিল। জীবনকে অন্যদিক থেকে অন্য-ভাবে না দেখলে হবে পুরণোর অক্ষম অনুসরণ, না হয় তুলনায় মার খেতেই হবে। কিংবা আধুনিক হবার চেষ্টায় গলদঘর্ম হতে হবে। ১৯৬৫-এর পরবর্তী বাংলা কথা-সাহিত্যে কৃত্রিম যুগযন্ত্রণার বাড়াবাড়ি। সত্যজিৎ সতর্ক বুদ্ধিমান বিবেচক সাহিত্য বোদ্ধা। তিনি ছোটদের সামনে রেখে সকলের জন্য-অন্যরকমের কিছু লিখলেন। যুদ্ধজয়ের এই অদ্ভুত বিদ্যা তাঁর পিতৃদত্ত শিক্ষা। সুকুমার রায়ের আবোল-তাবোল হযবরল'র মতো অ্যাডাল্ট-জুভেনাইল সাহিত্য আর কি আছে?

বাংলায় সমকালে আজগুবি উপাদান নিয়ে ছোটদের গল্প অনেকেই লিখেছেন, ভালো লেখাও আছে। কিন্তু পুরনো দিনের ত্রৈলোক্যনাথের পরে একালের পরশু-রাম ছাড়া নাম করার মতো লেখক দেখি না যাঁরা বড়দের জন্য আজগুবি-রস সফলভাবে পরিবেশন করেছেন। তবে দুজনেই কৌতুকপ্রাণ গল্পকার। বড়দের ভূতের গল্প লিখতেন একালে এক শরদিন্দু। ছোটদের জন্য লিখেছেন অনেকেই, কিন্তু এমন কিছু নয়। সত্যজিৎ এই শূন্যতার সুযোগ নিয়েছিলেন, অবশ্য শুধু তাতেই লক্ষ্যভেদ হত না, সঙ্গে মনের তাগিদও ছিল। তিনি লিখেছিলেন:

'...the fantastic and the supernatural for which I have a Special fascination'.[৬]

৫। টেলিভিশন' পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকার, ২২.৭.৯০।

৬। সত্যজিৎ রায়ের ইংরেজী 'স্টোরিজ' বইয়ে নিজের লেখা ভূমিকা থেকে।

আজগুবি-অতিলৌকিককে বড়দেরও উপভোগের বস্তু করে তিনি বাংলা গল্পে ৬৫-পরবর্তী অধ্যায়ে একটা বিশেষ ধরণের অবস্থান পাকা করে নিলেন। যে-সব পাঠক গল্প পড়ে এবং এনটারটেন্‌ড হওয়া পছন্দ করে সত্যজিৎ তাদের পরিত্রাণ রূপে দেখা দিলেন, এবং মাঝে মাঝেই এনটারটেনমেণ্টে গভীরতর জীবনের আলো-হাওয়া নিয়ে এলেন।

৫

সত্যজিতের আজগুবি যদি শুধু আজগুবিই হত, তাতেও কিছু প্রাপ্তি থাকত, ফান (fun)-এর আয়োজনে উপভোগে ঘাটতি পড়ত না। তাঁর অনেক ভূতের গল্প ভয়ের বিচিত্র স্বাদ দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেছে। কিন্তু তাঁর অনেক আজগুবি কল্পনার সঙ্গে, কিছু কিছু ভৌতিকতাও মিশে গেছে সত্য জীবনের গভীর প্রশ্ন, সমাধানহীন রহস্যের তর্জনী।

অসমঞ্জের কুকুর নানা কারণে হেসে আমাদের প্রচুর মজা দিচ্ছিল। মার্কিন সাহেবের সামনে সে কিন্তু হাসছিল না, রূপগুণ দেখিয়ে বিয়ের কনের মতো ক্রেতা বা পাত্র আকর্ষণে তার ঘোরতর আপত্তি বলেই কি? তারপরে হঠাৎই তার হেসে ওঠা কেন? পৃথিবীর সব কিছু পয়সায় কেনা যায় না—এ কথাটা প্রকাশ করতে, বাজারের পণ্য নয় হাসি। অন্য গ্রহ থেকে উড়ে এসে অ্যাং-এর সবচেয়ে ছাপোষা, ব্যক্তিত্বহীন, অন্যের ঠাট্টার পাত্র বঙ্কুবাবুর সঙ্গে দেখা হল,—কোনো পণ্ডিত গবেষক, মন্ত্রী কিংবা ক্রোড়পতি ব্যবসায়ীর সঙ্গে নয়, এবং তাতে তার আপশোষ নেই। অ্যাং-এর বুদ্ধি বিদ্যা ক্ষমতার তুলনায় পৃথিবীর মানুষের দূরত্ব এত বেশি, যাতে বঙ্কু আর মার্কিন প্রেসিডেন্টের ফারাক নেই। এই দেখা আজগুবি বলেই অকারণ নয়। ছাপোষা ও দুর্বলচিত্ত বঙ্কুবাবুর মনের ভেতরে লুকানো ছিল যে ভৌগোলিক স্বপ্ন সেখানেই নিহিত তার যাদুমন্ত্র—তাই হয়তো টেনে এনেছিল অ্যাং মশাই ওর বাড়ির পথের বাঁশঝাড়ে। ওর মধ্য থেকে সেই লুকানো বাসনা বেরিয়ে এল, বিশ্বের—ব্রেজিলের অরণ্য থেকে তুষারঢাকা উত্তরমেরুতে তার মানস ভ্রমণ সাঙ্গ করে সে আত্মমর্যাদার শক্তিতে নবজন্ম লাভ করল।

ধূর্জটি বিনা প্ররোচনায় একটি সাপকে গর্ত থেকে প্রায় খুঁচিয়ে বাইরে এনে হত্যা করল। ইমলিবাবার শাপে সে সাপ হয়ে গেল, মৃত সাপের শূন্য স্থানটি পূরণ করল। মানুষ ধূর্জটির সর্পে রূপান্তরে গল্পের অলৌকিক রস জমেছে। কিন্তু এর মধ্য থেকে পার্থিব ইকোলজি-ঘটিত ভারসাম্য বিপর্যয়ের প্রতি কি তীব্র ভর্ৎসনা নেই। বালক সদানন্দ পিঁপড়েদের বন্ধু, ইমলিবাবা গোখরোকে আদর করে দুধ খাওয়ায়, নরখাদক বৃহচ্চঞ্চুকে পরমস্নেহে নিরামিষাসী করার ওষুধ দেয় তুলসীবাবু। সুজন হরবোলা পাখির ডাকই গলায় তুলে নেয় নি, পক্ষীজীবনের

সহজ আনন্দেরও সঙ্গী। বিহঙ্গভুক রাক্ষস প্রত্যক্ষত পক্ষীভোজী কিন্তু আসলে প্রাণের সঙ্কট। এখানেও ইকোলজিকাল ব্যালান্সের ভাবনা।

রতনবাবুকে ভূতে মেরেছিল প্রতিহিংসা নেবার জন্য। তিনি কেন নিজের জোড়াটিকে মারলেন—চেহারায় আচারে স্বভাবে একেবারে একরকম বলেই কি? আসলে এ হল তার আত্মহত্যা। প্রতিদিন—প্রতিক্ষণকে গল্পে একটা নাট্যমুহূর্তে ঘনীভূত করা। বলা যায় পর পর দুটি মুহূর্তে। Loners—একাকী যে মানুষ তার গল্প সত্যজিৎ অনেক এঁকেছেন। সেই শ্রেণীর মধ্যে রতনের কিছু বিশেষত্ব আছে, তিনি শুধু একাকী নন, তিনি শিকড়হীন। Loner এবং alienated এই বিশেষ এলিয়েনেটেড মানুষ তো রোজই নিজেকে মারে যখন আয়নায় নিজের প্রতিকৃতি দেখে, এ গল্পের দ্বিতীয় মানুষটি তো সেই প্রতিকৃতি, তখন সে কিংবা প্রতিকৃতি এবং দুই'ই ওভারব্রিজের উপর দিয়ে চলন্ত রেলের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আজগুবি এবং অলৌকিকের ব্যবহারে গল্প উপভোগে নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে এবং খুব সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতে তির্যক তর্জনীতে, চমকে—চমৎকারিত্বে, মন্ত্রমুগ্ধ বিস্ময়ে। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের আন্দোলনে মানুষের জীবন ও অস্তিত্ব বিষযে কিছু গূঢ় ভাবনাই ধরা পড়েছে। অন্য পদ্ধতিতে এত চকিত তীব্রতায় তা প্রকাশের মন্ত্র লেখকের আয়ত্ত ছিল না।

৬

সত্যজিৎ যে গল্পগুলিকে বলেছেন 'Straight'—যেগুলি প্রত্যক্ষ বাস্তবের সোজাসুজি রূপায়ণ কিন্তু বাস্তবের সীমা মাঝে মাঝেই বিচলিত হয়েছে। আসলে প্রাত্যহিক বস্তুর ভার থেকে বাস্তবের মানবিকতার সত্যের বেদনার সন্ধান। পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ। যেখানে তা নয় সেখানে খুব উঁচুতে উঠতে পারে নি তাঁর গল্প। যেখানে তা ঘটেছে, মনে হয়েছে জীবনে চরিত্রে অবাস্তব আজগুবির একটু স্পর্শ লাগছে, গল্পের মান বেড়েছে, চিত্ত মুক্ত হযেছে।

পটলবাবু ছাপোষা মানুষ। অভিনয়ের শখ ছিল। আজ তা স্মৃতি। হঠাৎ একটি শব্দ উচ্চারণের এক্সট্রার পার্ট করার সুযোগ এল এক ছবিতে। স্মৃতি ঘেটে অভিনয় শক্তির সবটুকু সংগ্রহ করে সে এই শব্দটি বলল—মনপ্রাণ ঢেলে 'অভিনয়' করল। তার ব্যর্থ তুচ্ছ জীবনে শিল্পীর মুক্তি পেল পটলবাবু, আকবর বাদশার স্তরে উঠে গেল হরিপদ কেরানী—কয়েক মুহূর্তের জন্য। সফল জীবন, অর্থ প্রতিষ্ঠায় সুস্থির মোহিত বাল্যকালের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু জয়কে দীর্ঘকাল পরে মলিন বেশে সাহায্য প্রার্থী রূপে দেখে ঠিক চিনতে পারল না বা চাইল না। কিন্তু জয়ের কিশোর ছেলেকে দেখে সে স্কুলের জয়কেই দেখল, নিঃস্বার্থ বাল্যকালের আপনাকে যেন ফিরে পেল, মুক্তি

প্রমাণ ছাড়াই সব সংশয় মিলিয়ে গেল। বাস্তব সাফল্যের বন্ধন থেকে মোহিতের এই উজ্জ্বল উদ্ধার হোক না সাময়িক।

সহদেববাবু হঠাৎ বড়লোক হয়েছেন। পোর্ট্রেটে আঁকা অভিজাত ধনীর আদলে জীবন গড়তে চাইছেন। মানুষের মতো হয় তার পোর্ট্রেট, সহদেব হতে চাইলেন পোর্ট্রেটের মতো এক মানুষ। এই ছবির ফ্রেম থেকে একদিন অনেক দুঃখ ও ক্ষতির মূল্যে তাঁকে বেরিয়ে আসতে হল, তখন তিনি একজন মানুষ—হয়তো আগের থেকে অনেক গরিব, কিন্তু ছবির নকল নন।

সামান্য লোক নিতাইবাবু। একদিন হঠাৎ বহুজনের শ্রদ্ধাপূত ভক্তপরিবৃত এক মহাপুরুষকে দেখে চিনে ফেলল, বাল্যের পরিচিত অসংস্বভাব ছেনো। নাম ধরে ডেকেও ফেলল। মহাপুরুষ যে সচকিত ও সতর্ক হয়ে উঠলেন কিছু সাংবাদিক তা বুঝে ফেলল। নিতাইবাবুকে তারা খবরের জন্য চেপে ধরল। জীবনে এই প্রথম নিতাইয়ের মনে হল সে মহাশক্তিধর। অতবড় একটা সাধুকে সে মাটিতে নামিয়ে দিতে পারে। কিন্তু সে নিজেকে সংযত করল। গুরুত্ব পাবার লোভ, অন্যকে পীড়নের বাসনা, সরিয়ে দিল মন থেকে, সাংবাদিকদের কিছু বলল না। মুহূর্তে নিতাইবাবু নিজে মহাপুরুষ হয়ে গেল পাঠকের বোধে।

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

সত্যজিৎ রায়ের গল্পের গদ্য

'সাহিত্য' ভাষায় আঁকা স্থিরচিত্র। যে ছবি ভাষায় আঁকা চলে না তা, অন্ততঃ দৃশ্যতঃ। তবে তার একটা গতি থেকে যায় পাঠকের গোপন মনে। আর দৃশ্যতঃ চলাটা যখন চলচ্চিত্রের চরিত্র তখন রূপ থেকে রূপান্তরে চলা ছাড়া তার উপায় নেই। থেমে গেলে 'চিত্র' ভাষায় ঋদ্ধ হলেও হতে পারে; কিন্তু স্বভাবচ্যুত হতে হয় তাকে। এখানে 'ভাষা' বলতে অবশ্যই 'শব্দ' বোঝাচ্ছে না। ভাষার ভূমিকা হল ইঙ্গিত দেওয়া। সুতরাং চিত্রেরও ভাষা আছে, তবে সেই ভাষা কাব্যভাষা বা 'শব্দ' থেকে ভিন্ন। আর চিত্র যখন চলমান তখন ভাষায় এসে যোগ হয় অন্য মাত্রা।

এই ভূমিকাটুকু করতে হল সত্যজিৎ রায়ের গদ্যভাষার অনন্যতা বোঝানোর জন্য। সত্যজিৎ এদেশের সাম্প্রতিককালের এক বিস্ময়। শিল্পী-ব্যক্তিত্বের বহুমাত্রিকতা তাঁকে বিস্ময়কর করেছে। গান-গল্প-চিত্র-চলচ্চিত্র আর্টের এতগুলো দিকে অধিকারী কে ছিলেন বা আছেন? অথচ এই আর্টগুলির প্রত্যেকটির ভাষাই স্বতন্ত্র। শব্দ, সুর, রেখা ও চলমান অজস্র খণ্ডের এক অখণ্ড বিগ্রহ রচনা—কোনটির সঙ্গেই অন্য আর একটি মেলে না। কিন্তু একই শিল্পী যখন এতগুলির উপর প্রভুত্ব করেন তখন তাঁর শিল্পীমনে যে আর একজন পরম ক্ষমতাবান কলাবিদ্‌গুণীর সর্বদা আধিপত্য তাতে সংশয় নেই। যেহেতু সর্বত্র একেরই প্রভুত্ব তাই শব্দে সুরের গতি, রেখায় লেখার সংবেগ অথবা লেখায় রেখার বৈচিত্র্য এসে যেতে পারে অনায়াসে। তথাপি সত্যজিতের মৃত্যুর পর তাঁকে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের পাশে বসাচ্ছেন তাঁদের বিচারবুদ্ধির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েও এই প্রবণতাকে উভয় ব্যক্তিত্বের পক্ষেই ক্ষতিকর বলে মনে হয়। সাহিত্যিক সত্যজিৎ উপেন্দ্রকিশোর ধারার সর্বোত্তম প্রকাশ। পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর অনবদ্য কথাকোবিদ্ ছিলেন। আবালবৃদ্ধকে সামনে বসিয়ে যেন বলে গিয়েছেন বিচিত্র গল্প। পিতা সুকুমার রায় গুরুতর বিষয়কে লঘুভঙ্গীতে উপস্থাপনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত, সঙ্গে ছিল রেখার উপর অধিকার। সত্যজিতের মধ্যে গল্প বলার ও রেখাঙ্কণের ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সুরের উপর আধিপত্য। সর্বোপরি লেখায়-রেখায়-সুরে জীবনের চলমান রূপকে দর্শনীয় করে তোলায় তাঁর সামর্থ্য ছিল বিশ্বজয়ী।

বাঙলা গদ্যে রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত রীতি ছিল তাঁর একান্ত আপনার। সেই

গদ্যে কবিধর্ম ছিল সুচিহ্নিত। ফলতঃ তার অনুকরণ উত্তরকালীনদের পক্ষে অসম্ভব না হলেও তাকে অস্বীকার অকল্পনীয়। 'সবুজ পত্রে'র লেখকগোষ্ঠীর গদ্যে সরসতার মিশ্রণ ঘটেছিল বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে। অবনীন্দ্রনাথের গদ্য ছিল যেন পটে লেখা। মূলতঃ ছবির জগতের মানুষ তিনি। সাহিত্যও তাঁর ছবির মতই তুলির টানে আঁকা। সহজ হাল্‌কা ছন্দে প্রতিটি বাক্য গড়ে উঠেছে। ছোট ছোট বাক্যে গুরুগম্ভীর কথা তিনি বলে যেতেন অনায়াস-প্রযত্নে। যেমন :

> 'রসিক ভোগ করে, আর্টিস্ট রচনা করেই খুশী হয়। যে রচয়িতা নয় সে শুধু ভোগের অধিকারী। আর যে রচয়িতা সে ভোগ এবং ক্রিয়া দুই নিয়ে ঐশ্বর্যবান।' ('রস ও রচনার ধারা')

এই গদ্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্যই হল চালের দ্রুততা। সত্যজিতের পাঠকেরাও এই বৈশিষ্ট্যটাই লক্ষ্য করেন সব চেয়ে আগে। একটি দৃষ্টান্ত :

> 'একজন লোক। আমি সেখানে দাঁড়িয়েছি তার ঠিক নিচে। গাছের ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। লোকটার মাথায় পাগড়ি। খুব বেশি বড় না—মাঝারি। গায়ে সাদা চাদর জড়ানো।' ('সোনার কেল্লা')

'সোনার কেল্লা' আর 'সুজন হরবোলা' এক রসের গল্প নয়। দ্বিতীয়টি গল্প নয়, রূপকথা। সুজন যে কালের ছেলে সে কালে রাজা, রাজকন্যা (বিহঙ্গভুক) 'রাক্ষস' সবই অবাস্তব। কিন্তু দুটি রচনার গদ্যে পার্থক্য কোথায় ?

> 'সুজন সেই থেকে হরবোলা হবার চেষ্টায় লেগে গেল। তার কাজ মাঠে ঘাটে বনবাদাড়ে ঘোরা। আর পাখির ডাক শুনে, জানোয়ারের ডাক শুনে, সেই ডাক মুখ দিয়ে নকল করা। এই কাজে তার ক্লান্তি নেই, কারণ তার স্বাস্থ্য বেশ ভালো, অনেক হাঁটতে পারে, গাছে চড়তে পারে, সাঁতার কাটতে পারে।'

'সুজন হরবোলা' গল্পটি রূপকথা, কিন্তু যেহেতু এই রূপকথার জন্ম একালে, তাই বিহঙ্গভুক রাক্ষসের সন্ধানে দূরে যেতে হয় না। এই রূপকথার শ্রোতারা শুধু শিশু বা কিশোর নয়, বিহঙ্গভুক তথা পাখি-শিকারীদের যাঁরা চেনেন তাঁরা সকলেই। গল্পটিতে সত্যজিৎ, সুকুমার রায়ের মতই 'রাগ বানিয়েছেন'। অথচ এই গল্পে রূপকথার মেজাজ আনতে হবে, তাই লেখকের অভিপ্রায় রূপ নেয় সেই কবিত্বপূর্ণ ভাষারীতিতে, যা মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা' ও 'ডাকঘর'-এর কথা :

> 'হ্যাঁ। এখনো দেখি। রোজই দেখি। লাল-নীল হলদে সাদা বেগুনী—কত রং! মৌমাছি এসে মধু খায়, প্রজাপতি উড়ে বেড়ায় ফুলের ধারে ধারে। কুঁড়ি থেকে ফুল হয়। সে ফুটে আবার ঝড়ে পড়ে। গাছের পাতায় বসন্তে কচি রং ধরে, শীতে সে পাতা শুকিয়ে ঝরে পড়ে।'

ছোট ছোট বাক্য ও বাক্যাংশে সুন্দর একটা ছবি তুলে ধরার চেষ্টা স্পষ্ট। রূপকথার ভাষা, তার মুখ্যশ্রোতা যেসব শিশু, তাদের শ্রবণসুভগ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ছোট-

বাক্য এবং শব্দ দিযে আঁকা ছবির উপর শিশু পাঠক ও শ্রোতাদের অঘোষিত দাবি। শ্রোতাদের কল্পনার বিকাশের জন্য একটু করে সংশয়ের অবকাশ রেখে দিতে হয়। সত্যজিতের প্রধান কৃতিত্ব শিশু ও পরিণত উভয়শ্রেণীর পাঠকের রসের ভোজে একই বস্তু পরিবেশনের দক্ষতায। কল্পনার রাজ্যে শিশুদের অবাধ বিহার। তথাপি মাত্রাগত পার্থক্য ছাড়া শিশু এবং পরিণত জনের কল্পনার মধ্যে ভেদ আর কতটুকু ? Science-fiction-এর জনপ্রিয়তা তো দুনিয়াব্যাপী। Soviet Literature-এর কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা আমাদের হাল আমলের পাঠকদের কাছে উপভোগ্য হয়েছিল Science-fiction-এর জন্য। সম্ভবতঃ এইচ জি. ওয়েলস ছিলেন প্রাতঃস্মরণীযদের অন্যতম। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদার কথা জানেন না এমন বাঙালী সাহিত্যরসিক কেউ আছেন কি! সত্যজিতের ছিল এক্ষেত্রে উল্লেখ্য অবদান। 'শঙ্কুর শনির দশা', 'নকুড়বাবু ও এল ডোরাডো', 'মরু রহস্য', 'কর্ভাস', 'বৃহচ্চঞ্চু' প্রভৃতি গল্পের নাম এই প্রসঙ্গে আসে আরও সেরা অনেকগুলি গল্পের সঙ্গে। তবে কৌশলের দিক থেকে প্রথম চারটিতে একধরণের বৈশিষ্ট্য আছে। তা হল প্রত্যেকটি গল্পই ডায়েরির ভঙ্গিতে লেখা। গ্রন্থের নামও 'প্রোফেসর শঙ্কুর ডায়রি'। ডায়েরির গদ্যে Intimacy একটা মৌলিক লক্ষণ। এমনিতেই সত্যজিতের বাক্য আকারে হ্রস্ব। 'প্রোফেসর শঙ্কুর ডাযরি'র গল্পগুলিতে এই বৈশিষ্ট্যটি যেন আরও বিশেষ করে চোখে পড়ে। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সীমারেখায় কাহিনীকে ধরে রাখতে গেলে শব্দ ব্যবহারে সংযম ও বাক্যগঠনে পরিমিতিবোধ একান্ত প্রযোজন। বিস্ময় যে গল্পের রস পরিণাম তাকে ছড়িযে ফেললে অথবা খুব আঁটসাঁট করে বাঁধলে সমান বিপদ হতে পারে। তরল গদ্য এবং কাব্যিক গদ্য যে-কোন একদিকে প্রবণতা সমান ক্ষতিকর। সত্যজিতের কলমের সংযম এক্ষেত্রে ঈর্ষণীয়। তাঁর গদ্যে টেনে রাখা এবং ছেড়ে দেওয়া দুটোই আছে। যেমন :

> 'আমি সামারভিলের দিকে এগিযে গেলাম। দৃষ্টি পাহাড়ের দিক থেকে সরাতে পারছি না। অবাক বিস্মযে আমার দম বন্ধ হযে আসছে, কারণ আমি ক্রমে বুঝতে পারছি যে আকাশের দিকে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে যে বিশাল জিনিসটা, সেটা আসলে আমার চেনা।' ('মরু রহস্য')

এর পরের বাক্যদুটো আকারে একটু বড়ো এবং সেই কারণে 'কমা' চিহ্নের ব্যবহারও বেশী। Tension-টা ধরে রাখা হয়েছে পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহারের পূর্ব পর্যন্ত। দ্বিতীয় বাক্যটি উদ্ধার করছি :

> 'গহ্বর দুটো আসলে নাকের ফুটো, আর পাহাড়টা একটা শুয়ে থাকা মানুষের নাক, আর নাকের তালু অংশটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, তার দু'পাশে জঙ্গলটা হচ্ছে ভুরু আর তার নিচের প্রশস্ত ঢিপিটা হচ্ছে বন্ধ হওয়া চোখ।' ('মরু রহস্য')

পুরো একটা অনুচ্ছেদে ঘনীভূত রহস্য। বাক্য এবং বাক্যাংশগুলোর তাল ও মান

ঠিকই আছে। চমৎকার ধরে রাখা হয়েছে পাঠকদের। তারপর উৎকণ্ঠার অবসান হয়েছে কিছু তৎসম শব্দের দ্বারা গঠিত ধীর লয়ের একটি বাক্য দিয়ে।

"সামারভিলের ফিসফিসে কণ্ঠস্বর সাহারার এই অপার্থিব জ্যোৎস্না-প্লাবিত দিগন্ত বিস্তৃত নিস্তব্ধতার মধ্যে যেন প্রতিধ্বনি হতে লাগল—

'ডিমেট্রিয়াস !...ডিমেট্রিয়াস !...' "

সত্যজিৎ তিরিশ বছর একটানা লিখে গেছেন বাঙলা গদ্য। ছবি আঁকা, ফিল্ম তৈরী করা চলেছে একই সঙ্গে। গল্পের সঙ্গে Illustration-ও তার নিজেরই আঁকা। চরিত্রকে নিজে দেখেছেন মনে আর পাঠককে দেখিয়েছেন ভাষায় এবং ছবিতে। বেশীর ভাগ গল্প, যে জন্যে তাঁর প্রসিদ্ধি—রহস্য রোমাঞ্চে ভরা। 'প্রোফেসর শঙ্কুর ডায়রি' বা শঙ্কুকে নিয়ে লেখা অন্যান্য বই ফেলুদাকে নিযে লেখা গোয়েন্দা গল্পগুলো থেকে জাতে আলাদা হলেও সর্বত্র রস কিন্তু একটাই—বিস্ময়জাত অদ্ভুত রস। 'অসমঞ্জবাবুর কুকুর' এবং 'ক্লাসফ্রেণ্ড' অবশ্য ভিন্ন গোত্রের গল্প। প্রথমটির শ্লেষ অসাধারণ এবং দ্বিতীয়টির ঘটনা অকিঞ্চিৎকর। অথচ রচনার কৌশলে ও ভাষা ব্যবহার গুণে চলতি পথে গল্পটি মোড় নেয় সুন্দরভাবে। অসমঞ্জবাবু তাঁর কুকুর ব্রাউনীকে বোঝেন, বোঝেন তার তাৎপর্যপূর্ণ-হাসির মর্মার্থ। বিস্ময়কর ব্রাউনীর হাসিতে মুগ্ধ সাহেব তাকে কিনে নিতে চাইলেন।...

'ব্রাউনী হাসছে।

এ হাসি আগের কোনো হাসির মতো নয়, এ একেবারে নতুন হাসি।

বাঁট হিঁ ইঁজ লঁ্যাফিং।'

মার্কিন মুলুকের ধনী ব্যবসায়ীর সানুনাসিক ইংরেজি উচ্চারণ বাঙালী পাঠকের কৌতুক যখন জমিয়ে তুলেছে তখন ব্রাউনীর হাসির কারণ ব্যাখ্যায় অসমঞ্জবাবু যা বললেন তা আর কৌতুকের রইল না। মোল্লা নাসিরুদ্দীনের গল্প ছাড়া অন্যত্র যখনই কৌতুকরস সৃষ্টি করা হয়েছে তখনই কিছুটা serious না হয়ে পারেন নি সুকুমার রাযের পুত্র সত্যজিৎ রায়।

'ব্রাউনীর হাসি থেমেছে। অসমঞ্জবাবু তাকে কোলে নিয়ে চোখের জল মুছিয়ে বললেন, সাহেব ভাবছেন টাকা দিলে দুনিয়ার সব কিছু কেনা যায়, তাই শুনে কুকুর হাসছে।

—বটে ? আপনার কুকুর বুঝি দার্শনিক ? (উক্তিটি শ্যামল নন্দীর)

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তার মানে আপনি কুকুর বেচবেন না ?

—আজ্ঞে না।'

সাহেব ও শ্যামল নন্দী চলে যাওয়ার পর অসমঞ্জবাবুর প্রশ্ন এবং উত্তরে ব্রাউনীর হাসি একেবারে পরশুরামের Prose Style-এর মত লাগে—

'তোর হাসির কারণটা ঠিক ধরিনি রে, 'ব্রাউনী' ?

ব্রাউনী ছোট্ট করে হেসে দিল—ফিক্।
অর্থাৎ ঠিক।'

শুধু শেষটুকু নয়, পরশুবামের গল্পের ভাষা যে পাঠক খুঁটিয়ে পড়েছেন তাঁর এই গল্প পড়তে পড়তে নানাভাবে মনে পড়ে যায় 'বিরিঞ্চি বাবা'র বাক্‌রীতির সঙ্গে 'লম্বকর্ণ' গল্পের essence.

চিত্রময় বর্ণনা এবং ভাষায় চলমান চিত্রের ধর্ম একসঙ্গে আনা সর্বত্র সম্ভব হয় না। চিত্রের ধর্ম স্থৈর্য। বর্ণনায় চিত্রাঙ্কনের ভাষা আনলে সে ভাষা রঙের উপর রঙ চাপানোয় স্থবির হয়ে যেতে পারে। উপমার রঙ চাপানো ভাষাচিত্র তাঁর লেখায় খুব বেশী না থাকলেও একেবারে নেই তা নয়। যেমন :

'মেঘের গায়ে নিচের দিকে একটা খড়খড়ির মধ্যে দিয়ে একটিবার উঁকি দিয়ে সূর্যদেব যখন আজকের মত ছুটি নিলেন…'

('ছিন্নমস্তার অভিশাপ')

তবে এমন বাক্যের সংখ্যাই প্রচুর যা দিয়ে চলচ্চিত্রের এক-একটি 'সেট' তৈরি অনায়াস হয়। এইসব বাক্যে চিত্র নয়, চলচ্চিত্র নামক আর্ট ফর্মের চাহিদা পূরণ করা হয়েছে বলে বাক্যগুলো ছোট। তবে সংযোজক অব্যয় বা Copula-র ব্যবহার না করে বাক্যাংশগুলো পৃথক পৃথক বাক্যে পরিণত হতে পারত। যেমন :

'বেশ বড় ঘর। দুটো পাশাপাশি খাট, তাতে আবার মশারির ব্যবস্থা আছে। একপার্শে একটা দুজন বসার আর দুটো একজন বসার সোফা আর একটা গোল টেবিলের উপর একটা অ্যাসট্রে। এ ছাড়া ড্রেসিং টেবিল, আলমারি আর খাটের পাশে দুটো ছোট টেবিলে জলের ফ্লাস্ক, গেলাস আর বেড-সাইড ল্যাম্প।'

('সোনার কেল্লা')

এই চারটি বাক্যের মধ্যে প্রথমটি ক্ষুদ্রতম। বাকি বাক্যগুলোকে একাধিক বাক্যাংশের সমাহারে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে মুখ্য Copula. 'আর', এবং হয়ত কিছুটা শ্রুতিকটুভাবেই, কারণ শেষের দুটি বাক্যে 'আর' (সংযোজক অব্যয়) ব্যবহৃত হয়েছে মোট চারবার। কিন্তু যে কেউ বলবেন, গল্পশোনার নেশা ধরতে পারতেন বলে ত্রুটিটা চোখে পড়ে না। এই কারণেই এমন বাক্যেও পাঠক বিরক্ত হন না :

'এটা রাক্ষস, আর রাক্ষস সুজনকে দেখেছে, আর দেখে মোটেই পছন্দ করে নি।'

('সুজন হরবোলা')

সত্যজিতের গল্পের চরিত্রলক্ষণ যাঁরা বিশ্লেষণ করবেন, তাঁরা হয়ত বলবেন, সত্যজিৎ যত বড় গল্প লিখিয়ে, তার চেয়ে অনেক বড় গল্প বলিয়ে। কিন্তু তাঁর গল্পের পাঠক বলবেন, যে-কোন বড় লেখকেরই গল্পে লেখার artificiality থাকে এবং সেটাই আর্টের কুললক্ষণ ; কিন্তু সত্যজিতের লেখা গল্পগুলো অকৃত্রিম ভাষার গুণে দ্রষ্টব্যতা অর্জন করেছে। কোথাও সে অর্থে 'স্টাইল' নেই, কিন্তু আয়াসহীন স্বচ্ছন্দতাই হয়ে

উঠেছে এমন আর্টের জন্ম-কারণ যেখানে 'আর্ট'কে Conceal করা হয়েছে পরম দক্ষতায়। এই মন্তব্যের পক্ষে তাঁর গল্প-উপন্যাস থেকে দৃষ্টান্ত অনেক উদ্ধার করা যেতে পারে। এই স্বাভাবিকতা এমনই যে ক্রিয়াপদহীন বাক্যগঠন যে ত্রুটি সংস্কারও আর মনে থাকে না। যেমন :

'গলিটা নির্জন। একে আপিসপাড়া—বাসিন্দা এমনিতেই কম—তায় রবিবার।' ('পটলবাবু ফিল্ম স্টার')

ক্রিয়াপদ বর্জিত হয়েছে এমন বাক্য যেমন সত্যজিতের গল্পে প্রচুর আছে, তেমনি বাঙলার সাধারণ বাক্‌রীতির নিয়ম (কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া) বর্জিত হয়েছে এমন বাক্যও যথেষ্ট। যেমন :

ক। 'বাকি রাতটা ঘুম হল না তুলসীবাবুর।' ('বৃহচ্চঞ্চু')
খ। 'ক্রমে এগিয়ে এল ষোলোই অক্টোবর।' ('লখ্‌নৌর ডুয়েল')
গ। 'এইবার দেখলুম ত্বই অশ্বারোহীকে।' (ঐ)
ঘ। 'জিগ্যেস করলুম স্কেলিটনের প্রযোজন হচ্ছে কেন।'
('তারিণী খুড়ো ও বেতাল')
ঙ। 'উঠে পড়লাম লেখা ছেড়ে।' ('নকুড়বাবু ও এল-ডোরাডো')

যতগুলো বাক্য উদ্ধার করেছি তার প্রত্যেকটির প্যাটার্ণ ইংরেজি বাক্য-অনুসারী ; কিন্তু এমন বাক্য আমরা তো যখন তখন ব্যবহার করি।

রহস্য রোমাঞ্চের গল্পকারকে শব্দবিন্যাসের দ্বারা বক্তব্যকে অনেক সময় ক্লাইম্যাক্স-এর দিকে আকর্ষণ করতে হয়। তখন প্রয়োজনের খাতিরে একই শব্দ দিয়ে পরপর একাধিক বাক্য আরম্ভ করলে অথবা ক্রিয়াপদের সঙ্গে একই ধাতু-বিভক্তি যোগ করলেও বাক্য গঠনকে একঘেয়ে মনে হয় না :

ক। 'বেশ বুঝতে পারছি সে অবাক, হতভম্ব। বেশ বুঝতে পারছি কর্ভাস ঘরের বাতি নিভিয়ে তার মনের যে ভাবটা প্রকাশ করল সেটা আর্গাসের বুঝতে বাকি নেই।—সে চায় না ঘরে আলো জ্বলে। সে অন্ধকার চায়, অন্ধকারে ঘুমোতে চায়।' ('কর্ভাস')

প্রথম বাক্য ত্বটি তৈরী হয়েছে পরপর তিনটি একই শব্দ দিয়ে—'বেশ বুঝতে পারছি।' এই ধরণের পুনরুক্তির টানটা tension সৃষ্টির দিকে। পরের বাক্য ত্বটিতে Information আছে এবং বৈপরীত্য সৃষ্টির দ্বারা tension বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই বৈপরীত্যবোধক উক্তি হল : 'সে চায় না' এবং 'সে অন্ধকার চায়।'...পরপর তিনটি বাক্যাংশে একই ধাতুবিভক্তিযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াপদের ব্যবহারের পর, লেখক পূর্ণচ্ছেদে থামলে সাধারণত ভালো লাগে না। অথচ 'কর্ভাস' গল্পে এই রকম বাক্য গল্পের রোমাঞ্চকরতার জন্যই মানিয়ে গিয়েছে :

'আর্গাস তার ফিসফিসে কথার সঙ্গে সঙ্গে তার হাতটা আমার চোখের সামনে নাড়ছে, আঙুলগুলোকে সাপের ফণার মত দোলাচ্ছে, নখগুলো সবুজ আলোয় চকচক করছে।'

নাড়ছে (<নাড়িতেছে), 'দোলাচ্ছে' (<দোলাইতেছে), 'করছে' (<করিতেছে) সবই একই ধাতুবিভক্তি যুক্ত ('ইতেছ' জাত) ক্রিয়াপদ। কিন্তু কিছু একটার প্রত্যাশা জাগাতে যেন এরকমটিই দরকার ছিল। সহায়করূপে এসেছে আরও বিশেষ দুটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ 'ফিসফিসে', 'চক্‌চক' এবং আঙুলের উপমান হিসেবে সাপের ফণার ছবিটি।

শব্দের প্রধান লক্ষ্য যদি হয় ভাবপ্রকাশ, তাহলে বাঙলার মত অসাধারণ সহিষ্ণু ভাষার ক্ষেত্রে জাতবিচারে লাভ নেই। ইঙ্গবঙ্গ সংস্কৃতির প্রসারের যুগ থেকে ইংরেজি শব্দ মিশিয়ে বাঙলায় কথা বলা বা লেখা একটা সচল পদ্ধতি হয়ে গিয়েছে। সত্যজিতের 'মোল্লা নাসীরুদ্দীনের গল্প' এবং 'সুজন হরবোলা'র মত কিছু গল্প ছাড়া সর্বত্রই চোখে পড়ে অজস্র ইংরেজি শব্দ :

ক। 'স্পোর্টসে একটা আইটেম ছিল ব্লাইণ্ডফোল্ড রেস।'

("যখন ছোট ছিলাম")

খ। 'অসমঞ্জবাবু ভেবে আশ্বস্ত হলেন যে ব্রাউনী ম্যাড ডগ নয়।'

("অসমঞ্জবাবুর কুকুর")

গ। 'এ ভেরি অর্ডিনারি গুণ্ডা বললেন ভোজরাজ।'

("তারিণী খুড়ো ও বেতাল")

ঘ। 'দেখুন মশাই সেটা এনটায়ারলি আপনার ইচ্ছে অনিচ্ছের ওপর নির্ভর করে।'

("সোনার কেল্লা")

ঙ। 'বাই দ্য ওয়ে—আপনার পরিচয়টা তো পাওয়া গেল না।'

("সোনার কেল্লা")

গল্পের চরিত্রের শ্রেণী, পেশা অনুসারে ভাষার বদল ঘটাবেন লেখক এটাই কাম্য। কিন্তু সত্যজিতের 'সোনার কেল্লা'র সিধুজ্যাঠা যখন Exhibition-কে বলেন 'ইস-কি ভীষণ', Impossible-কে 'আম-পচে-বেল', Dictionary-কে 'ড্যাখন নাড়ী' এবং Governor-কে 'গোবর নাড়ু' তখন শব্দের ভিতর থেকে বিশুদ্ধ কৌতুক টেনে আনার একটা প্রবণতা পাঠককে স্পর্শ করে যায়। তবে 'ছিন্নমস্তার অভিশাপ' গল্পে ইংরেজি শব্দের উচ্চারণের উপর নির্ভর করে রহস্যের কিনারায় পৌঁছুনোর যে চেষ্টা করা হয়েছে তার অভিনবত্ব প্রশংসনীয়। OKAHA=ও কে এয়েচে, RKAHA=আর কে এয়েচে, LOKC=এলোকেশী, DO=দিও, NADO=এনে দিও, NHE=এনেচি।

বিশ্বার বিভিন্ন প্রদেশে স্বচ্ছন্দবিহারী সত্যজিৎ একটানা ত্রিশ বছর বাঙলা গল্প সাহিত্যের যে সাধনা করেছিলেন তার সিদ্ধির সুফলটুকু কেবলমাত্র 'সন্দেশে'র পাঠকেরাই লাভ করে নি। এমন অবলীলাক্রমে সাহিত্য রচনায় পারঙ্গম বাঙালী সাহিত্যিকের সংখ্যা এদেশে কি এতটাই সহজলভ্য? সত্যজিৎ পরিণত মনেরও খোরাক জুগিয়েছেন এবং বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে নিজের একটি স্থান করে নেবেন কালক্রমে। শিশু-সাহিত্যিক কথাটির মধ্যে যে তাচ্ছিল্যের ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে সত্যজিতের ক্ষেত্রে যে তা প্রযোজ্য নয় তা সর্বজন সমর্থিত মনে করি। সবচেয়ে বড কথা বাঙলা ভাষাকে অনেক চলিত সংস্কার থেকে মুক্তি দিয়ে সত্যজিৎ বিদগ্ধজনের লেখ্যভাষার সঙ্গে চারু কথ্যভাষার এমন ভারসমতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন যার জন্য একালেই বলা যায় যে আগামী কয়েক প্রজন্মের রসিকদের অভিনন্দন তিনি লাভ করবেন তাঁর প্রাপ্য স্বীকৃতিরূপেই।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

লাল খাতা, বহুরূপী কালি, ডেঁয়ো পিঁপড়ে এবং ইত্যাদি

ধন্যবাদ যদি কাউকে দিতে হয়, তবে সে তারক চাটুজ্যেকে। অন্তত শঙ্কুকে নিশ্চয়ই নয়।

মনে আছে ছাপার হরফে প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর প্রথম আবির্ভাব? ঠিক দুক্কুরবেলা ভূতে যেমন মুণ্ডু তাগ ক'রে ঢিল ছোঁড়ে, আচমকাই, তারক চাটুজ্যে মারফৎ এক লাল খাতা এসে হাজির, কোনো-এক কাগজের ('সন্দেশ'?) সম্পাদকীয় দফতরে কাহিনীর প্রথম উত্তম পুরুষের কাছে খাতাখানা ফেলে দিয়ে তারক চাটুজ্যে বলেছিলেন:

'পড়ে দেখ। গোল্ড মাইন।'

পরে আরো যোগ করেছিলেন, এ-কথা সে-কথার পর:

'পড়ে দেখো।...তোমরা তো বানিয়ে বানিয়ে গল্পটল্প লেখো, আমিও লিখি। এ তার চেয়ে ঢের মজাদার।'

তারপর কয়েক দিনের মধ্যেই খাতাটা নিজেই অদ্ভুত সব কাণ্ড করতে লাগলো! উত্তম পুরুষের জবানিতেই শোনা যাক ব্যাপারটা: 'এই সেদিন

খাতাটা হাতে নিয়ে খুলে কেমন যেন খটকা লাগল।

যতদূর মনে পড়ে প্রথমবার দেখেছিলাম কালির রং ছিল সবুজ। আর আজ দেখছি লাল? এ কেমন হল?

খাতাটা পকেটে নিয়ে নিলাম। মানুষের তো ভুলও হয়। নিশ্চয়ই অন্য কোন লেখার সবুজ কালির সঙ্গে গোলমাল করে ফেলেছি।

বাড়িতে এসে আবার খাতাটা খুলতেই বুকটা ধড়াস করে উঠল।

এবার দেখি কালির রং নীল।

তারপর এক আশ্চর্য অদ্ভুত ব্যাপার। দেখতে দেখতে চোখের সামনে নীলটা হয়ে গেল হলদে।

এবারে তো আর কোনো ভুল নেই; কালির রং সত্যি বদলাচ্ছে।

হাতের কাঁপুনিতে খাতাটা মাটিতে পড়ে গেল। আমার ভুলো কুকুরটা যা পায় তাতেই দাঁত বসায়। খাতাও বাদ গেল না। কিন্তু আশ্চর্য! যে দাঁত এই দুদিন আগেই আমার নতুন তালতলার চটিটা ছিঁড়েছে, এই খাতার কাগজ তার কামড়ে কিচ্ছু হল না।

হাত দিয়ে টেনে দেখলাম এ কাগজ ছেঁড়া মানুষের সাধ্যি নয়। টানলে রবারের মতো বেড়ে যাচ্ছে, আর ছাড়লে যে-কে-সেই।

কী খেয়াল হল, একটা দেশলাই জ্বেলে কাগজটায় ধরালাম। পুড়ল না। খাতাটা পাঁচ ঘণ্টা উনুনের মধ্যে ফেলে রেখে দিলাম। কালির রং যেমন বদলাচ্ছিল, বদলাল, কিন্তু আর কিছু হল না।

সেই দিনই রাত্রে ঘুমটুম ভুলে গিয়ে তিনটে অবধি জেগে খাতাটা পড়া শেষ করলাম। যা পড়লাম তা তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। এসব সত্যি কি মিথ্যে, সম্ভব কি অসম্ভব, তা তোমরা বুঝে নিও।

['প্রোফেসর শঙ্কু' : পৃ. ১১-১২ ; দশম মুদ্রণ : ১৩৯৮]

প্রোফেসর শঙ্কু কে, এ-রকম একটা খটকা 'প্রোফেসর শঙ্কু' বইয়ের প্রকাশকেরও ছিল। এটাও তাঁর জানা ছিল না 'তিনি এখন কোথায়।' এটুকু ব'লেই তিনি [প্রকাশক ?] অন্তত খালাশ পেয়েছিলেন তখনকার মতো : 'এটুকু জানা গেছে যে তিনি একজন বৈজ্ঞানিক।' তবে প্রোফেসর শঙ্কুকে নিয়ে যে একটা মিথ তৈরি করবার চেষ্টা হচ্ছিলো, তার একটা প্রমাণ, এই বয়ান :

কেউ কেউ বলে যে তিনি নাকি একটি ভীষণ পরীক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ হারান। আবার এও শোনা যায় যে তিনি কোন অজ্ঞাত অঞ্চলে গা ঢাকা দিয়ে নিজের কাজ করে যাচ্ছেন, সময় হলেই আত্মপ্রকাশ করবেন।

প্রোফেসর শঙ্কুর প্রত্যেকটি ডায়রিতে কিছু না কিছু আশ্চর্য অভিজ্ঞতার বিবরণ আছে। কাহিনীগুলি সত্য কি মিথ্যা, সম্ভব কি অসম্ভব, সে বিচার পাঠকেরা করবেন!

বাক্যের শেষের বিস্ময়চিহ্নটি লক্ষণীয়। এবং সেটা যে অত্যন্ত জরুরি ছিলো, অপরিহার্যই, তার প্রমাণ "ব্যোমযাত্রীর ডায়রি" ['প্রোফেসর শঙ্কু' : পৃঃ ৩৭-৩৮] গল্পের শেষে তৃতীয় বন্ধনীতে সংযোজিত সম্পাদকীয় দফতরের কর্মীটির টিপ্পনী :

[অনেকে হয়তো জানতে চাইবে প্রোফেসর শঙ্কুর ডায়রিটা কোথায় এবং এমন আশ্চর্য জিনিসটাকে দেখবার কোন উপায় আছে কি না। আমার নিজের ইচ্ছে ছিল যে, ডায়রিটা ছাপানোর পর ওর কাগজ ও কালিটা কোন বৈজ্ঞানিককে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে তারপর ওটাকে যাদুঘরে দিয়ে দেব। সেখানে থাকলে অবিশ্যি সকলের পক্ষেই দেখা সম্ভব হবে। কিন্তু তা হবার জো নেই। না থাকার কারণটা আশ্চর্য। লেখাটা কপি করে প্রেসে দেবার পর সেই দিনই বাড়ি এসে শোবার ঘরের তাক থেকে ডায়রিটা নামাতে গিয়ে দেখি জায়গাটা ফাঁকা। তারপর একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম। ডায়রির পাতার কিছু গুঁড়ো আর লাল মলাটটার ছোট্ট একটা অংশ তাকের উপর আছে। এবং তার উপর ক্ষিপ্রপদে ঘোরাফেরা করছে প্রায় শ-খানেক বুভুক্ষু ডেঁয়োপিঁপড়ে। এরা পুরো খাতাটাকে খেয়ে শেষ করেছে, এবং ওই সামান্য

বাকি অংশটুকু আমার চোখের সামনে উদরসাৎ করে ফেলল। আমি কেবল হাঁ করে চেয়ে রইলাম।

যে-জিনিসটাকে অক্ষয় অবিনশ্বর বলে মনে হয়েছিল, সেটা হঠাৎ পিঁপড়ের খাদ্যে পরিণত হল কী করে সেটা আমি এখনও ভেবে ঠাহর করতে পারি নি। তোমরা এর মানে কিছু বুঝতে পারছ কি ?]

অনেকগুলো সংকট তার ফলে তৈরি হ'যে গেলো। সেই তারক চাটুজ্যে—যাঁকে আমরা আগেই একবার ধন্যবাদ দিয়ে দিয়েছি—তাঁর ভূমিকাটা যুগপৎ নগণ্য কিন্তু ফ্যালনা নয়। কেননা তাঁর হাতে প্রথম ডায়রিটা না-এলে প্রোফেসর শঙ্কুর যে প্রোফেসর হেশোরাম হুঁশিয়ারের মতো ডায়েরি লেখার বাতিক আছে সেটা আমরা জানতে পারতাম কী ক'রে ? তারক চাটুজ্যের পর সম্পাদকীয় দফতরের নামহীন উত্তম পুরুষ—তাঁর চোখে দৈবাৎ যদি ডায়রির খাতার বহুরূপীর মতো রং পালটানোর ব্যাপারটা চোখে না পডতো—ডায়রিটা হয়তো কখনোই ছাপা হ'তো না। কিন্তু ছাপা হবার পর সেটা পাঠকদের মনে ধ'রে যাওয়ায় সংকটটা গভীর হ'য়ে গেলো : বাকি গল্পগুলো আসবে কোত্থেকে—কোন তারক ব্রহ্মের কাছ থেকে ? প্রোফেসর চ্যালেঞ্জারের প্যারডি হিশেবে পরিকল্পিত হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরির অন্তত সেই সমস্যাটা ছিলো না যেহেতু তিনি নিজেই তাঁর ডায়েরি থেকে কিছু-কিছু টুকরো পাঠিয়ে দিয়েছিলেন :

[প্রোফেসর হুঁশিয়ার আমাদের উপর ভারি রাগ করেছেন। আমরা সন্দেশে সেকালের জীবজন্তু সম্বন্ধে নানা কথা ছাপিয়েছি ; কিন্তু কোথাও তাঁর অদ্ভুত শিকার কাহিনীর কোনও উল্লেখ করিনি। সত্যি, এ আমাদের ভারি অন্যায়। আমরা সে সব কাহিনী কিছুই জানতাম না, কিন্তু প্রোফেসর হুঁশিয়ার তাঁর শিকারের ডায়েরী থেকে কিছু কিছু উদ্ধার করে আমাদের পাঠিয়েছেন। আমরা তারই কিছু-কিছু ছাপিয়ে দিলাম। এসব সত্যি কী মিথ্যে তা তোমরা বিচার করে নিও।]

[সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু সম্পাদিত, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৩১ 'সুকুমার সাহিত্যসমগ্র', জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ.]

হেঁশোরাম হুঁশিয়ার অবিশ্যি ডায়রিতে তারিখের সঙ্গে সালটাও দিতেন ; তাছাড়া কনান ডয়েলের প্যারডি হওয়া ছাড়া অন্য-একটা বিষয়েও সচেতন ছিলো সে ; ইয়ারোস্লাভ হাশেক যেভাবে জীবতত্ত্ব ও জীববিজ্ঞানের কাগজে মনগড়া জীবজন্তুর কথা ছবি সমেত ছাপিয়ে তাদের ক্ষুরের ঘায়ের মতো সংকীর্ণ ও দুর্গম স্থানে পাঠিয়ে দিয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে হুলুস্থুল ফেলে দিয়েছিলেন, এবং শেষটায় সব ধাপ্পা বেরিয়ে প'ড়ে চাকরি থেকে বরখাস্ত হ'য়ে গিয়েছিলেন, 'সন্দেশ' কর্তৃপক্ষ এই টিপ্পনী যুক্ত ক'রে অবশ্যই সে-রকম কোনো হাশেক-মার্কা হৈ-চৈ ফেলতে চান নি। কিন্তু প্রোফেসর শঙ্কুর বাকি কাহিনীগুলো পাওয়া যাবে কী ক'রে ; দরকার হ'লে

ঐ টিপ্পনীর পর প্রোফেসর হুঁশিয়ারের আরো অ্যাডভেনচার ছাপা যেতো', কিন্তু এখানে যে বুভুক্ষু ডেঁয়ো-পিঁপড়েরা বাদ সেধেছে। ফলে স্বখাতসলিল থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে "প্রোফেসর শঙ্কু ও হাড" গল্পে আঁটঘাট বেঁধে পুনর্বার এই নামহীন উত্তম পুরুষটিকে আসরে অবতীর্ণ হ'তে হ'লো, এই টিপ্পনী সমেত :

(বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু বেশ কয়েক বছর যাবৎ নিখোঁজ। তাঁর একটি ডায়রি কিছুদিন আগে আকস্মিকভাবে [আমরা তো জানি কীভাবে] আমাদের হাতে আসে। 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি' নাম দিয়ে আমরা সন্দেশে ছাপিয়েছি। ইতিমধ্যে আমি অনেক অনুসন্ধান করে অবশেষে গিরিডিতে গিয়ে তাঁর বাড়ির সন্ধান পাই [ভাগ্যিশ ডেঁয়ো পিঁপড়েরা বাড়িটিকে খেয়ে ফ্যালেনি], এবং তাঁর কাগজপত্র, গবেষণার সরঞ্জাম সবকিছুরই হদিস পাই। কাগজপত্রের মধ্যে আরো একুশখানি ডায়রি পাওয়া গেছে। তার কয়েকটি পড়েছি, অন্যগুলো পড়ছি। প্রত্যেকটিতেই কিছু না কিছু আশ্চর্য অভিজ্ঞতার বিবরণ আছে। তার মধ্যে একটি নিচে দেওয়া হল। ভবিষ্যতে আরো দেওয়ার ইচ্ছে আছে।)

—"প্রোফেসর শঙ্কু ও হাড", 'প্রোফেসর শঙ্কু', ১০ম সংস্করণ, পৃঃ ৪১

'আরো একুশখানি' ব'লে ফেলে আরো-একটা মুশকিলের সূত্রপাত প্রায় হ'য়ে যাচ্ছিলো—একুশ সংখ্যাটি হয়তো উনপঞ্চাশেরই মতো কোনো অনুষঙ্গ নিয়ে আসে—তবে শেষ রক্ষা এই যুক্তি দিয়ে হ'তে পারে যে, কোথাও তো আর বলা হয়নি যে একেকটি ডায়রিতে শুধু একটা ক'রেই আশ্চর্য অভিজ্ঞতার বিবরণ আছে—একের ভেতর একশো অভিজ্ঞতাও থাকতে পারে, লিপইয়ার হ'লে হয়তো আরো-কিছু ফাউ জুটে যেতেও পারে।

তবে পণ্ডিতেরা আজকাল যাকে টেক্সট বা বয়ান বা récite বলেন, সেটা যে অবশ্যই এক হাতের নয়, অর্থাৎ নিছকই স্বয়ং প্রোফেসর শঙ্কুর নয়, খোদার ওপর যে প্রথম গল্পটির পর থেকে আর-কারু খোদকারি আছে, তার জন্যে আমাদের বিনামা সাম্পাদকীয় কর্মীটির কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। না-হ'লে বলতে হ'তো প্রোফেসর শঙ্কুর হয়তো ফেলুদার মতোই মেগালোম্যানিয়া আছে—আত্মনামে হুহুঙ্কার তাঁরও বৈশিষ্ট্য। 'শঙ্কু একাই ১০০', 'সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু', 'স্বয়ং প্রোফেসর শঙ্কু' ইত্যাদি গ্রন্থনাম ছাড়াও সেই বিনামা (শঙ্কুর একেবারে উলটোই হয়তো, কেননা ইনি শুধু নামকরণ ছাড়া আর কিছু বোধহয় করেননি) সম্পাদকীয় কর্মী যে-সব গল্পের নামে প্রোফেসর শঙ্কুর যোগ করেছেন, সেটা নিশ্চয়ই প্রোফেসর শঙ্কু নিজে করেননি। গল্পের নাম যদি গল্পের বয়ানেরই অংশ হয়, তবে আরো একটি অদৃশ্য নামহীন হাতের উপস্থিতি টের পাওয়া যাবে বৈকি। ফেলুদার তোপসে ছিলো, শঙ্কুরও সম্ভবত সেইরকম কেউ আছে, ছায়া যদি না-ই হয়, আছে তো অন্য-কেউ।

ফেলুদার নাম যে উঠলো, তার হয়তো একটা কারণ আছে। জীবনানন্দ

চুরি ক'রে এখন কেউ নিশ্চয়ই বলবেন না যে 'জ্ঞান শুধু সংকলিত তথ্যের ভাণ্ডার' —ফেলুদা, সিধুজ্যাঠা [হোমসের দাদা নাকি ?] বা নীল ও' ব্রায়েনদার কাছে ক্ষমা চেয়েই কথাটা পাড়া গেলো। শঙ্কু অবশ্য নিছকই তথ্যের পর তথ্য বলেন না— বরং বলেনই না (কোন্ বৈজ্ঞানিকই বা পেটেণ্ট করার আগে ফাঁস ক'রে দেন তাঁর ফরমুলা, বিশেষত ডাম্বেল তো ভজান যে কপিরাইট হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞানের মতো, যার হয় তারই হয়। আর কারু তাতে ভাগ নেই) কী ক'রে ভাবলেন মঙ্গলে পাড়ি দেবার রকেট, রোবট বিধুশেখর, হাই তোলানোর জৃম্ভনাস্ত্র, মৎস্যবটিকা, বটিকা ইণ্ডিকা [এটা জানলে হয়তো ভাবত সরকারকে মার্কিন মুলুক থেকে বেশি দামে গম কিনতে হ'তো না], ট্যানট্রাম বোরোপ্যাক্সিনেট একুইয়স ভেলোসিলিকা (যা বানাতে লাগে বোধহয় ব্যাঙের ছাতা সাপের খোলশ আর কচ্ছপের ডিম), mongorange ঠিকই ছিলো বাংলা আমলা ঠিক হয়তো আম আর কমলার তোরঙ্গ বা জোড়কলম হয় না। জ্যান্ত প্রাণীর কঙ্কাল দেখার চশমা, রাকিউল, অদৃশ্য হবার ওষুধ, ঘুমতাড়ানি বটিকা, অ্যানাইহিলিন বটিকা, কার্বোডাযাবলিক অ্যাসিড, সম্নোলিন ইত্যাদি-ইত্যাদি প্রায় সত্তরটি আবিষ্কার করেছিলেন শঙ্কু, কিন্তু যে-নোটবইতে দুন্দুভি বা অবণির সংজ্ঞার্থ থাকে, সেই নোটবই ছাড়া আর-কোথাও যে তিনি তাঁর আবিষ্কারগুলোর ফরমুলা বাৎলাবেন না এ তো জানা কথাই। যেখানে কোনো-কোনো ধুরন্ধর বৈজ্ঞানিক তাঁকেই চুরি ক'বে যন্ত্রমানব বানিযে দিতে চাচ্ছে, তাতে এ সব বিশল্যকরণী বা গন্ধমাদন সংক্রান্ত কথা তিনি যে চেপে যাবেন এ তো জানা কথাই।

কিন্তু সেই সঙ্গে যে-কথাটা তিনি চেপে গেছেন, ডাযরিতে কোথাও ফাঁস করেননি, সে হ'লো এই তথ্য যে, গিরিডিতে ব'সে-ব'সে তিনি পুরোনো 'সন্দেশ' পড়তেন সবসময়। কেননা তাঁর ডাযরির বিভিন্ন প্রবেশিকার ভাঁজে-ভাঁজে তিনি বুনে গেছেন সে-কথা, বিশেষত তাঁর একটি প্রিয় লেখা ছিলো ১৩২৮ সালের ফাল্গুনে ছাপা-হওযা "ভুল গল্প", সুকুমার রায-রচিত, যাব উত্তর বেরিয়েছিলো ১৩২৯ সালের বৈশাখ মাসে। "ভুল গল্প"-র উদ্দেশ্য ছিলো কী ক'রে সজাগ পাঠক তৈরি করতে হয় : কী ক'রে পড়তে হয় খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সবকিছু, মিলিযে দেখতে হয় খুঁটিনাটির কোনো গোলযোগ আছে কি না, কিংবা চরিত্রদের গড়নে উলটোপালটা কিছু করা হয়েছে কি না। প্রোফেসর শঙ্কুর নিশ্চযই মুখস্থ হ'য়ে গিয়েছিলো সেই গল্পের গোড়ায় ছাপা এই কথাগুলো :

> [এই গল্পের মধ্যে ইচ্ছাকরিয়া কতগুলি ভুল বর্ণনা করা হইয়াছে। কোথাও হয়ত এমন কথাও লেখা হইয়াছে যাহা একেবারেই অসম্ভব ; অথবা এক জায়গায় যাহা লেখা হইযাছে অন্য জায়গায় তাহারই উল্টা কথা বলা হইয়াছে —একটা ঠিক হইলে আর একটা ঠিক হইতে পারে না। দেখ তো এই-

রকম ভুল কতগুলি বাহির করিতে পার।]

'সুকুমার সাহিত্যসমগ্র', শতবার্ষিকী সংস্করণ, সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু সম্পাদিত, পৃঃ ১৯৮

সুকুমার রায় "ভুল গল্প"টিতে ইচ্ছে ক'রেই গল্পের বয়ন ও বয়ানে নানারকম অন্তর্ঘাত ঘটিয়েছিলেন, জেনেশুনে সচেতনভাবে ইচ্ছে ক'রেই গণ্ডগোল পাকিয়েছিলেন, কিন্তু গণ্ডগোলগুলো যে কী, তার হদিশ দেয়া ছিলো সেই গল্পেরই বয়ানে। কিন্তু প্রোফেসর শঙ্কু আরো সেয়ানা ও ধুরন্ধর, তিনি এমন কী ইচ্ছে ক'রে ডায়রিতে ভুল লিখে গেলেও সেটা ধরবার জন্যে কিন্তু চাই এমন-একজন যে কুইজ মাস্টার, যার মাথায় তথ্য শুধু গিশগিশ করছে। কিংবা শুধু তথ্যই নয়, যার এমনকী তত্ত্বজ্ঞানও আছে। যে জানে উপনিবেশবাদ, শ্বেতাঙ্গদের প্রচারিত মগজধোলাই করা তত্ত্ব, যে এমনকী পশ্চিম ইওরোপের যাবতীয় বারফট্টাইও জানে—জানে যে তার পূর্ব ইওরোপের ছোটো দেশগুলোর আবিষ্কারগুলো ডাস্কেলকে সেলাম না-ঠুকেই আত্মসাৎ ক'রে দিতে চায়। এ-সব কথা যে জানে সে-ই ধরতে পারবে প্রোফেসর শঙ্কু অম্লান বদনে তাঁর ডায়রিতে কী-সব ভুল জিনিস চালিয়ে দিয়ে গেছেন। উদ্দেশ্য একটাই ছিলো, সচেতন ভাবে গল্প পড়তে শেখানো, ছাপার অক্ষরে যা পড়লো তাকেই যাতে আমরা অভ্রান্ত বা বেদবাক্য ব'লে মেনে না-নিই। যেমন জার্মানি থেকে রুডল্ফ পমার যখন প্রোফেসর শঙ্কুকে চিঠি লেখে, তখন আমাদের মনে ক'রে রাখতেই হয় যে পমার নিশ্চয়ই পারেনি যে সে-দেশ একদিন জার্মানদের পদানত ছিলো, হিটলার সুইডিশ অ্যাকাডেমিকে হুমকি দিয়েছিলো কারেল চাপেককে নোবেল পুরস্কার দিলে আগে সে সে-দেশে হামলা চালাবে, অতএব স্লাভ 'রোব'-ধাতু যা থেকে চাপেক রোবোট কথাটা তৈরি করেছিলেন, যার সঙ্গে জড়ানো আছে দাসশ্রমের অনুষঙ্গ, তখন পমার এই শব্দ তৈরি করার কৃতিত্ব যে চাপেক বা কোনো চেগভাষীকে দেবে না, নিজে কৃতিত্বটা না নিলেও ফরাসিদের দিয়ে দেবে, এই জাত্যাভিমানী মনস্তাত্ত্বিক প্যাঁচ যে তাকে দিয়ে বলাবে :

প্রিয় প্রোফেসর শঙ্কু,

তোমার তৈরি রোবো (Robot) বা যান্ত্রিক মানুষ সম্বন্ধে তুমি যা লিখেছ…

["প্রোফেসর শঙ্কু ও রোবু", 'প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা', ১৯৭০, পৃ ১]

এটা কিন্তু আমাদের টেক্স্ট-এর বাইরের সাধারণ জ্ঞান মারফৎ একটু নুন মিশিয়ে গলাধঃকরণ করতে হয় (muddled metaphor নিশ্চয়ই শঙ্কু ক্ষমা করতেন না)। কিংবা শঙ্কু যখন এক নিশ্বাসে বলেন যে তিনি বিভিন্ন ভাষা চট ক'রে শেখবার জন্যে একটি সেল্ফটট মেউইজি ভাষাতাত্ত্বিক যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন, এবং তারপরেই বিভিন্ন ভাষার লোকজনের নাম দেশের নাম ভুলভাল লিখে দেন, তাতে আমাদের এই যন্ত্রের গুণপনা সম্বন্ধেই সন্দিহান হ'তে সজাগ ক'রে দেন, সত্যি তো সাতশো ধুরন্ধর কানের কাছে সারাক্ষণ নামতা প'ড়ে গেলেও আমাদের ভুল হ'তে পারে বৈকি। কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর একটা অবধান তো অনেকদিনই ছিলো মানুষের

মগজ যন্ত্রের সীমানাসরহদ্দি পেরিয়ে চ'লে যায়, যন্ত্র আর কী ক'রে—তার মধ্যে যে কর্মসূচি ঠেশে দেয়া হয়েছে—তার বাইরে যাবে! শঙ্কু যে অনবরত দেশবিদেশে টো-টো ক'রে বেড়ান, পাসপোর্ট ভিসা ফেরা ফরেন এক্সচেঞ্জের ধুন্ধুমার কাণ্ড সত্ত্বেও, এও তো আমাদের বুঝতে শেখায় এ-গল্প বিশ্বাস করতে হ'লে কতটা আপামুন মেশানো উচিত। তবে, একটু আগেই যা বলেছি, তার চাইতেও বড়ো-বড়ো নাশকতামূলক অন্তর্ঘাত আছে এ-সব ডায়রিতে। আছে সাহেবদের ভজানো নানারকম কথা, মাকড়শার জালের মতো যা আমাদের এখনও পেঁচিয়ে রেখেছে। পশ্চিম আফ্রিকার কঙ্গোর জঙ্গলে যেতে হ'লে পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবি থেকে হেলিকপ্টারে ওঠা উচিত কি না, এই তথ্য জানতে চায় পাঠক ভূগোল কতটা জানে অথবা হেলিকপ্টারের দৌড় বা এলেম তার জানা আছে কি না। অর্থাৎ যথোচিতভাবে পাঠক 'সংকলিত তথ্যের ভাণ্ডার কি না'। এই অন্তর্ঘাত তো নেহাৎই উপরিতলেই মারাত্মক হচ্ছে · সাহেবরা আমাদের আফ্রিকা সম্বন্ধে জ্ঞান কতটা বিষিয়ে রেখেছে তা আমরা এখনও জানি কি না, তাকেই জানতে চাচ্ছে এই অন্তর্ঘাতী তথ্য। কোনো প্রশ্ন না-ক'রেই আমরা পড়বো কি না নিচের এই উদ্ধৃতি, প্রোফেসার শঙ্কু তো আসলে তা-ই জানতে চাচ্ছেন। যেমনভাবে একদিন সুকুমার রায় 'সন্দেশ'-এর পাঠকরা ঠিকঠাক গল্প পড়তে পারে কি না জানতে চাচ্ছিলেন "ভুল গল্প" লিখে। সেই পরম্পরা মেনেই প্রোফেসর শঙ্কুও লিখেছেন—অন্য-কেউ এসে ওপরপড়া হ'ল যে-কাহিনীর নাম দিয়েছেন "শঙ্কুর কঙ্গো অভিযান"—

> সকাল আটটায় নাইরোবি থেকে হেলিকপটারে রওনা দিয়ে কেনিয়া ছেড়ে রোয়াণ্ডায় এসে রাওয়ামাগেমা এয়ারফীল্ডে নেমে আমাদের তেল নিতে হল। তারপর কিভু হ্রদ পেরিয়ে আধ ঘণ্টা চলার পর একটা খোলা জায়গায় নেমে আমরা উত্তরমুখী হাঁটতে শুরু করলাম। আকাশ থেকেই দেখেছিলাম গভীর অরণ্য সবুজ পশমের গালিচার মতো ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের পশ্চিমে আর উত্তরে। যতদূর দৃষ্টি যায় সবুজের মধ্যে কোনো ফাঁক নেই। এই ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্টের বিস্তৃতি দু' হাজার মাইল। তার অনেক অংশেই সভ্য মানুষের পা পড়েনি কখনো।

গল্পের মধ্যে, যারা 'সভ্য মানুষ' তাদের পা পড়লে এখানে কী হবে, তাই সম্ভবত পরে বর্ণনা করা আছে। পাছে কেউ ভাবতে পারে এই গল্পে সাহেবদের সভ্যতা সম্বন্ধে কটাক্ষ করা আছে, সেই জন্যে সেই ধারণা কাটান দেবার জন্যেই লেখা হবে যা 'বয়েজ ওন পেপার', 'টারজান', 'কিং সলোমনস্ মাইনস্', ব্যালান্টাইন', 'অরণ্যদেব', 'ফ্যানটম'-এ অনেকদিন ধ'রেই ছাপানো হচ্ছিলো, আফ্রিকার লোকেরা 'অসভ্য'। এরই মধ্যে যারা একটু সভ্য হ'য়ে যায় তাদের সম্বন্ধে বলা হয়:

> 'কাহিন্দি লোকটি বেশ। ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলে, নিজের ভাষা সোয়াহিলি। আমিও যে সোয়াহিলি জানি সেটা কাহিন্দির কাছে একটা

পরম বিস্ময়ের ব্যাপার।'

কিন্তু শুধু এটুকু বললেই তো সাহেবদের শেখানো আফ্রিকা সম্বন্ধে আমরা যদি ঠিকঠাক বুঝতে না-পারি তাই যথাযোগ্য নামগুলোও শোনানো হবে একটু পরে।

সিঙ্গল ফাইলে চলেছি আমরা সকলে, সবার আগে জিম ম্যাহোনি। আমাদের চারজনের মধ্যেই একটা চাপা উত্তেজনার ভাব। যে ইটালিয়ান দলটি হারিয়ে গেছে তাদের কাউকেই আমরা চিনতাম না, কিন্তু হাইমেনডোর্ফকে ক্রোল বেশ ভালভাবেই চিনত, আর ক্রিস ম্যাকফারসনের সঙ্গে ত সণ্ডার্সের অনেকদিনের পরিচয়। একমাত্র ডেভিড মানরো আমাদের ছাড়া কাউকেই চেনে না, কিন্তু তার উৎসাহ আমাদের সকলের চেয়ে বেশি। লিভিংস্টোন যে-পথে গেছে, স্ট্যানলি, মাঙ্গো পার্ক যে-পথে গেছে, সে-পথে সেও চলেছে এটা ভাবতেই যে তার রোমাঞ্চ হচ্ছে, সে-কথা সে একাধিকবার বলেছে আমাদের। লিভিংস্টোন স্ট্যানলির উল্লেখ ক'রে ব্যাপারটা পত্তন ক'রেই শঙ্কু কিন্তু থেমে থাকেননি। তারপরেই শুধু ঘণ্টাখানেক পথ চলার অবকাশটুকু দিয়েই সরাসরি আমদানি ক'রে দিয়েছেন আফ্রিকার 'নরখাদক'।

আমাদের সামনে খানিকটা খোলা জায়গা, তারপর প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে ঝোপ আর গাছের পিছনে দেখতে পাচ্ছি একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলি আকাশের দিকে উঠছে। গাছের ফাঁক দিয়ে কয়েকটি প্রাণীর চলাফেরাও যেন দেখা যাচ্ছে। জানোয়ার নয়, মানুষ। [লাখ কথার এক কথা!]

"কিগানি ক্যানিবালস", চাপা ফিসফিস গলায় বলল ম্যাহোনি। "টেক কাভার বিহাইণ্ড দ্য ট্রিজ।"

ম্যাহোনি তার বন্দুকের সেফটি ক্যাচটা নামিয়ে নিয়েছে সেটা একটা খুট শব্দ থেকেই বুঝেছি। কাহিন্দির হাতের বন্দুকও তৈরি। [সে তো অনেকটাই সভ্য হ'য়ে উঠেছে কি না।] ক্রোল কী করছে সেটা আর পিছন ফিরে দেখলাম না। আমরা চারজনে এবং ছ' জন কুলি [এরা তো কালা আদমি হবেই!], ছড়িয়ে পড়ে এক-একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বনে ঝিঁঝির ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

প্রায় দশ মিনিট এইভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম। ধোঁয়ার কুণ্ডলি ক্রমে অদৃশ্য হল। এবারে কিছু ঘটবে কি?

হ্যাঁ, ঘটল। ঝোপ আর গাছের পিছন থেকে একদল কৃষ্ণাঙ্গ বেরিয়ে এল। তাদের হাতে তীর-ধনুক, পায়ে সাদা রঙের ডোরা, চোখের কোটর আর ঠোঁট বাদ দিয়ে সারা মুখ জুড়ে ধবধবে সাদা রঙের প্রলেপ। [যদি হলিউডি কেতা মনে থাকে তাহ'লে এই 'এথনিসিটি' (!) চমকপ্রদভাবেই নিশ্চয়ই মনে প'ড়ে যাবে পাঠকদের।] দেখলে মনে হয় ধড়ের উপর একটা মড়ার খুলি বসানো। নরখাদক। কথাটা ভাবতেই আমার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা

শিহরন খেলে গেল। আড়চোখে ডাইনে চেয়ে দেখলাম, ডেভিড থরথর করে কাঁপছে, তার বিস্ফারিত দৃষ্টি দলটার দিকে নিবদ্ধ। বেশ বুঝলাম কাঁপুনি আতঙ্কের নয়, উত্তেজনার।

নরখাদকের দল এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। লক্ষ করলাম ম্যাহোনির বন্দুক এখনো নামানো রয়েছে। কাহিন্দিরও।

লোকগুলো এই দুজনকে দেখল, এবং দেখে থামল।

তারপর তাদের দৃষ্টি ঘুরল এদিক-ওদিক। আমাদেরও দেখেছে। এ-গাছের গুঁড়ি তেমন প্রশস্ত নয় যে আমাদের সম্পূর্ণ আড়াল করবে।

সমস্ত বনটা যেন শ্বাসরোধ করে রয়েছে। আমি নিজের হৃৎস্পন্দন শুনতে পাচ্ছি। প্রায় একমিনিট এই ভাবে থাকার পর নরখাদকের দল মৃদুমন্দ গতিতে আমাদের পাশ কাটিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মুখ খুলল প্রথমে ডেভিড মানরো।

"বাট দে ডিড্‌ন্ট্‌ ঈট আস!"

ম্যাহোনি হেসে উঠল। "খাবে কেন? তোমার যদি পেট ভরা থাকে তাহলে তোমার সামনে এক প্লেট মাংস এনে রাখলে খাবে কি?"

"ওরা খেয়ে এল বুঝি?"

"আমার ত তাই বিশ্বাস।"

"মানুষের মাংস?"

"সেটা আরেকটু এগিয়ে গেলেই বুঝতে পারব।"...

"ওই দ্যাখো", অঙ্গুলি নির্দেশ করল ম্যাহোনি।

ডাইনে কিছু দূরে একটা নিভে যাওয়া অগ্নিকুণ্ডের আশেপাশে ছড়ানো রয়েছে রক্তমাখা হাড়। সেগুলো যে মানুষের সেটা আর বলে দিতে হয় না।

["শঙ্কুর কঙ্গো অভিযান", 'শঙ্কু একাই ১০০', ১৩৯০, পৃঃ ৮৩-৮৪]

অন্তর্ঘাতটা আর ভেতরের ব্যাপার থাকবেই না, যখন আমরা দেখতে পাবো, শাদারা পেট পোরা থাকলেও, অর্থাৎ যথেষ্ট ক্ষমতা থাকলেও আরো ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির জন্যে সর্বক্ষণ অত্যাচার চালিয়েই যায়। না কি এ-কথা শঙ্কু বলতে চাননি, আমরা প'ড়ে পাচ্ছি নিজেদের মতো ক'রে? 'আধানির্মাণ তত্ত্ব' তো টেক্‌স্‌টকেই নাকচ ক'রে দিয়েছে। তার সম্পূর্ণ নূতন টেক্‌স্‌টই বা কে কবে লিখতে চেয়েছে, বা পেরেছে?

স্বয়ং সত্যজিৎ ও 'সম্পূর্ণ মৌলিক' হবার অসম্ভবের সাধনা করেন নি, করতেও হয়তো চাননি। 'সন্দেশ'-এর স্মরণ সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৯৯তে আমরা ১০১ পৃষ্ঠায় সত্যজিৎ রায়ের একটি চিঠিতে পড়তে পাচ্ছি:

"গল্পে ষোল আনা মৌলিক হওয়াটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এবং ওদিকটা নিয়ে খুব মাথা ঘামাবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।"

তাহ'লে হয়তো এঁরা সবাই মর্তধামেই আছেন, তবে অন্য নামে।

মানস মজুমদার

সত্যজিৎ : ভূতের গল্প : গল্পের ভূত

ভূতের গল্প আমরা পড়ি কেন? ভূতের প্রতি ভালোবাসার জন্যেও নয়, ভক্তিবশতও নয়। ভূতের ভয় থেকেই ভূতের গল্পে আমাদের এত আগ্রহ। সেই ভয়টুকুই যদি না থাকে, তো ভূতের গল্প পাঠে আগ্রহ থাকবে কেন? আগ্রহে ভাটা পড়বে। ভূতের গল্পও মাঠে মারা যাবে।

ভূতের গল্পের অনেকটাই বানানো। সত্যি শুধু পোড়োবাড়ি, কবরখানা, নিশুত রাত কি বাদল-সন্ধ্যা, এমনি আরো কিছু। ভূতের গল্প ঠিকঠাক বানিয়ে তোলার মধ্যেই আসল ওস্তাদী। অবিশ্বাস্যকে বিশ্বাসযোগ্য ক'রে তোলা সহজ ব্যাপার নাকি? সেই সঙ্গে রয়েছে শঙ্কা-শিহরণময় পরিবেশ-সৃষ্টির গুণপনা। ঐ শঙ্কা-শিহরণে আমাদের জীবন ও অস্তিত্ব নাড়া খায়। ভূতের গল্প-শেষে আমরা মানুষের জগতকে আর একটু বেশি ভালোবাসি। ভয়ভীতি এভাবে মনের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দেয়। ভয়ভীতি যেন এক্ষেত্রে টনিকের কাজ করে।

শুধু কী তাই? বাস্তব সমাজ-সংসারের নানানতর অব্যবস্থা, পরিচিত মানুষজনের অসংগত আচার-আচরণ সংশোধনে অনেক সময় তির্যকতার আশ্রয় নিতে হয়। সেজন্যে প্রয়োজনে ভূতদেরও শরণাপন্ন হতে হয়। ভূতের দলটি এভাবেও মাঝেমধ্যে লেখকদের অল্পবিস্তর উপকার ক'রে থাকে। মানুষের গোপন আশা-আকাঙ্ক্ষা, লোভ-লালসা, ঈর্ষা-বিদ্বেষ, প্রতিশোধস্পৃহা, কপটতা, স্বার্থপরতা, নীচতা ইত্যাদির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে। ভূতের গল্পের আয়নায় আমরা আমাদের আর এক সত্তার পরিচয় পাই। বলা বাহুল্য, ভূতেদের প্রয়োজন তাই কোনদিনই ফুরোবে না। এককথায় ভূতেরা বিপুলা পৃথিবীতে নিরবধিকাল বিরাজ করবে।

বাংলা সাহিত্যের ডাকসাইটে লেখকেরা এক সময় ভূতের গল্প লিখেছেন। বেশ সরেস গল্প সেসব। সেসব গল্পের সংখ্যাও কম নয়। ইদানীং গল্প-সাহিত্যের এ শাখাটি অবশ্য শীর্ণকায়। কালের প্রভাবেই।

স্বভাবতই সত্যজিতের ভূতের গল্পগুলি তাই মনোযোগ দাবি করে। তাঁর লেখা ভূতের গল্পের সংখ্যা কম নয়। সত্যজিৎ যে নিছক অদ্ভুত রসের কারবারী, একথা সত্য নয়। ভৌতিক রসেরও জোগানদার তিনি। 'এক ডজন গপ্‌পো' (১৯৭০) সংকলনের 'দুই ম্যাজিশিয়ান', 'অনাথবাবুর ভয়', 'বাদুড় বিভীষিকা', 'নীল আতঙ্ক'; 'আরো এক ডজন'-এর (১৯৭৬) 'ক্রিৎস', 'ব্রাউন সাহেবের বাড়ি', 'রতনবাবু আর সেই লোকটা'; 'আরো বারো'-র (১৯৮১) 'মিঃ শাসমলের শেষ-

রাত্রি', 'ভূতো'; 'এবারো বারো'-র (১৯৮৪) 'গগন চৌধুরীর স্টুডিও'; 'একের পিঠে দুই'-এর (১৯৮৮) 'টেলিফোন', 'আমি ভূত', 'কাগতাড়ুয়া', 'কুটুম-কাটাম', 'রামধনের বাঁশী' প্রভৃতি গল্প তার দৃষ্টান্ত।

বেশ বোঝা যায়, ভূতের গল্প লিখতে তিনি ভালোবাসেন। ভূতেদের প্রতি তাঁর খানিকটা দুর্বলতা আছে। তাই তাঁর ভূতের গল্পের সংখ্যাটা হিসেবে রাখার মতো। শুধু তাই নয়, বৈচিত্র্যও যথেষ্ট। একঘেয়েমির কোনো অভিযোগ তাঁর ভূতের গল্পগুলি সম্পর্কে একেবারেই অচল।

ভূতের গল্পের সত্যজিৎ এক ওস্তাদ শিল্পী। অবিশ্বাস্যকে বিশ্বাসযোগ্য ক'রে তুলতে পারেন তিনি অনায়াসেই। আর তাই, গল্প-পাঠের আনন্দটুকু পাওয়া যায় পুরোমাত্রায়। শঙ্কা-শিহরণময় পরিবেশ-সৃষ্টিতেও তাঁর গুণপনা স্বীকার করতেই হয়। পোড়োবাড়ির পটভূমিকায় লেখা 'অনাথবাবুর ভয়', 'নীল আতঙ্ক', 'ব্রাউন সাহেবের বাড়ি', 'আমি ভূত' প্রভৃতি গল্প। পটভূমিকার সঙ্গে গল্পগুলি বেশ মানানসই।

অধিকাংশ গল্পের ঘটনাকাল রাত্রি। বিকেল-সন্ধ্যের সময়-সীমায় লেখা 'রতনবাবু আর সেই লোকটা', 'কাগতাড়ুয়া' আর 'রামধনের বাঁশী'। দিনরাত্রির নানা সময় নিয়ে লেখা গল্প 'ফ্রিৎস' আর 'ভূতো'।

ভূতের গল্পের আড়ালে মানুষের চরিত্রের জটিল-কুটিল দিকগুলি ধরা পড়েছে 'দুই ম্যাজিশিয়ান', 'রতনবাবু আর সেই লোকটা', 'মিঃ শাসমলের শেষ রাত্রি', 'ভূতো', 'কাগতাড়ুয়া' ইত্যাদি গল্পে। কিন্তু থাক্ সেসব কথা।

জনৈক ভূতের জবানীতে লেখা 'আমি ভূত' গল্পটি প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য। গল্পটিকে ভূত-মনস্তত্ত্বের নিদর্শনরূপে গণ্য করা চলে। কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যাক্ :

'ভূত দেখা দেবে কি অদৃশ্য থাকবে সেটা ভূতের মর্জির উপরই নির্ভর করে।'

'ভূত হয়েছ বলেই যে জ্যান্ত মানুষের অপকার করতে হবে এমন ত কোনো কথা নেই। তুমি তোমার রাজ্যে তোমার ধান্দা নিয়ে থাক, আর জ্যান্তরা থাকুক তাদের ধান্দা নিয়ে। দুই জগতে ঠোকাঠুকি হলেই যত অনাসৃষ্টি।'

'জ্যান্তরা যদি জানত যে ভূতরা তাদের সান্নিধ্য কত পছন্দ করে তাহলে কি তারা ভূতকে এত ভয় পেত? কখনই না।'

'আমরা যেমন দেখি বেশি, তেমনি শুনিও বেশি। আমাদের চোখ কান দুটোই যেন দূরবীনের মতো কাজ করে।'

টেলিফোনে মানুষের সঙ্গে ভূতের কথোপকথন বোধকরি সত্যজিতের গল্পেই প্রথম পাওয়া গেল। টেলিফোনে 'ভূতুড়ে কল' ব'লে একটা কথা চালু আছে বটে, কিন্তু সে কল ভূতের কাছ থেকে আসে না, আসে মানুষেরই কাছ থেকে। 'টেলিফোন' গল্পে কিন্তু ডাক্তার বীরেশচন্দ্র নিয়োগী তাঁর পুত্রের প্রয়াত বন্ধুর প্রয়াত পিতা গণপতি সোমের কাছ থেকে টেলিফোন-বার্তা পান। প্রায় সাত বছর আগে সিন্দুক থেকে হারিয়ে যাওয়া বীরেশবাবুর ঠাকুর্দার হীরের আংটিটি প্রয়াত পিতা-

পুত্র গণপতি ও শ্রীপতির আনুকূল্যে ফিরে পান। ভূতেরা এখানে কৃতজ্ঞ, বিনীত ও সবিশেষ ভদ্র।

স্বপ্নের মোড়কে একাধিক ভূতের গল্প পরিবেশন করেছেন সত্যজিৎ। 'দুই ম্যাজিশিয়ান', 'নীল আতঙ্ক', 'কাগতাড়ুয়া', 'গগন চৌধুরীর স্টুডিও' তার উদাহরণ। প্রথম গল্পে উঠতি ম্যাজিশিয়ান সুরপতি মণ্ডল রাত্রিবেলা ট্রেনের নির্জন কামরায় তার প্রয়াত গুরু যাদুকর ত্রিপুরাচরণ মল্লিকের দেখা পায়। ত্রিপুরাচরণ প্রতিষ্ঠালোলুপ তরুণ শিষ্যকে নিষ্ঠা একাগ্রতা ও সাধনার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। দুরূহ একটি যাদু-প্রদর্শনের কৌশলও শিখিয়ে দেন। পরিবেশ-পটভূমি তৈরিতে সত্যজিতের মুন্সিয়ানা অনস্বীকার্য। গুরু-শিষ্যে এই সাক্ষাৎকার যে স্বপ্নে, তা প্রকাশ পায় গল্পের শেষাংশে। এভাবেই ভূতের গল্প হয়ে ওঠে বিশ্বাস-যোগ্য। 'নীল আতঙ্ক' গল্পের নায়ক অনিরুদ্ধ বোস একাকী অ্যাম্বাসাডারে কলকাতা থেকে দুমকা যাওয়ার পথে ঝড়-বৃষ্টিতে প'ড়ে গাড়ি বিকল হওয়ায় ম্যাসানজোরের কাছাকাছি একটি পোড়ো বাড়িতে আশ্রয় নেয় বাড়িটি বহুকাল পূর্বে মৃত এক নীলকর সাহেবের নীলকুঠি। "ঘরের সাইজ বড় আর সীলিংটা পেল্লায় উঁচু। আসবাব বলতে একটি পুরোন নেয়ারের খাট, একপাশে একটা টেবিল, আর তার সামনে হাতল ভাঙা একটা চেয়ার।"

রাত্রে অনিরুদ্ধ শুনতে পায় 'বিলিতি হাউণ্ডের হুঙ্কার'। নিজের দিকে তাকিয়ে দেখে তার চেহারা পোশাক এমন কী উচ্চারণ পর্যন্ত বদলে গেছে। বঙ্গ-সন্তান অনিরুদ্ধ পুরোপুরি এক সাহেবে রূপান্তরিত হয়। বদলে গেছে ঘরের ভেতরটাও। অনিরুদ্ধর জবানীতে: "খাট আছে—তাতে মশারি নেই—অথচ আমি মশারি টাঙিয়ে শুয়েছিলাম। বালিশ যেটা রয়েছে সেটাও আমার নয় আমারটা ছিল সাধারণ, এটার পাশে বাহারের কুঁচি দেওয়া বর্ডার। খাটের ডান দিকের দেওয়ালের সামনে সেই টেবিল, সেই চেয়ার—কিন্তু তাতে প্রাচীনত্বের কোনো চিহ্ন নেই। আবছা আলোতেও তার বার্নিশ করা কাঠট চক্‌চক্ করছে টেবিলের উপর রাখা রয়েছে—লণ্ঠন নয়—বাহারের শেডওয়ালা কাজ করা কেরোসিন ল্যাম্প।"

অন্যান্য জিনিসপত্রের তালিকা: দুটো ট্রাঙ্ক, একটা দেওয়াল-আলনা, "তা থেকে ঝুলছে একটা কোট, একটা অদ্ভুত অচেনা ধরনের টুপি, আর একটা হাণ্টার চাবুক। আলনার নীচে এক জোড়া হাঁটু অবধি উঁচু জুতো—যাকে বলে goloshes।"

অনিরুদ্ধ জানায়, "জিনিসপত্র ছেড়ে আরেকবার আমার নিজের দিকে দৃষ্টি দিলাম। এর আগে শুধু সিল্কের সার্টটা লক্ষ্য করেছিলাম। এখন দেখলাম তার নীচে রয়েছে সরু চাপা প্যাণ্ট। আরো নীচে মোজা। পায়ে জুতো নেই, তবে খাটের পাশেই দেখলাম একজোড়া কালো চামড়ার বুট রাখা রয়েছে।"

অনিরুদ্ধ আরো জানায়,—"আমার ডান হাতটা এবার আমার মুখের উপর বুলিয়ে বুঝতে পারলাম, শুধু গায়ের রং ছাড়াও আমার চেহারার আরো পরিবর্তন

হয়েছে। এত চোখা নাক, এত পাতলা ঠোঁট আর সরু চোয়াল আমার নয়। মাথায় হাত দিয়ে দেখি ঢেউ খেলানো চুল পিছনে কাঁধ অবধি নেমে এসেছে। কানের পাশে ঝুলপি নেমে এসেছে প্রায় চোয়াল পর্যন্ত।...আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছি—কিন্তু যে চেহারাটা তাতে প্রতিফলিত হয়েছে সেটা আমার নয়। কোনো এক বীভৎস ভৌতিক ভেল্‌কির ফলে আমি হয়ে গেছি উনবিংশ শতাব্দীর একজন সাহেব—তার গায়ের রং ফ্যাকাশে ফরসা, চুল সোনালি, চোখ কটা এবং সে চোখের চাহনিতে ক্লেশের সঙ্গে কাঠিন্যের ভাব অদ্ভুত ভাবে মিশেছে। কত বয়স এ সাহেবের? ত্রিশের বেশি নয় তবে দেখে মনে হয় অসুস্থতা কিংবা অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য অকালেই বার্ধক্যের ছাপ পড়েছে।"

"এরপরে যা ঘটল, তাতে বুঝলাম যে শুধু গলার স্বর নয়, আমার হাত পা সবই অন্য কারুর অধীনে কাজ করছে। কিন্তু আশ্চর্য এই, যে আমি—অনিরুদ্ধ বোস—যে বদলে গেছি—সে জ্ঞানটা আমার আছে। অথচ এই পরিবর্তনটা ক্ষণস্থায়ী, না চিরস্থায়ী, এ থেকে নিজের অবস্থায় ফিরে আসার কোনো উপায় আছে কিনা, তা আমার জানা নেই।

...রাইটিং টেবিলের দিকে চোখ পড়ল। ল্যাম্পটা এখন জ্বলছে। ল্যাম্পের নীচে খোলা অবস্থায় একট চামড়া দিয়ে বাঁধানো খাতা। তার পাশে একটা দোয়াতে ডোবানো রয়েছে একটা খাগের কলম।"

তারপর?' নীলকর সাহেবের জবানীতে অনিরুদ্ধ বোস লিখে চলে ডায়েরী। লেখে সাহেবের অত্যাচারপ্রবণতা আর অসুস্থতার কথা। পরলোকগতা পত্নী মেরী আর মৃত শিশু সন্তান তিন বছরের টোবির কথা। প্রভুভক্ত কুকুর রেক্সরে প্রতি মমতার কথা।

একসময় ডায়েরী লেখা শেষ হয়। টেবিলের দেরাজ থেকে পিস্তল বের ক'রে দরজা খুলে বাংলোর বারান্দা থেকে হাত বিশেক দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ছাই রং-এর একটা প্রকাণ্ড গ্রে হাউণ্ডকে গুলি করে। রেক্স মারা যায়। প্রভুভক্ত রেক্সকে এভাবেই মুক্তি দেওয়া হয়। নীলকর সাহেবের প্রেতাত্মা অনিরুদ্ধকে এভাবেই চালনা করে। নিজের ওপর অনিরুদ্ধের কোনো নিয়ন্ত্রণই নেই। অসহায়, একান্ত ভাবেই অসহায় সে।

দরজায় ধাক্কা পড়ে। অনিরুদ্ধের ঘুম ভাঙে। সমস্ত ঘটনাটা স্বপ্নে ঘটে যায়। স্বপ্ন থেকে বাস্তবে অনিরুদ্ধের প্রত্যাবর্তন ঘটে। আর ভৌতিক জগত থেকে বাস্তব জগতে পাঠকেরা ফিরে আসে। অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে হ'লেও রহস্য-রোমাঞ্চের জগতটি নিপুণভাবে গড়ে তোলেন লেখক। পুরনো পরিত্যক্ত নীলকুঠিকে ঘিরে অতীতের একটি রাত্রির যেন পুনরাবির্ভাব ঘটে। অতিথি অনিরুদ্ধ বোস যেখানে নীলকর সাহেবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। অবিশ্বাস্যকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসযোগ্য ক'রে তোলেন লেখক। আতঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টিতে তাঁর দক্ষতা অবশ্য স্বীকার্য।

খ্যাতনামা জনপ্রিয় সাহিত্যিক মৃগাঙ্কশেখর মুখোপাধ্যায় সম্বর্ধনা-সভা শেষ ক'রে দুর্গাপুর থেকে কলকাতা ফিরছিলেন তাঁর মোটরে। পানাগড থেকে মাইল তিনেক দূরে এসে গাড়ির তেল শেষ হয়ে গেল। ড্রাইভার সুধীর তেল আনতে পানাগড চলে গেলে মৃগাঙ্কবাবু একাকী সেখানে রয়ে গেলেন। মাঘ মাসের শেষ বিকেল। মৃগাঙ্কবাবুর চোখে পড়লো কিছুদূরে একটা সব্জীক্ষেতে একটা কাগ্‌তাড়ুয়ার মূর্তি।

সন্ধ্যের অন্ধকার প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। মৃগাঙ্কবাবুর মনে হয়, কাগ্‌তাড়ুয়া—ঐ নকল মানুষটা তাঁকে যেন প্রবলভাবে আকর্ষণ করছে। "সেটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে মৃগাঙ্কবাবু কতকগুলো জিনিস লক্ষ করে একটা হৃৎকম্প অনুভব করলেন—ওটার চেহারায় সামান্য পরিবর্তন হচ্ছে কি? হাত দুটো কি নীচের দিকে নেমে এসেছে খানিকটা? দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা কি আরেকটু জ্যান্ত মানুষের মতো? খাড়াই বাঁশটার পাশে কি আরেকটু বাঁশ দেখা যাচ্ছে? ওদুটো কি বাঁশ না ঠ্যাঙ? মাথার হাঁড়িটা একটু ছোট মনে হচ্ছে না? ...কাগ্‌তাড়ুয়া কখনো জ্যান্ত হয়ে ওঠে?...কোনো সন্দেহ নেই।...সেটা ঘুরে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে খানিকটা এগিয়ে এসেছে। এসেছে না, আসছে।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা, কিন্তু দু'পায়ে চলা। হাঁড়ির বদলে একটা মানুষের মাথা। গায়ে এখনো সেই ছিটের সার্ট; আর তার সঙ্গে মালকোচা দিয়ে পরা খাটো ময়লা ধুতি। 'বাবু!' মৃগাঙ্কবাবুর সমস্ত শরীরের মধ্যে দিয়ে একটা শিহরণ খেলে গেল। কাগ্‌তাড়ুয়া মানুষের গলায় ডেকে উঠেছে, এবং এ গলা তাঁর চেনা।

'আমায় চিনতে পারছেন বাবু?' মনে যতটা সাহস আছে সবটুকু একত্র করে মৃগাঙ্কবাবু প্রশ্নটা করলেন।—'তুমি অভিরাম না?' 'অ্যাদ্দিন পরেও আপনি চিনেছেন বাবু?' মানুষেরই মতো দেখাচ্ছে অভিরামকে, তাই বোধ হয় মৃগাঙ্কবাবু সাহস পেলেন। বললেন, 'তোমাকে চিনেছি তোমার জামা দেখে। এ জামা ত আমিই তোমাকে কিনে দিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ বাবু, আপনিই দিয়েছিলেন। আপনি আমার জন্য অনেক করেছেন, কিন্তু শেষে এমন হল কেন বাবু? আমি ত কোনো দোষ করিনি! আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করলেন না কেন?'

মৃগাঙ্কবাবুর মনে পড়ল। তিন বছর আগের ঘটনা। অভিরাম ছিল মৃগাঙ্কবাবু-দের বিশ বছরের পুরনো চাকর। শেষে একদিন অভিরামের ভীমরতি ধরে। সে মৃগাঙ্কবাবুর বিয়েতে পাওয়া সোনার ঘড়িটা চুরি করে বসে। সুযোগ-সুবিধা দুইই ছিল অভিরামের। অভিরাম নিজে অবশ্য অস্বীকার করে। ...অভিরাম বলল—'আমি জানতাম একদিন না একদিন আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে। আমার প্রাণটা ছটফট করছিল—হ্যাঁ, মৃত লোকেরও প্রাণ থাকে—আমি মরে গিয়ে যা জেনেছি সেটা আপনাকে বলতে চাইছিলাম।'

'সেটা কী অভিরাম?' 'বাড়ি ফিরে গিয়ে আপনার আলমারির নীচে পিছন দিকটায় খোঁজ করবেন। সেইখানেই আপনার ঘড়িটা পড়ে আছে এই তিন বছর ধরে।' 'অভিরামকে আর ভালো করে দেখা যায় না—সন্ধ্যা নেমে এসেছে।"

ড্রাইভার সুধীরের ডাকে ঘুম ভেঙে যায় মৃগাঙ্কবাবুর। "গল্পের প্লট ফাঁদতে ফাঁদতে কলম হাতে গাড়ির মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তিনি। ঘুম ভাঙতেই তাঁর দৃষ্টি চলে গেল পশ্চিমের মাঠের দিকে। কাগ্‌তাড়ুয়াটা যেমন ছিল তেমনভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িতে এসে আলমারির তলায় খুঁজতেই ঘড়িটা বেরিয়ে পড়ল।"

স্বপ্নে কাগ্‌তাড়ুয়া হয়ে যায় অভিরাম। স্বপ্নে সবই সম্ভব। কিন্তু স্বপ্নে অভিরাম-কথিত ঘড়ির হদিশ বাস্তবে সত্য হয় কী ক'রে? অভিরামের আনুগত্যের প্রমাণ এতে যেমন পাওয়া যায়, তেমনি মৃগাঙ্কবাবুর অনুতাপটুকুও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে বৈকি! ভূতের গল্প এভাবেই মানুষের আত্ম-সমীক্ষণের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

রূপান্তরের ব্যাপারটা বোধ করি সত্যজিতের ভূতের গল্পের একটা সাধারণ লক্ষণ। অনিরুদ্ধ বোস নীলকর সাহেবে যেমন পরিবর্তিত হয়, অথবা কাগ্‌তাড়ুয়া যেমন অভিরামের বেশে দেখা দেয়, তেমনি মানুষ রূপান্তরিত হয় রক্তচোষা বাদুড়ে ('বাদুড় বিভীষিকা') বা খেলনা পুতুল ক্রিংস রূপান্তরিত হয় নরকঙ্কালে ('ক্রিংস')। 'বাদুড় বিভীষিকা' রক্ত হিম ক'রে দেয় এমন এক গল্প। আর 'ক্রিংস' গল্পের উপসংহারে পাঠক বিস্ময়ে বিস্ফুরিত হয়। 'ভূতো' গল্পটিও প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য। ভেনট্রিলোকুইজ্‌ম-এর খেলা দেখানোর জন্য যে পুতুলটি নবীন বানায় সেই পুতুল-টিরই নাম—'ভূতনাথ' বা 'ভূতো'। এ খেলার আর এক ওস্তাদ শিল্পী অক্রুর চৌধুরী নবীনের প্রতিভায় (বিশেষত ভূতোর মূর্তিটি স্বয়ং অক্রুর চৌধুরীর আদলে তৈরী হওয়ায়) তার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। 'ভূতো'র মাধ্যমে যাদু-সহায়তায় নবীনকে তাই অপদস্থ করতে চায় অক্রুর চৌধুরী। এও তো এক ধরণের রূপান্তর।

'রতনবাবু আর সেই লোকটা' বিচিত্র প্রতিশোধ প্রবণতার গল্প। বিবেক-তাড়নার গল্প 'মিঃ শাসমলের শেষরাত্রি'। ভূতের গল্পের উপভোগ্য রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত সৃষ্টিতে দু'টি গল্পেই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সত্যজিৎ। শেষোক্ত গল্পটিতে সে কৃতিত্বের পরিমাণ অবশ্যই বেশি।

হানাবাড়ির পটভূমিকায় লেখা 'অনাথবাবুর ভয়' আর 'ব্রাউন সাহেবের বাড়ি' গল্পে সত্যজিৎ পাঠককে নিয়ে যান ভূতের জগতে। অন্য গল্পগুলির সঙ্গে এখানেই এ দু'টি গল্পের তফাৎ। এ দু'টি গল্পে আমরা পৌঁছুই ভূতের রাজ্যে, কিন্তু অন্য গল্পগুলিতে ভূতেরা নেমে আসে মানুষের জগতে।

মানুষ ভূতকে ভয় পায়, এতো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু ভূত মানুষকে ভয় পায়, এমনতরো ব্যাপার ঘটে থাকে বৈকি! 'রামধনের বাঁশী' গল্পটি তার উদাহরণ। মোট কথা, সত্যজিতের গল্প-সাহিত্যে তাঁর ভূতের গল্পগুলির একটা বিশেষ স্থান আছে। আর তাঁর গল্পের ভূতগুলিও অসাধারণ। পাঠকের মনের গভীরে রেখাপাত করার ক্ষমতা রাখে তারা।

অঙ্কন-শিল্পে সত্যজিৎ

সন্দীপ সরকার

প্রচ্ছদশিল্পী সত্যজিৎ রায়

নিবন্ধের বিষয় নির্দিষ্ট। তবু, বইয়ের প্রচ্ছদ আঁকা, ফলিত ললিতকলাকার হিসাবে সত্যজিৎ রায়ের সামগ্রিক অবদানের কথা মনে রাখলেও এ নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করার আগে কয়েকটি বিষয়ের ধারণা পরিষ্কার করা দরকার।

সাধারণত ভাস্কর্য, চিত্র এবং স্থাপত্যকে উচ্চাঙ্গ শিল্পকলা মনে করা হয়। এর কাছাকাছি ধরা হয় মণ্ডনধর্মী নকশাকারী কাজকে। হাই আর্টের ঠিক নিচেই আছে ডেকরেটিভ আর্টস। আর এর ঠিক বিপরীত দিকে রয়েছে গ্রামের শিল্পীদের করা লোকশিল্প এবং কারুকলা। এর সঙ্গে নৃতাত্ত্বিক তৎপরতায় শিল্পকলার আঙিনায় আদিম শিল্পকলা অন্য মহিমা অর্জন করেছে। ছাপাখানার উদ্ভবের পর পুস্তকের সচিত্রকরণের প্রয়োজন পড়ল। ড্যুরারের মতো চিত্রকর ছাপাই ছবির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছবার পথ খুঁজে পেলেন। ১৪৯৮-এ বাইবেলের 'নববিধানে'র শেষ গ্রন্থ 'প্রকাশিত বাক্য' (রিভিলেসান) সচিত্র সংস্করণ তিনি প্রকাশ করলেন। প্রলয়ের দ্বার অবারিত হল। তাঁর কাঠখোদাই নতুন মাত্রা যোগ করল শেষবিচারের বিষয় কল্পনার ছবিতে। ড্যুরারের মতোই জনসাধারণের কাছে পৌঁছবার জন্য গইয়া, পিকাসো থেকে হালের শিল্পীরাও ছাপাই ছবির আশ্রয় নিয়েছেন। এখন আবার কেউ কেউ ছাপাই ছবিকে ভাস্কর্য, চিত্র, স্থাপত্যের মতোই সৃজনশীল মাধ্যম মনে করেন। কিন্তু ছাপাই ছবি (প্রিন্ট মেকিং) আর ছাপাখানার নকশাকারের (গ্রাফিক ডিজাইনার)-এর মধ্যে মস্ত তফাৎ রয়েছে। আমাদের ছেলেবেলায় চারুকলা (ফাইন আর্টস) আর কমারশিয়াল আর্ট (বাণিজ্যিক কলার) তফাৎ করা হতো। এখনও গভর্নমেণ্ট আর্ট কলেজে চিত্রকলার তিনটে ধারা—ফাইন আর্ট, ওরিয়েণ্টাল বা ইণ্ডিয়ান আর্ট এবং কমারশিয়াল আর্ট—পাঠ্য। কমারশিয়াল শব্দের মধ্যে আঁশটে পচা পচা গন্ধ পান অনেকে। সুতরাং অ্যাপ্লায়েড আর্ট বা ফলিত ললিতকলা কথাটা চালু হয়েছিল। ইদানীং অবশ্য মার্কিন মুলুক থেকে আমদানি 'গ্রাফিক ডিজাইন' বা ছাপাই নকশা এদেশে খুব ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যে ধরণের শিল্পকলার কথা বলছি, সেগুলির তুলনায় ছাপাই নকশা শিল্পকলার উপজাত রূপ বাই প্রোডাক্ট। বাণিজ্যিক, ললিতকলার ফলিত রূপ এই ছাপাখানার নকশা ব্যবসায়িক কারণে এবং বাণিজ্যের স্বার্থে ব্যবহৃত। এর নান্দনিক দিকটা

সীমিত। কারণ মানুষের মনের কাছে গভীর নিভৃতে কোনও উপলব্ধির রহস্যের যবনিকা তুলে ধরা এই শিল্পের উদ্দেশ্য নয়। এক্ষেত্রে বিষয়ে ছাপাখানার কারিগরিকে কেন্দ্র করেই চলে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান অতি সামান্য। দ্রব্যকে পরম লোভনীয় পরমার্থ হিসাবে তুলে ধরাই উদ্দেশ্য। কিন্তু কখনও কখনও প্রচারমূলক বাণিজ্যিক অভিযান শেষে নান্দনিক কিছু চাক্ষুষ উপহার রেখে যান নকশাকার। সত্যজিৎ রায় প্রকৃতই সৃজনশীল বলে তাঁর এসব কাজেও নান্দনিক ছোটখাটো উপহারের প্রাচুর্য রয়েছে।

সত্যজিৎ রায় নিজেকে ফলিত ললিতকলাকার হিসাবেই দেখতেন, চিত্রকর হিসাবে নয়। অতি উৎসাহে তাঁকে উচ্চাঙ্গের শিল্পীদের আসন দিতে গেলে তিনি প্রবল আপত্তি তুলতেন। দৃঢ়তার সঙ্গে সবিনয়ে এমন সম্মানজনক আখ্যা প্রত্যাখ্যান করার ঘটনা জানি।

তাঁর ছবি আঁকা প্রধানত প্রকাশনা আর বিজ্ঞাপনকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল। এ বিষয়ে তিনি নিজস্ব শৈলী গড়ে তুলেছিলেন। যেমন তাঁর আগে তাঁর অগ্রজপ্রতিম অন্নদা মুন্সীর ছবিতে এই ধরণের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলেন। ওঁর সমসাময়িকদের মধ্যে অরুণচন্দ্র গাঙ্গুলি (ও. সি. গাঙ্গুলি, ছোট) এবং মাখন দত্তগুপ্তের শৈলী-বৈশিষ্ট্যের জন্য নাম কম ছিল না। ছোট ও. সি.-র প্রচারপত্র (পোস্টারের) ছবি ছাপা হয়েছিল দশকয়ারি আন্তর্জাতিক ফলিত ললিতকলা গ্রন্থে পিকাসোর পাশে। কিন্তু আলোকচিত্রের মতো ছাপাই নকশার কাজ খুবই তাৎক্ষণিক। সকালে ফুটে ওঠে বিকেলে ঝরে পড়ে।

বাণীনির্ভর ফলিত ললিতকলা। কথা আর বক্তব্যকে আকর্ষণীয় এবং দর্শনীয় দৃশ্যকল্পে রূপান্তরের কাজে চতুর্থ দশক থেকে নতুনরকম পরীক্ষা শুরু হল। বিজ্ঞাপনের ছবিতে দেশজ আবহ রচনার চেষ্টা হল। গরানহাটার কাঠখোদাইয়ের শিল্পীদের কাজে স্পষ্ট দিশিভাব ছিল। তাঁদের কাজেও শহুরে ছায়া পড়েছিল। কিন্তু তা ঔপনিবেশিক আমলের সামন্ততান্ত্রিক ছবির মতো গ্রাম্য। মুন্সী, রায়, গাঙ্গুলি আর দত্তগুপ্ত প্রমুখের ছবিতে অবশ্য দিশিভাবের ভেতর ঝিলিক দিল আধুনিকতা। ওদের ছবির সঙ্গে বটতলার বই আর পাঁজির ছবির তফাৎ অনেক। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হল, বিজ্ঞাপন আর প্রকাশনার ছবিতে এঁরা যে দিশি উপকরণ যোগ করলেন, তার সূত্র তাঁরা পেলেন আধুনিকতা বিরোধী অবনীন্দ্রানুসারী নব্য ভারতীয় কলমের শিল্পীদের কাজ থেকে, যামিনী রায়ের কাজ থেকে। সত্যজিৎ রায়ের আগে যিনি প্রচ্ছদে শিল্পকলার মহিমা যোগ করেছিলেন তাঁর নাম আশু বন্দোপাধ্যায়।

চতুর্থ দশকে ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্পীদল, চিত্তপ্রসাদ, জয়নুল আবেদিনের ছবির মানসিকতার সমসাময়িক এইসব ছাপাই নকশাকাররা। তাঁদের কাজে সৃজনশীল শিল্পধারার মানসমহিমার প্রভাব পড়েছিল। প্রকাশনা ও পুস্তক

অলঙ্করণের ক্ষেত্রে গগনেন্দ্রনাথের আঁকা 'রক্তকরবী'র প্রচ্ছদ, শিশু সাহিত্যে উপেন্দ্রকিশোরের আমল থেকে প্রতুল বন্দোপাধ্যায়ের সময় পর্যন্ত সচিত্র-করণের দীর্ঘ দশকগুলির পরীক্ষা ছিল। কমলকুমার মজুমদারের 'আইকম বাইকমে'র জন্য রচিত কাঠখোদাইয়ের কথা যেমন মনে পড়ে। প্রকৃত ইতি-হাস লিখতে গেলে আরও অনেকের কথা বলতে হবে।

মলাটের যুগান্তর ঘটিয়েছিল বিশ্বভারতী। ধূসর কাগজে শুধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সই আর 'স ঞ্চ য়ি তা' শব্দটি ব্যবহার করে অসামান্য নান্দনিক উপহার তৈরী করা যে যায়, তা কে জানতো! তেমনি নির্ভুল সুদৃশ্য ছাপা বইগুলি।

চতুর্থ দশক থেকেই বিজ্ঞাপনী চিত্র আর প্রকাশনার মলাট আর অলঙ্করণের ক্ষেত্রে নতুনতর পরীক্ষা শুরু হল। দিলীপ গুপ্তের নেতৃত্বে সিগনেট প্রেসের প্রকাশিত নানা বইয়ের কথা অনেকের মনে পড়বে। 'পথের পাঁচালি'র শিশু সংস্করণ 'আম আঁটির ভেঁপু' থেকে 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণে'র নামাবলীর মতো অলঙ্করণের পরীক্ষাগুলি মনে পড়বে। বনলতা সেন, সংবর্ত, সমর সেনের কবিতা, পিরানদেল্লো আর মমের গল্পের মলাট। দিলীপ গুপ্ত ছাপার ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীর নির্ভুল মুদ্রণের

ঐতিহ্যকে স্বীকার করেও সরে এলেন। পাতার ওপর ছাপার অক্ষরের দূরত্ব, কালির সমতা, শব্দ, বাক্যবন্ধ এবং পংক্তি বিন্যাসের ক্ষেত্রে আধুনিকতম উপস্থাপনার কায়দাকানুন ব্যবহার করলেন। সেক্ষেত্রে সত্যজিৎ রায়ের প্রচ্ছদচিত্র এবং অলঙ্করণের সহায়তা তিনি পেয়েছিলেন। আশু বন্দোপাধ্যায় থেকে তরুণতর সমীর সরকার পর্যন্ত প্রচ্ছদ শিল্পীরা সিগনেট প্রেসের মতো প্রকাশনার সংস্থাগত সহায়তা দীর্ঘকাল ধরে পান নি। পেলে কি অসাধারণ লাভ হয়, তা সমর ঘোষ বিচিত্রিত, 'ক্ষীরের পুতুল', মাখন দত্তগুপ্ত অলঙ্কৃত 'শকুন্তলা' দেখলে বোঝা যায়। লীলা মজুমদারের 'পদী পিসির বর্মী বাক্সো' অহিভূষণ মালিকের চিত্রণ আর অলঙ্করণ ছাড়া অসম্পূর্ণ। শেষের বইটার কথা প্রসঙ্গে বহু আগে প্রকাশিত পরশুরামের প্রথমদিকের গল্পগুলির সঙ্গে যতীন সেনগুপ্তের সচিত্রকরণ মনে পড়বেই।

সুতরাং বিজ্ঞাপনী ও প্রকাশনার জন্য রচিত সত্যজিৎ রায়ের ছাপাই নকশার স্বকীয়তা থাকলেও, সেগুলি নিরালম্ব নয়। চলচ্চিত্র এবং শিশুপাঠ্য সাহিত্যে তাঁর অবদানের জন্য তাঁর ছাপাই নকশার কাজগুলি প্রতিফলিত গৌরব পাচ্ছে। ছাপাই নকশার ক্ষেত্রে রুচি, সারা দিনে রোদের ভেতর আলোর পরিবর্তনের মতো, দ্রুত বদলায়। সত্যজিৎ স্বরচিত শিশুপাঠ্য বইয়ের জন্য মলাট আর ছবি এঁকেছেন লেখার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমৃত্যু। ফলে সেগুলো ছাপাই নকশার সমসাময়িকতার নির্মোক খুলে ফেলেছে। তাঁর বইয়ের সমান আয়ু ওইসব কাজগুলির। বিজ্ঞাপনী সংস্থার জন্য অঙ্কিত বিজ্ঞাপন, প্রচারচিত্র, প্রাচীরচিত্রে কোনও নাম থাকে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে স্বরচিত শিশুপাঠ্য বইয়ের প্রচ্ছদ, সচিত্রকরণ এবং অলঙ্করণের ক্ষেত্রে তাঁর পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর এবং পিতা সুকুমারের অবদান কম নয়। সত্যজিতের সময়ে এক্ষেত্রে ছাপাই নকশাকারদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল।

তবুও স্বীকার করতেই হবে 'সন্দেশ' সম্পাদনা আর ছোটদের জন্য লেখালিখি শুরু করার পর থেকেই, তাঁর মলাট আঁকা ছবি, অলঙ্করণ, সচিত্রকরণের ক্ষেত্রে অন্যরকম ভাবনা কাজ করেছে। তিনি সেলুলয়েডের আলোছায়ার ফিতে নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন বলে, কিছুদিন খোঁজ রাখতেন না। ছাপাখানার সবকিছু কত দ্রুত বদলে যাচ্ছে। অক্ষরবৃত্ত ছাপাখানা (লেটার প্রেসের) মতো করে মলাটের ছবি এঁকেছেন। যেন ছবি ব্লক করে ছাপা হবে। ড্রইং কাগজে মাপ মতো প্রচ্ছদের রঙিন ছবি এঁকে, তার ওপর ট্রেসিং কাগজ সেঁটে, মূল রেখাচিত্র এঁকে, পর পর রঙের জন্য ব্লকের নির্দেশ দিয়েছেন। দুটি তিনটে মূল রঙ আর ওই দুইয়ের মিশ্রণে তৈরি তৃতীয় রঙ এবং মলাটের কাগজের রঙ ধরে প্রচ্ছদ পরিকল্পনা করেছেন।

ইতিমধ্যে অফসেট ছাপার কল্যাণে এত খুঁটিনাটি কাজ যে দরকার নেই, মূল রঙিন ছবিটা স্ক্যান করে যান্ত্রিকভাবে সরাসরি ছাপা যায়, তিনি হয়তো জেনে-ছিলেন। বিপুল গুহ তখন আনন্দবাজারের শিল্প-নির্দেশক। তিনি সত্যজিতের

মূল ছবি ধরেই কাজটা করে ফেলতেন। সম্ভ্রমবশত এমন এক বড় মানুষের ভুল ভাঙাতেন না। ব্লক করে ছবি ছাপার পদ্ধতিতে তাঁর বইয়ের মলাট আর ছবি মুদ্রিত না হলেও, অফসেটে তাঁর ছবি থেকে সরাসরি ছাপার অসুবিধা হতো না। শেষের দিকে অবশ্য অফসেটে ছাপার বিশেষত্ব তাঁর মলাটের ছবিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

সত্যজিতের সচিত্রকরণ দেখলে শান্তিনিকেতনের কলাভবনের শৈলীর ছায়া কেউ কেউ দেখেন। তাঁর কিছু কাজে, রেখার চলার ছন্দ, ছায়াসুষমা আর কুচি-কুচি কিরিকিরি রেখার চিকুর জালে নন্দলাল বসুর ছন্দিত রেখার ঠাট ঠমক চলন আছে। কিন্তু সাধারণত সত্যজিতের রেখা কড়া আর খাড়া। সম্মুত (কনট্যুর), যদিও দ্বিমাত্রিক সমতলতা তিনি বজায় রাখার চেষ্টা করতেন। তাঁর অঙ্কনে ফিটফাট অতি আধুনিক একটা ব্যাপার থাকে। কারণ গল্পের কুশীলব, প্রোফেসর শঙ্কু, ফেলুদা এবং তাঁর সহকর্মীরা, সবাই শহুরে। গল্পের পবিবেশ আধা সামন্ত-তান্ত্রিক তীর্থক্ষেত্র, প্রাক্তন দেশীয়রাজ্য, বা পাহাড়ি দেশ থেকে হালের ঔপনিবেশিক আমলের বাসিগন্ধ জড়ানো শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। সেই সূত্রেই আসে হিল-স্টেশন। শিশুদের দেখা জানা জগৎটার ওপর একটা অদেখা মাধুর্য যোগ করতে চাইতেন তিনি। ফলে চারুকলার চোরাচালানকারী, নিলামের ঘর, পুরানো জিনিসের দোকান, গলিঘুঁজি, বিচিত্র বেশবাস করা মানুষজন আর পশ্চিমি কল্পবিজ্ঞানের আবহ মিলিয়ে রচনা করতেন। আধ্যেক আলো আর আধ্যেক ছায়ার নিবিড় জগৎ। পরিবেশটা ভারতীয় হলেও, অঙ্কনের মানসিকতা প্রতীচ্যের। তাঁর মলাট, অলঙ্করণ আর সচিত্রকরণের ভেতর যুক্তিস্বিদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী, বাস্তববাদী দর্শন, শরীরবিদ্যাসম্মত অথচ রূপারোপিত অঙ্কনের পরম্পরার স্বীকৃতি আছে। চলচ্চিত্রে নিসর্গ, গ্রাম আর শহরের দৃশ্যের দেশজ পরিবেশে তাঁর সাহেবি মেজাজ-মর্জি ধরা পড়ে নি। ধরা পড়ে নি 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' বা 'আম আঁটির ভেঁপু'তে। সেখানে বিষয় ছাপাই নকশাকারের কাছে নিজস্ব দাবী নিয়ে এসেছে। কবিতার আধুনিকতা নন্দলালী আঁকার ঢঙে করা যায় না। রেখার জাল নিয়ে বনলতা সেন বা রেখার ঘূর্ণি নিয়ে সংবর্তের প্রচ্ছদে যে কাজ করেছেন তার সঙ্গে শান্তিনিকেতন কলাভবনের আত্মীয়তা দূরের। পশ্চিমের অভিঘাতে হৃদয়ের জাগরণ ঘটার পর ভারতীয় মানসে যে উদ্ভাবনী শক্তির নবজন্ম হল, ছাপাই নকশাকার সত্যজিৎ রায়ের কাজে তার প্রতিভাস আছে। জন্মগত ও শিক্ষা-সূত্রে তিনি ভারতের জল-মাটির গুণেই উঠে এসেছেন। তিনি যেখানে ভারতীয় চিত্রলেখ—মোটিফ—অলঙ্করণে ব্যবহার করেছেন, সেখানেও যে নকশাকারি নীতিতে প্রয়োগ করেছেন তা সাহেবি। তাঁর মাপজোক সৌকর্য পশ্চিমী। চিত্রকলার ক্ষেত্রে অঁরি মাতিস যেমন পশ্চিম এসিয়ার নকশার লালিত্য এবং বাহারি রঙের বুনোট গ্রহণ করে প্রতীচ্যের করে নিয়েছেন। সত্যজিৎ মলাটের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাচ্য দৃশ্যকল্পকে

প্রতীচ্যের মতো করে ঢেলে সাজিয়েছেন। ভারতীয় মানসে পাশ্চাত্যকরণের জন্য বিশেষত সমকালীন ভারতীয় চিত্রকলায় পশ্চিমের ভাবধারার প্লাবন এসেছে বলেই সত্যজিতের প্রচ্ছদ বা সচিত্রকরণ বিজাতীয় লাগে না। দুই চিত্ররীতির অন্তঃসলিল সঙ্গমে তাঁর শৈলীতে যে মিশ্রিত হয়েছে তা আর মানুষের মনে হয় না। একটি উদাহরণ নিলেই আমার বক্তব্য পরিষ্কার হয়ে যাবে। সুকুমার রায়ের সচিত্রিত যে কোনও শিশুপাঠ্য বইয়ের সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরমার ঝুলি' ছবির কলম (শৈলী) তুলনা করলে পার্থক্যটা স্পষ্ট হবে। দক্ষিণারঞ্জনের বইয়ের ছবিতে গরানহাটার কাঠখোদাই শিল্পীদের লৌকিক দিকটা ফুটে উঠেছে। সুকুমারের সচিত্রকরণে একটা আধুনিক বিলেতফেরৎ চাকচিক্য আছে। তখনকার বিলাতি শিশুদের বইয়ের বিচিত্রিত করার ঢঙ, 'পাঞ্চ' পত্রিকার কার্টুনের উদাহরণ, মুদ্রণের আধুনিকতম বিজ্ঞান—হাফটোনের ব্যবহার, এসব আয়ত্তে থাকার জন্যেই তিনি প্রযুক্তিগত পরীক্ষার সুযোগ-সুবিধা নিয়েছেন পুরোমাত্রায়। তেমনই তাঁর রঙ্গ, ব্যঙ্গ আর কৌতুকবোধের জন্য ছবি হয়েছে মজার। পশ্চিমের সংস্পর্শে যন্ত্রতন্ত্র সমাজের মানসিকতায় ওঁর পিতা সুকুমার রায়ের মতোই সত্যজিৎও আজন্ম লালিত হন। প্রতীচ্যের ভাবধারা ভারতীয় পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার যে চেষ্টাটুকু ব্রহ্ম-বাদীরা করেছিলেন, তাঁর ভেতরেই আশৈশব লালিত হয়েছিলেন সত্যজিৎ। মুদ্রণের ক্ষেত্রে বইয়ের কল্যাণে তাঁর পিতা এবং পিতামহের উদাহরণ ছিল। ফলিত ললিতকলাকার হিসাবে তিনি স্বতন্ত্র এবং অনন্য হবেন আপন প্রতিভাবলে, এটাই তো স্বাভাবিক।

মোটামুটি প্রকাশকাল দেখলে সপ্তম দশকের মাঝামাঝি থেকে তাঁর আঁকা বইয়ের মলাটে একটা বড় রকমের অদল-বদল ঘটল। সিগনেট প্রেসের বইগুলি ছিল ব্লকের কথা মাথায় রেখে করা। আনন্দ পাবলিশার্সের প্রচ্ছদ তেমনি আবার নতুন ধারার অফসেট মুদ্রণের উপযোগী। রঙের ক্ষেত্রে চারটি বর্ণে বিভাজনের (স্ক্যানের) মতো করে করা। এর দুটো দিক। একদিকে অলঙ্কৃত হরফ। অন্যদিকে চরিত্র এবং ঘটনার পরিবেশ বর্ণনার সামান্য আভাস দিতেন। বইয়ের স্পাইনে অবশ্য মুদ্রিত হরফে বইয়ের নাম, তাঁর নাম এবং প্রকাশকের সংকেত চিহ্ন—লোগো—সাধারণত দুটি বিপরীত বর্ণের সমাবেশে করেছেন। বইয়ের নাম আর নিজের নাম আড়াআড়ি রেখেছেন, যাতে যেমন বইয়ের তাকে থাকলে চট করে পড়া যায়। প্রকাশকের সংকেত চিহ্ন, যা তাঁরই আঁকা, তা স্পাইনে সোজা করেই ছাপার ব্যবস্থা করেছেন। যাতে বইগুলি সহজে সনাক্ত করা যায়।

সিগনেটের বই তাঁর নিজের লেখা নয়। তাছাড়া সেগুলির বেশিরভাগই প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকের জন্য। সুতরাং সেগুলির প্রচ্ছদ সেই অনুযায়ী করেছেন। পক্ষান্তরে আনন্দ পাবলিসার্সের বইগুলি—তাঁর পিতার রচনাসমগ্র আর 'সন্দেশে'র সংগ্রহ বাদ দিলে—সবই তাঁর নিজস্ব রচনা। 'বিষয় চলচ্চিত্র' ব্যতিরেকে সবই

শিশুর চেয়ে কিশোর বয়সীদের জন্য লেখা। প্রচ্ছদও সেই প্রয়োজনে এঁকেছেন। মোটামুটি মলাটগুলি তিন ধরণের। প্রথমত রয়েছে একটি সরলীকৃত ছবিতে বইয়ের কুশীলব, স্থান এবং কালকে চিত্রিত করার চেষ্টা। দ্বিতীয় আবেক ধরণের বইতে বর্ণময় অলঙ্কৃত হরফের ব্যবহার। এই দুই ধারার ব্যতিক্রম আছে দুটি বইতে। প্রথমে সেই দুটি নিয়ে আলোচনা করে নেবো।

'মোল্লা নাসিরুদ্দিন'-এ পটভূমি এবং ছবি সমতল লালচে বেগুনি রঙের পট-ভূমিতে মোল্লা সাহেবের ছবিটা এঁকেছেন। ছবির পটের সংলগ্ন অথচ বাইরে চিলতে সাদা আযতক্ষেত্র। আযতক্ষেত্রকে ঘিরে আরেকটা আযতক্ষেত্রে হলুদ ছোট ছোট ত্রিভুজের পাড। মূল পটভূমিতে নাসিরুদ্দিনের আজানুলম্বিত পাঞ্জাবি বেবি ফ্রকের মতো। পাঞ্জাবির বুকে ফুলকারি নকশা। মাথায় তেরছা পাগড়ি জোবালো রেখায চডানো। পাযে নীল নাগরা। মোল্লাব ছবিটা সরলীকৃত কাটা ছবি—অ্যাপলিকের মতো। বর্ণের বিরোধাভাসের মধ্যে, কালোতে নিজের নাম ছোট হরফে ছাপলেও, চোখে পড়বেই। অঙ্কন ও বর্ণে অন্য কাল, স্থান ও পাত্রের ইংগিত দিয়েছেন সহজে।

'যখন ছোট ছিলাম' বইটিতে আবার নিজের ফিকে হযে যাওযা ছোটবেলায় প্যান্ট সার্ট পরে স্টুডিওতে তোলা ফোটোগ্রাফ ব্যবহার করেছেন। ডিমের ছাঁদের ফ্রেম ব্যবহাব করে আলোকচিত্রকে 'এডনা লরেন্স' বা 'বোর্ন এ্যাণ্ড সেপার্ডে'র বিলিতি প্লেটে তোলা ছবির জগতের কথা মনে করিযে দিয়েছেন। কালো কাপড়ে মাথা ঢাকা ফোটাগ্রাফার তাঁর ম্যাজিক বাকসো নিযে এতে অদৃশ্য থেকেও উপস্থিত আছেন যেন। আয়নার মতো ফ্রেমের সামনেই চন্দ্রমল্লিকার জন্য 'যখন প্রথম ধরেছে কলি আমার মল্লিকা বনে' অনুষঙ্গ হিসাবেই কিভাবে বেজে ওঠে। যদিও রবীন্দ্রনাথের গানের আবহ শৈশবের নয। কিন্তু ছবিতেও চেতনার প্রবাহে নানারকম ঢেউ উঠে আসে। রেগেছেন লালচে হালকা গোলাপি রঙের বিস্তারে সবুজে বইয়ের নামে বিপরীত কালোতে নিজের নাম। চমক সৃষ্টি হয়। 'সোনার কেল্লা'-তেও আলোকচিত্রের ব্যবহার আছে কিন্তু একটু ভিন্ন ভাবে। এখানে ফেলুদার রিভলবার হাতে ছবিটা আসলে চলচ্চিত্রে ওই ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ফোটো। নীল আকাশের গাযে বালিমাগা ভাঙ্গাচোরা রাজস্থানী বহুতল বাড়িঘর-গুলো গলির দুদিকে ঈষৎ হেলানো। ইঁট রঙের জাফরির জানলাগুলো। রক্তের ছোপ লাগা যেন। সাঁটা ছবির-কোলাজের মতো।

কোনও কোনও বইতে তিনি হরফ বর্ণবহুল অলঙ্করণ করে মণ্ডনধর্মী নানা মজাদার নয়নসুখকর মনোরম খেলায় দর্শককে মাতিয়েছেন। যেমন 'একের পিঠে দুই' পর পর তিনটে শব্দকে সবুজে, ফিকে গোলাপির ওপর সাজিয়েছেন ১ ও ২ সংখ্যাকে নানাভাবে। সাজিয়ে তারপর কালোতে স্পষ্ট করে ওপরে নিজের নাম ছেপেছেন। 'এক ডজন গল্প' তিন লাইনে রঙিন ঢেউয়ের মতো করে কাঁপা কাঁপা

অনুভূমিক। অক্ষরগুলি সাদা পটভূমির ওপর কালচে নীল, গোলাপি, হালকা নীল, কালচে সোনাঝরা হলুদে প্রতিটি অক্ষরে ঢেউয়ের মতো পর পর রেখেছেন। এর সঙ্গে মিলিয়ে করা লেখকের নাম। 'এবারো বারো' ঢেউয়ের মতো না হলেও একজায়গায় নামটা ঠিক রেখে, অক্ষরগুলোকে প্রতিধ্বনির মতো ভেঙ্গে ভেঙ্গে সাজিয়েছেন পাশাপাশি। আবার ভিন্ন ভিন্ন রঙে একজায়গায় নামটা ওপর নীচে পর পর কোণাকুনি সত্যজিৎ রায় নামখানি আছে লালে। সাজানো এবং এলোমেলো অক্ষরের মধ্যে দরকারি শব্দগুলি চোখে পড়বেই। হালকা নীলের ওপর বাঁকা সাদায় দুই পংক্তিতে বিন্যাস করেছেন 'আরো / বারো'। এর ওপরে আছে লালে বড় হরফে নিজের নাম। মাঝারি হরফে। স্পাইনে হরফের বর্ণিকাভঙ্গ বদলে দিয়েছেন। নীলে রেখেছেন নিজের নাম। লালে বইয়ের নাম। সবুজ আর সাদায় প্রকাশকের সংকেত চিহ্ন।

মণ্ডনধর্মী বিচিত্রিত বা রঙিন বোল্ড বড় আকারের ছাপাখানার অক্ষরের লেখা অবশ্য সব বইতে আছে। অন্য বইগুলিতে স্থান কাল পাত্রের সচিত্রকরণ। যতদূর মনে পড়ে—স্মৃতি ছলনা না করলে বলতে পারি 'ফেলুদা ওয়ান / ফেলুদা টু' পর পর পংক্তি দুটো যথাক্রমে বেগুনি আর লালচে হলুদ রঙে বিচিত্রিত। পংক্তি দুটোর ওপর বাঁ-পাশে লালমোহন আর ডানপাশে তপসে আছে কালোতে। কালোতেই সব ওপরে ছাপা লেখকের নাম। একটি বইতে আবার পটভূমি একটা খাড়া রেখা দিয়ে সমান দুই ভাগে বিভক্ত। একপাশে খাড়া, বাঁ দিকে পাশ ফেরানো 'নেপোলিয়ানের চিঠি', অন্যদিকে ঠিক সেইভাবে 'এবার কাণ্ড কেদারনাথে' উপস্থাপিত। এর সঙ্গে আছে ফেলুদার মুখ। চুলে আর উচ্চকিত আলোর বিপরীতে ছায়া ছায়া অন্ধকার অংশে আছে রেখার আঁচড়। কোনাচে করে কাগজ কেটে আয়তক্ষেত্রের ওপর আয়তক্ষেত্রের একঘেয়েমিকে ভেঙ্গেছেন এলোমেলো অথচ সাজানো খাঁজ কেটে 'পিকুর / ডায়রি / (ডান দিকে সরিয়ে) ও / অন্যান্য' বইটিতে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা সাদা আয়তক্ষেত্রে বিন্যস্ত। পরপর পংক্তিতে সাদা পঠভূমিতে হালকা নীলে। পংক্তির ওপর নিজের সই ব্যবহার করেছেন। পেছনের খোঁচ-খাঁচ কাটা বড় আয়তক্ষেত্রটি আবার কালচে সোনালি হলুদাভ। পুরনো হলুদ হয়ে যাওয়া কাগজের মতো। হরফের কারিবুরি একটু আড়ালে স্পষ্ট রেখেও অবয়বী চিত্রাঙ্কনকে প্রাধান্য দিয়ে আরেকরকম প্রচ্ছদও তিনি এঁকেছেন। এই ছবিগুলো রঙিন অঙ্কন—কার্বরড্ ড্রইংস—পর্যায়ের। তিনি ছাপাই নকশাকে চিত্রের—পেন্টিং-এর পর্যায়ে নিয়ে যাবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। প্রচ্ছদ ছাপাই নকশা—গ্রাফিক ডিজাইন—চিত্র নয়, একথা ভুলে যান বলেই ললিতকলাকার, চিত্রকর, প্রচ্ছদ আঁকতে গিয়ে ব্যর্থ হন। তিনি কিন্তু কখনই প্রচ্ছদের ফলিত দিকটার কথা ভুলে যান নি। ঔপন্যাসিকের পক্ষে নাটক লেখা যেমন প্রায় অসম্ভব, এও তেমনি। প্রচ্ছদ আঁকার গুলুকসন্ধান জানা সত্বেও, সত্যজিৎ কিন্তু অফসেট মুদ্রণ আসার পূর্ব

সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন নি। বর্ণবিভাজনের—স্ক্যানিং-এর সুবাদে চিত্রের শর্তগুলি আরও নিখুঁতভাবে মানা যায়, ছাপাই ছবির সংকীর্ণক্ষেত্র থেকে চিত্রের তেপান্তরে যাওয়া যায় আজকাল। ব্লকের ক্ষেত্রে ছবির জটিল দিকগুলো আনলে খরচ বাড়তো। কিন্তু অফসেট মুদ্রণে রঙিন প্রচ্ছদের ক্ষেত্রে দামের কমবেশি হয় না। ছবির মতো করে আঁকলে, বা ছাপাই ছবির মতো করে আঁকলে খরচা একই। নতুন মুদ্রণ ব্যবস্থায় পুরানো ছাপাখানার মতো করে প্রচ্ছদ এঁকেছেন। নব রীতিতে তাঁর পুরাতনী পদ্ধতির অঙ্কন পেয়েছে অভিজাত মহিমা, গরিমা।

কিন্তু আবার প্রাচীনপন্থী তাঁকে বলা যাবে না। কারণ কতগুলি জিনিস তিনি বৈচিত্র্যসাধনের জন্য কমিক স্ট্রিপ এবং ফিল্ম থেকে গ্রহণ করেছেন। প্রথাসম্মত বাস্তববাদী অঙ্কন 'গুণ্ডা গোয়েন্দা' নিয়ে কমিক স্ট্রিপের যে রূপারোপিত (স্টাইলাইড) অবয়বী অঙ্কন, তা নিজের মতো করে ব্যবহার করেছেন 'দার্জিলিং জমজমাট' বইয়ের মলাটে। এটি খাড়া আয়তক্ষেত্র না হয়ে অনুভূমিক হলে কমিক স্ট্রিপের ফ্রেম হতে পারতো। কার্টুন ফিল্ম এবং ছোটদের জন্তু-জানোয়ার নিয়ে বইয়ের সচিত্রকরণের এবং কার্টুন স্ট্রিপের রূপারোপ 'ব্রেজিলের কালো বাঘে'র মুখোশের মত দেখতে মুখখানায় আছে। তাঁর প্রচ্ছদেব অনেকগুলি 'পপ আর্ট' বা জনপ্রিয়বাদ আন্দোলনের শিল্পকলার মতো। পপ আর্ট বিজ্ঞাপন, ফিল্ম, কার্টুন ও কমিক স্ট্রিপ, জিনিসের মোড়ক, খাপ এবং খোল—প্যাকেজিং-কে রূপান্তর ঘটিয়ে চিত্রভাস্কর্যে আনা হয়। সত্যজিৎ সেই উপাদান দিয়ে প্রচ্ছদ এঁকেছেন। সুতরাং তাঁর ছবি মুদ্রণের আধুনিক করণকৌশলকে পূর্ণরূপে ব্যবহার না করলেও, অঙ্কনে এবং হরফে পপ আর্টের ধারণাগুলিকে কাজে লাগিয়েছেন। এই দিক দিয়ে দেখলে সিগনেট প্রেসের সময় তাঁর অঙ্কনে হয়তো নন্দলাল বসুর কিছু প্রভাব থাকতে পারে। কিন্তু আনন্দ পাবলিশার্সের আমলে তাঁর বেশ কিছু প্রচ্ছদ বরং অ্যাণ্ডি ওয়ারহোল, লিচেনস্টিন ওয়েসলমান, ওলডেনবার্গ, জাসপার জোনস রসেনবার্গের কাছাকাছি।

তাঁর প্রচ্ছদ ও সচিত্রকরণের আন্তর্জাতিক মান এবং বৈদগ্ধ্য রয়েছে। রয়েছে আধুনিক জীবন ও মনন সম্বন্ধে আগ্রহ। বিজ্ঞানমনস্ক মনই তাঁকে কল্পবিজ্ঞান রচনায়ও অনুপ্রাণিত করেছে। 'শঙ্কু একাই ১০০'-র প্রচ্ছদ তিনি কম্পিউটারের ছবির ধরণে এঁকেছেন। দৃশ্যকল্প সেইভাবে রূপারোপিত। এই রূপান্তর নিয়ে তাঁর নিরীক্ষা পরবর্তী প্রজন্মের ছাপাই নকশাকারদের পথ দেখাবে।

দীপঙ্কর সেন

মুদ্রণ সাধনায় সত্যজিৎ রায়

চ্যার্লি চ্যাপলিন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে বিশেষ অর্থকষ্টে পড়ে একবার তিন সপ্তাহের জন্য দানবের মত একটি মুদ্রণ যন্ত্র চালাবার কাজ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। তখন তাঁর বয়স খুবই কম। সে কাহিনী করুণ। কিন্তু তা বলার সময়ও প্রচুর হাস্যরস বিতরণ করেছেন চার্লি। নমুনা হিসাবে সামান্য কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত করলেই বুঝতে পারা যাবে যে কোন অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও কেমন করে তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল মুদ্রণে। চ্যাপলিন লিখেছেন—**To operate it [a wharfedale printing machine] I had to stand upon a Platform five feet high. I felt I was at the top of the Eiffel Tower...The first day I was a nervous wreck from the hungry brute wanting to get ahead of me. Nevertheless I was given the job at twelve shillings per week.**

ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র পরিচালক এই ব্যাপারে চ্যাপলিনের চেয়ে অনেক ভাগ্যবান। মুদ্রণের জগতে তিনি এসেছিলেন রাজ সমারোহে। কারণ তাঁকে নিয়ে তাঁদের পরিবারে মুদ্রণের সাধনা তিন পুরুষের। এই সাধনার প্রায় সবটাই মৌলিক কীর্তির ঐশ্বর্যে ভূষিত। তাঁর পিতামহ উপেন্দ্রকিশোরের মুদ্রণ চর্চা জাতীয় ঐতিহ্যের অংশ বিশেষ। তাঁর পিতা সুকুমার বাংলা হরফের সংস্কারের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নিজের মনের দিগন্ত কতদূর প্রসারিত ছিল তার স্থায়ী পরিচয় রেখে গেছেন। সুতরাং সত্যজিৎ রায়ের নিজের সম্বন্ধে—'**One who holds typography, type design and Calligraphy as among the most Sophisticated of art forms,** বলার অধিকার ছিল।

টাইপোগ্রাফির সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য উপাদানগুলির মধ্যে ভাষাজ্ঞান (যার মধ্যে ব্যাকরণ এবং উচ্চারণশাস্ত্র দুই-ই পড়ে), শিল্পীর মত দৃষ্টিভঙ্গি এবং কল্পনাশক্তি প্রধান তিনটি জিনিস। সত্যজিৎকে এই তিনটিই অকৃপণভাবে দান করেছিলেন বিধাতা। তিনি 'রে রোমান,' 'রে বিজার' এবং 'ডাফনিস' টাইপের নকশা করে রোমান হরফের সম্পদ বৃদ্ধি করেছিলেন। সে তাঁর একটি দিক। আরেক দিক হল বাংলা টাইপোগ্রাফি বা অক্ষরবিন্যাসকে যুগোপযোগী করে তোলা। চিত্র পরিচালনা শুরু করার আগে তিনি একটি বিলিতি অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সিতে

কাজ করতেন। তার নাম ছিল ডি. জে. কিমার। ডি. জে. কিমারে কাজ করার সময়ই তাঁর প্রথম ছবি তোলা শুরু করেছিলেন সত্যজিৎ। কিমারের ভিস্যুয়ালাইজার হিসাবে নানারকম কাজ করতে হত। কখনো পূর্ণাঙ্গ নকশা তৈরি করে দেখাতে হত একটি কাজ মুদ্রণের পর কেমন দেখতে হবে তার অবিকল রূপ। কখনো বইয়ের মলাট, সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডারের পৃষ্ঠা, পোষ্টার এবং সিনেমা স্লাইড। সত্যজিৎ রায়ের সমসাময়িক দু'জন মাত্র শিল্পীকে এই সব কাজের ভিতর দিয়ে পরিপূর্ণভাবে একটি ভারতীয় ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে আমরা দেখেছি। তাঁরা হলেন অন্নদা মুন্সী এবং ও. সি. গাঙ্গুলি। সম্পূর্ণভাবে নতুন এবং বলিষ্ঠ এ-সব কাজের নমুনা মানুষকে অদ্ভুতভাবে আকৃষ্ট করেছিল। এর সঙ্গে তৎকালীন অন্যান্য অ্যাডভারটাইজিং প্রতিষ্ঠানের কেতাবীয়ানা (academism) অথবা বৈচিত্র্যহীনতার কোন তুলনাই চলে না। মানবদেহের নানাভঙ্গির ছবি অতি সুন্দর এবং রুচিপূর্ণভাবে আঁকতে পারতেন সত্যজিৎ। বিজ্ঞাপনের কাজে নিযুক্ত খুব কম কমার্শিয়াল আর্টিস্টেরই এই গুণটি থাকে। সত্যজিতের এই অসাধারণ প্রতিভা অতি সহজেই দর্শকের মনোহরণ করত। জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা'র জন্য সত্যজিৎ রায় কৃত পুস্তক-প্রচ্ছদ এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মুদ্রণের ইতিহাসের খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা জানেন যে মুদ্রণের নতুন নতুন

কলা এবং কৌশলের যাঁরা উদ্ভাবক তাঁরা কেবলমাত্র কারিগর ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন শিল্পী অথবা বিজ্ঞানী। লিথোগ্রাফির আবিষ্কর্তা অ্যালয় সেনিফেল্ডার ছিলেন নট এবং নাট্যকার। য়ুরোপীয় মুদ্রণকুশলী শিল্পীদের তালিকায় এমন আরো কয়েকজন হলেন জার্মেনির আডলফ ফন্ মেণ্টসেল, ফ্রান্সের অনর দমিয়ের, ইনিয়াস ফাঁতা লাতুর, স্পেনের গইয়া এবং গ্রেট ব্রিটেনের স্যামুয়েল প্রাউট। এমনকি তুলুজ লত্রেক-এর মত বিখ্যাত চিত্রকর লিথো মুদ্রণের জগতে এনেছিলেন নতুন যুগ।

সত্যজিৎ উপলব্ধি করেছিলেন যে মুদ্রিত কাজকে, বিশেষ করে হরফ ছাপার কাজকে, সুন্দর করতে হলে বাস্তব এবং কল্পনার সন্ধি করতে হবে। অবনীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে একটি অমূল্য উক্তি করেছিলেন। তাঁর মতে বাস্তবকে কল্পনার থেকে কতটা বিচ্ছিন্ন করলে এবং কল্পনাকে বাস্তব থেকে কতটা সরিয়ে দিলে আর্ট হয় তার মীমাংসা করা শক্ত। কিন্তু কল্পনার সঙ্গে বাস্তব, দৃশ্যমান জগতের সঙ্গে মনের চোখে দেখা জগতের মিলন না হলে আর্ট সৃষ্টির প্রশ্নই ওঠে না। এই কঠিন কাজটি করার শক্তি সত্যজিতের ছিল। তাই অতি সামান্য সাজ-সরঞ্জাম নিয়েও তিনি বাংলা মুদ্রণের ক্ষেত্রে অসাধ্য সাধন করেছেন।

মুদ্রণ শিল্পকে পুরোপুরি আর্ট বলা কোন মতেই সম্ভব নয়। ইংরেজি ভাষায় তাকে কখনো বলা হয়েছে **useful art**, কখনো দ্বিমাত্রিক স্থাপত্য বা **Two dimensional architecture** কল্পনা এবং বাস্তবের মিলন ঘটানোর জন্য কোন বিশেষ আদর্শ বা পথকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা আজও সম্ভব হয় নি। ভবিষ্যতে হবে বলেও মনে হয় না। হার্বার্ট রিড 'মিনিং অব আর্ট' গ্রন্থে লিখেছেন যে শোপেনহাওয়ারের মতে প্রায় সব শিল্পই সংগীতের মতন করে বিকশিত হয়ে উঠতে চায়। এই উক্তি সম্পর্কে প্রচুর মতান্তর দেখা দিয়েছে। শোপেনহাওয়ারের এই উক্তি নিশ্চয় সংগীতের নিরবয়ব দিকটি সম্পর্কে। কারণ সেই দিক থেকে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই একমাত্র সুরকারেরাই তাঁদের সৃষ্টিকে সোজাসুজি আমাদের সামনে উপস্থাপিত করতে পারেন। কিন্তু স্থপতি অথবা মুদ্রকের বস্তু-নির্ভর প্রয়োজনের তাগিদ মেটাতে হয়। তাছাড়া প্রায়োগিক মাধ্যমকে তাঁরা উপেক্ষা করতে পারেন না। তাঁদের প্রধান এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সম্পদ হল বোধি (**intuition**)। বোধির সাহায্যেই গোয়েটে, উইলিয়াম মরিস, প্রুধঁ কিম্বা বার্ণার্ড শ' প্রমুখ মহাজনেরা টাইপোগ্রাফি কিরকম আকর্ষণীয় জিনিস তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁদের মত সত্যজিৎ রায়ও অনুভব করেছিলেন কেমন করে টাইপোগ্রাফির নানা শাখাপ্রশাখা নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে টাইপোগ্রাফির প্রয়োগসাফল্য নির্ভর করে অতীত ও বর্তমানের ললিতকলা, সাহিত্য, মুদ্রণকৌশল এবং হরফসজ্জার পদ্ধতি সম্পর্কে টাইপোগ্রাফারের ব্যুৎপত্তির উপর। অক্ষর বিন্যাসের কলাকৌশল ভাষার মত শ্রবণীয় এবং সমকালীন

জীবনধারার মত পরিবর্তনশীল। কল্পনাকে রূপ দেওয়াই বোধহয় শিল্পীর সবচেয়ে বড কাজ। বেনিদিত্তো ক্রোচে বলেছেন : 'একমাত্র কল্পনাশক্তি ছাড়া আর কিছুই শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। কল্পনার সফল প্রতিফলনই তার একমাত্র ঐশ্বর্য।... কেবলমাত্র অনুভব করা এবং অনুভূত বিষয়কে উপস্থাপিত করাই শিল্পের একমাত্র কাজ। আর কিছুই নয়।'

চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে আমরা পরম গর্ববোধ করি। আমরা জানি যে চলচ্চিত্রের জগতে অভূতপূর্ব নানা সৃষ্টি করার জন্য মুদ্রণের, বিশেষ করে টাইপোগ্রাফির জগৎ থেকে তাঁর বেশ কিছু দূরে সরে যেতে হয়েছিল। বাংলা মুদ্রণের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে তার জন্য। কিন্তু পরিচালক সত্যজিৎ কতকগুলো নতুন দিকে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর সৃজনী শক্তিকে। এর পরই আমরা তাঁর সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় পেলাম। ক্রাইম-ষ্টোরি এবং বিজ্ঞানভিত্তিক কাল্পনিক কাহিনীর রচয়িতা হিসাবে তিনি আজ বিশেষ জনপ্রিয়। নিজের এসব বইয়ের জন্য তিনি প্রচুর ছবি এঁকেছেন। নিজের গল্প ছাড়াও তাঁর পিতামহের প্রতিষ্ঠিত 'সন্দেশ' পত্রিকাকে নতুন করে বের করার পর নতুন নতুন মলাট তৈরি করেছেন, আর কত যে ছবি এঁকেছেন তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু সবচেয়ে উঁচু জায়গা দখল করে আছে তাঁর কলম বা তুলি দিয়ে আঁকা হরফ। একে ইংরেজিতে বলে ক্যালিগ্রাফি।

সত্যজিৎ রায়ের ক্যালিগ্রাফির শিক্ষাগুরু বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। প্রকৃতপক্ষে সত্যজিতের উচ্চমার্গের ক্যালিগ্রাফিক দৃষ্টিভঙ্গি অক্ষরবিন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর কাজকে পরম পরিপূর্ণতায় রূপায়িত করেছে। এই ব্যাপারটি সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে আত্মপ্রকাশ করার একটা সহজাত শক্তি রায় পরিবারের অনেকেরই মত তাঁর ছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'আসলে মানুষের গল্পটা এইখানে যে পনেরো আনা লোক ঠিক নিজেকে প্রকাশ করতে পায় না। অথচ নিজের পূর্ণ প্রকাশেই আনন্দ।' বলা বাহুল্য এই আনন্দে সত্যজিতের জীবন ছিল ভরপুর।

নিজের ছবির জন্য পোস্টার, ব্যানার-হেডিং এবং স্লাইড তৈরি করে তিনি একটা নতুন যুগের প্রবর্তন করেছিলেন। ঠিক যেমন করেছিলেন সিগনেট প্রেসের জন্য বইয়ের নকশা এবং অক্ষর বিন্যাসের মাধ্যমে, ১৯৫০-এর দশকে। সাম্প্রতিক কালে 'এক্ষণ' পত্রিকার অসংখ্য নতুন ধরণের মলাট তৈরি করে তিনি প্রমাণ করেছেন 'যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে।'

আজও মনে পড়ে 'পথের পাঁচালি'র একটা বিরাট ব্যানার অফিসে যেতে আসতে চোখে পড়ত। তখন সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। কিন্তু অপু এবং দুর্গার রেলগাড়ি দেখার দৃশ্যটি মনের পটে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হয়ে গেছিল। তার তুল্য কোন কিছু আমাদের দেশে আগে কখনো দেখি নি। সমঝদার হলে তখনই বুঝতে পারতাম এই নবীন পরিচালকের মধ্যে ভবিষ্যতে

সম্ভাবনার কি ইঙ্গিত রয়েছে। এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর পরিতোষ সেনের একটি অনবদ্য রচনা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। তিনি লিখেছেন—'সেসব কাজের ভিতর দিয়ে যে নতুন ধরণের চিন্তা, ডিজাইন সম্পর্কে অভিনব ধ্যান-ধারণা এবং অপূর্ব করলিপি লিখনভঙ্গি দেখা গিয়েছিল তাকে অনাদর করতে তখন কেউই পারে নি। সিনেমা শিল্পে তাঁর প্রতিভার অত্যাশ্চর্য বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রাফিক ডিজাইনের ক্ষেত্রেও তাঁর সৃজনশীলতা অভূতপূর্ব এক স্তরে উন্নীত হয়েছিল। উনিশ শতকের বাংলা গ্রন্থচিত্রণে এবং কাঠ খোদাই করা হরফের রূপ দেখে সত্যজিতের মনে আমাদের লোকায়ত শিল্পের ট্রাডিশন সম্পর্কে যে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল তা থেকে বলিষ্ঠ রেখা এবং সরলতায় ভূষিত এই সব কাজকে ভারতীয়-গন্ধী করে তুলেছিলেন তিনি। এই ধরণের অনেক জিনিসের মধ্যে একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল তাঁর 'দেবী' ছবিটির জন্য করা প্রচারমূলক কাজ। বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত ভাব, উচ্চস্তরের নক্‌শা এবং বিন্যাস, হাতে আঁকা হরফের মাধ্যমে অদ্ভুতভাবে ফুটে উঠেছে। ছবির সঙ্গে হরফের এই মিলন ত্রুটিহীন। খুব কম ডিজাইনারই সত্যজিৎ রায়ের মত টাইপের গুণাগুণ সম্পর্কে সচেতন।...'

'অধিকাংশ পাঠকই খেয়াল করেন না যে একটি ছাপার হরফের গঠন এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির সঙ্গে প্রকৃতির সৃষ্ট এবং মানুষের তৈরি দৃশ্যমান জগতের অনেক কিছুর মিল থাকতে পারে। দুটি মাত্র উদাহরণ দেবার জন্য বলব কোন কোন হরফে আছে নারীদেহের অবরোহন এবং আরোহনের কমনীয়তার ছান্দিক আভাস আবার অন্যান্য হরফে রয়েছে সুন্দর এবং বলিষ্ঠভাবে নক্‌শা করা 'ইমারতের রাজকীয় মর্যাদা।'

সত্যজিৎ রায় ছিলেন একজন সত্যিকার Perfectionist. তাই ঠিক যা চান তা সঠিকভাবে উপস্থাপিত করতে না পারলে তিনি ক্ষান্ত হতেন না। আর ছবির জন্য স্ক্রিপ্ট তৈরি করার সময় যে স্কেচগুলো তিনি করতেন এবং তার সঙ্গে যে-সব নোট লিখে রাখতেন তা দেখলেই বোঝা যেত যে ছবির দৃশ্যগুলিকে তিনি পরপর কিভাবে দেখাবেন। চলচ্চিত্রের Visual অংশটি তার অন্যান্য বড় দিকগুলোর মতই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন তিনি। এই স্কেচগুলো দেখলেই বোঝা যেত ছবি কি-ভাবে তুলতে হবে অর্থাৎ ক্যামেরা কোথায় রাখা হবে। ছবি তোলার আগে তার জন্য ব্যবহার্য পোষাকের ডিজাইন এবং বিভিন্ন চরিত্রের মেক-আপ-এর খুঁটিনাটি বিবরণ তাঁর স্কেচের ভিতর দিয়ে উদ্ঘাটিত হত পরিপূর্ণভাবে। এত গুছিয়ে কাজ করতে হলে প্রতিটি ব্যাপারে কি পরিমাণ নজর দেওয়া প্রয়োজন তা আমাদের মত সাধারণ মানুষেরও বুঝতে অসুবিধা হয় না।

মাঝে মাঝে মনে হয় সত্যজিৎ যদি আর কিছু না করে শুধু ছবিই আঁকতেন তাহলেও তিনি হতেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর। এও ভাবি যে সত্যজিৎ রায়কে যদি নাট্যাচার্যের ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যেত তাহলে হয়ত বাংলার

মঞ্চাভিনয় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে ধন্য হত। রবীন্দ্রনাথের পর এমন স্বয়ং-সম্পূর্ণ শিল্পী (Complete artist) আমরা খুব বেশি পাই নি। ইংরেজরা Superlative ব্যবহার করতে নিষেধ করে থাকেন। সে অভ্যাসটি নাকি তেমন কেতাদুরস্ত নয়। তবুও এই কথাটি না বলে পারছি না যে আমাদের অভিনয় শিল্পের সাম্প্রতিক ইতিহাসে তিনিই সবার উপরে। জন গল্‌স্‌ওয়ার্দির মতে The sense of the beautiful is God's best gift to mankind. এই কথাটির অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পারা যায় সত্যজিৎ রায়ের সারা জীবনের কর্মের সমীক্ষার ভিতর দিয়ে।

সুধীর মৈত্র

অলঙ্করণে সত্যজিৎ

আজকের জগদ্বিখ্যাত সত্যজিৎ রায়ের খ্যাতি ১৯৫৫ সালের আগে, অর্থা 'পথের পাঁচালি' চলচ্চিত্রে রূপায়িত হওয়ার পূর্বে, বলতে গেলে বেশ সীমিতই ছিল কিছু গুণগ্রাহী বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-পরিজন এবং শিল্পরসিক কিছু ব্যক্তির মধ্যে ছিল তাঁর খ্যাতির বিস্তৃতি। তখনকার সতজিতের খ্যাতির মূলে ছিল না সেলুলয়ে ফিল্ম, সাহিত্যিকের কলম, বা সঙ্গীত-স্রষ্টার ভূমিকা। তিনি তখন প্রতিষ্ঠিত অ এক ভূমিকায়। সে ভূমিকা ছবি আঁকিয়ের। তাঁর তখনকার বিষয় ছবি আঁকা।

যেহেতু বিষয়টি ছবি আঁকা অথবা চিত্রবিদ্যারই একটি বিশেষ শাখার যাবে আমরা ইলাসট্রেশন বা অলঙ্করণ—কেউ কেউ বা সচিত্রকরণও বলে থাকেন, আ সেই অলঙ্করণ শিল্পীর নাম যদি হয় সত্যজিৎ রায় তবে স্বীকার করতে বাধা নেই যে বিষয়টি নিয়ে লেখা বা আলোচনা করা বেশ কঠিন ও আয়াসসাধ্য।

সত্যজিৎ রায়ের কাজ, অর্থাৎ ছবি আঁকার কাজ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে, অলঙ্করণ শিল্পের বিষয়ে একটা সামগ্রিক আলোচনা নিতান্তই প্রাসঙ্গিক। অর্থাৎ অলঙ্করণ বলতে আমরা ঠিক কতটুকু বলব? শুধুই ছবিটুকু? আমার মতে, আরও অনেক কিছুই আছে। আরও অনেক শাখাপ্রশাখা। যেমন লেটারিং বা ক্যালিগ্রাফি, কম্পোজিশন তো আছেই, আছে টাইপ বা হরফের ব্যবহার। লে-আউট বা বিন্যাস কৌশল। আর পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে এর পরিধি আরও বিস্তৃত। উপরোক্ত বস্তুগুলি ছাড়াও প্রচ্ছদপট এবং ছাপা, এমনকি বাঁধাই সম্বন্ধেও যথাযথ জ্ঞান একজন সত্যিকারের অলঙ্করণ-শিল্পীর কাছে অপরিহার্য।

বিজ্ঞাপন-শিল্পে ইলাসট্রেটর-এর অবদানের কথা সুবিদিত। ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা বা সচেতনাকে এই শিল্পে সঠিকভাবে উপস্থাপনা করা এক দুরূহ সাধনা। একজন সত্যিকারের শিল্পীই শুধু এই কাজটি নিপুণভাবে করে থাকেন। তাঁর দায়-দায়িত্ব অনেকটাই। যদিও পুরো ব্যাপারটা একটা যৌথ প্রচেষ্টা-নির্ভর অবদান। অর্থাৎ সেখানে টিম-ওয়ার্কের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে।

পত্রপত্রিকা, পুস্তক বা সংবাদপত্রের ইলাসট্রেশনের ক্ষেত্রে চিত্রশিল্পীর 'ক্রিয়েটিভ' কাজ করার স্বাধীনতা অনেকটাই বেশী বলে আমার ধারণা। বিদেশে এখন এই ধরণের শিল্পীদের যাঁরা বিজ্ঞাপন বা প্রকাশনা বা অলঙ্করণ, যার সঙ্গেই যুক্ত থাকুন তাঁদের Graphic Artist-ও বলে থাকেন। যদিও পূর্বে আমাদের
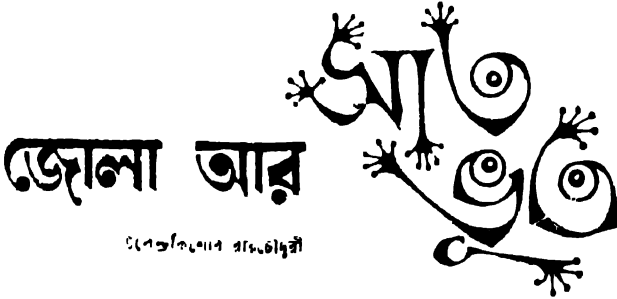
এই Graphic Art সম্বন্ধে ধারণা একটু অন্যরকম ছিল। যাই হোক এই Graphic Art সম্বন্ধে একটা ধারণার নমুনা রাখছি।

Graphic Art is thus a creative technique at the disposal of anyone who would devise a message intended for a wide audience. The successful communication of any message requires a Visualisation that based not only on the application of graphic techniques but also on the expression of meaningful values, and to achieve this graphic artists must make use of the valuable contributions

of other dlsciplines, suck as psychology, symbology a iconography. ('The Language of Graphics', Thomes & Hudso Great Britain, 1980)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কোনও বার্তা বৃহত্তর দর্শক অর্থাৎ মানুষের কা পৌঁছে দেওয়ার এবং ভাব-বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে Graphic Artist-এ ভূমিকা কতখানি ?

সত্যজিৎ রায় সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে এতখানি অবতারণার প্রয়োজ এই জন্যে যে Graphic শিল্পী বা অলঙ্করণ শিল্পী হিসেবে সত্যজিতের অবদানে বৈশিষ্ট্য কোথায় এবং কতদূর।

আর তাছাড়া সত্যজিৎকে জানতে হলে, বা তার সৃষ্ট কাজ সম্বন্ধে আলোচন করতে তৎকালীন পারিপার্শ্বিক বা পরিমণ্ডলের কথাও বলা প্রয়োজন। অর্থা সত্যজিতের পূর্বে বা সমসাময়িক কালে কারা এই ধরণের কাজ করতেন আ তাঁদের সঙ্গে সত্যজিতের কাজের তফাৎ বা বৈশিষ্ট্যই বা কোথায়।

সমস্ত বিষয়বস্তুরই একটা পশ্চাৎপট থাকে। ছবির ভাষায় যাকে আমর বলি Object এবং Background। এই পশ্চাদপটই ছবির মূল বিষয়বস্তুকে সঠিকভাবে প্রস্ফুটিত করতে সাহায্য করে। উদাহরণ স্বরূপ বিখ্যাত ডাচ চিত্রক Rembrandt-এর ছবি। তাঁর অঙ্কিত ছবিগুলিতে বিষয়বস্তুতে যে আলোছায়া মায়া, উজ্জ্বলতার দীপ্তি অথবা নিষ্প্রভতার খেলা দেখতে পাই তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছবির Back groand-এর সঠিক রঙ ও টোনের যথার্থ প্রযোগে। এই উদাহরণ শুধু মাত্র ছবির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। জীবনের সব ক্ষেত্রেই পশ্চাদ-পটের মূল্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যক্তিজীবনেও এই পশ্চাদপট অর্থাৎ পারিবারিক পরম্পরা বা ঐতিহ্যের প্রভাব বা অবদান কোনও অংশেই কম নয়। বিশেষ করে সেই ব্যক্তি যদি খ্যাতির শীর্ষে উন্নীত হন, তখন তাঁর পশ্চাৎ পরিমণ্ডলেও দৃষ্টিপাত স্বাভাবিকভাবেই আবশ্যিক হয়ে পড়ে।

সত্যজিৎ রায় এমন একটি পরিবারে জন্মেছেন, যেখানে তাঁর পিতা ৺সুকুমার রায়, পিতামহ ৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। তাছাড়া আরও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, যাঁরা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে যশ এবং খ্যাতির অধিকারী। শিক্ষা এবং সংস্কৃতিতে এই পরিবারের অবদান বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে অপরিসীম। ছবি আঁকার ক্ষেত্রেও পারিবারিক প্রভাব যথেষ্টই ছিল সত্যজিতের ওপর।

'যে জিনিসটা ছোটবেলা থেকে বেশ ভালোই পারতাম, সেটা হল ছবি আঁকা, সেই কারণে ইস্কুলে ঢোকার অল্পদিনের মধ্যেই আমি ড্রয়িং মাস্টার আশুবাবুর প্রিয় পাত্র হয়ে পড়েছিলাম।' 'আমি কিন্তু শান্তিনিকেতনে ছবি আঁকা শিখিনি। তের চোদ্দ বছর বয়সে আমি পোর্ট্রেট করতাম। ওটা জন্মসূত্রে পাওয়া। ইলাসট্রেশনে

দাদু (উপেন্দ্রকিশোর) মস্ত বড। বাবা আর কদিন বাঁচলেন। যদিও বাবা যা এঁকেছেন, ও জিনিস কারও হাত দিয়ে বেরুবে না।'

'ছোটবেলা থেকেই মানিক চমৎকার ছবি আঁকত। বছর দশেক বয়সে রাজা রামমোহন রায়ের একটা আশ্চর্য সুন্দর পাশ ফেরা ছবি পেনসিল স্কেচ করেছিল।' (নলিনী দাশ, সত্যজিৎ রায়ের ছেলেবেলা)

প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে সত্যজিৎ শান্তিনিকেতনে যান মা সুপ্রভা রায়ের সঙ্গে। সেখানে তিনি কলাভবনে নন্দলাল বসুর কাছে চিত্রবিদ্যা শিক্ষালাভ করেন।

'আমি জানি না আমার পক্ষে 'পথের পাঁচালী' করা সম্ভব হতো কিনা যদি না শান্তিনিকেতনে শিক্ষানবিশীর সুযোগ আমার ঘটতো। ঐখানেই মাস্টার মশায়ের পায়ের তলায় বসে আমি শিখেছি প্রকৃতিকে কি করে দেখতে হয়, কি ভাবে উপভোগ করতে হয়, এবং কি করে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ছন্দকে অনুভব করতে হয়।'

'১৯৪০ সনের কোনও এক সময় মা আমাকে কলাভবনে আমার শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। সে সময় ভাবত শিল্পকলা বা ইণ্ডিয়ান স্কুল অফ পেইন্টিং সম্বন্ধে আমার মনে খানিকটা কিন্তু কিন্তু ভাব ছিল।'

'মা সোজা নন্দলালকে বলেছিলেন, 'আমার ছেলে কিন্তু আপনাদের ওরিয়েণ্টাল আর্ট একদম পছন্দ করে না।' '

'কিন্তু শান্তিনিকেতন আর নন্দলালের আমাকে দীক্ষিত করতে সময় লাগলো না। এর জন্য আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।'...'আজ আমি যা হয়েছি তা হতে পারতাম না যদি মাস্টারমশায়েব পায়ের তলায় বসে তাঁর কাছে শিক্ষালাভ না করতাম।'

এ ছাড়াও তখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় (যাঁর ওপর সত্যজিতের ডকুমেণ্টারি 'দি ইনার আই'), রামকিঙ্কর বেইজদের মত দিকপাল শিল্পীরা যাদের সাহচর্য ও প্রভাবে তিনি আরও পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেন।

প্রথম জীবনে পাশ্চাত্য ধরণে ছবি আঁকার চর্চা করলেও পরিণত বয়সে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, দুই ধারারই প্রভাব তাঁর ছবি আঁকার ওপর প্রতিফলিত হয়েছিল।

শুধু ছবি এঁকেই জীবনধারণ করবেন কিনা, অর্থাৎ হোলটাইম পেইণ্টার বা আর্টিস্ট হবেন কিনা, এ বিষয়ে বিশদভাবে কোনও তত্ত্ব বা তথ্য আমাদের অজানা। তবে পরবর্তীকালে ওঁর কাজকর্মের গতি-প্রকৃতি এবং চলচ্চিত্র শিল্পে পুরোপুরি আত্মনিয়োগের পূর্ব পর্যন্ত ছবি আঁকাকেই তিনি জীবিকা হিসেবে নিয়েছিলেন।

১৯৪৩ সনে তিনি তৎকালীন খ্যাতনামা বিজ্ঞাপন সংস্থা ডি, জে, কীমারে যোগ দেন এবং সেখানেই তিনি তাঁর চিত্র-মাধ্যমকে কাজে লাগাতে শুরু করেন ইলাসট্রেশন ও ভিস্যুয়ালাইজেশনের মধ্যে দিয়ে।

যেহেতু বিজ্ঞাপন সংস্থার প্রকাশিত কাজগুলোতে কোনও শিল্পীর নাম থাকতো

না, সে জন্য কোন আঁকাটা কোন শিল্পীর এটা জানা বা বোঝা খুব কঠিন হ
সাধারণ দর্শকের চোখে।

তখনকার দিনে বিজ্ঞাপন শিল্পে মোটামুটি চালু একটা বিদেশী ধরণ ছিল য
বিদেশী পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনগুলোর অনুকরণে বা আদলে তৈরী হতো
এঁরই মধ্যে কয়েকজন সত্যিকারের প্রতিভাবান শিল্পীর যোগদানে পঞ্চাশের দশকে
বিজ্ঞাপন চিত্রণে এক যুগান্তের সৃষ্টি হয়েছিল। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লে
করা প্রয়োজন। অন্নদা মুন্সী, মাখন দত্তগুপ্ত, সমর ঘোষ প্রভৃতি শিল্পীরা এই সময়ে
সত্যজিতের সঙ্গে একই জায়গায় কাজ করতেন এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ
স্বকীয়তার নিদর্শন রেখে গেছেন এঁদের সৃজনী প্রতিভায়। আর সত্যজিৎ রায়ও
ভারতীয় বিজ্ঞাপনের অ-ভারতীয় যুগকে নতুনভাবে আলোকিত করে তুলেছিলেন
তাঁর অসামান্য সৃষ্টিশীল অলঙ্করণের মাধ্যমে যা তখনকার দিনে অনেকেরই দৃষ্টি
আকর্ষণ করেছিল।

প্রত্যেক শিল্পীই বিশেষ অনুশীলনের দ্বারা তাঁর নিজস্ব একটা স্টাইল বা শৈলী
সৃষ্টি করে থাকেন। প্রত্যেকেরই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থাকে, যে দৃষ্টিতে তিনি দেখে
থাকেন, তারই বহিঃপ্রকাশ তাঁর রচিত সৃষ্টি। সত্যজিৎ রায় যা এঁকে গেছেন তা
তাঁর একান্ত নিজস্ব স্টাইলেই এঁকেছেন। পণ্যের চাহিদা বাড়াতে ভিস্যুয়াল
কমিউনিকেশনের মাধ্যমে ভারতীয় বা এদেশীয় গ্রাহকদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার
করে দেশীয় ভাবধারায় আঁকা ছবি যা স্বভাবতঃই স্বদেশবাসীরা বুঝতে বা হৃদয়ঙ্গম
করতে পারতেন। সেদিক দিয়ে সত্যজিতের কাজ একাধারে মার্জিত, রুচিসম্মত,
বাহুল্যবর্জিত ও সৃজনশীল।

বিজ্ঞাপনের আঁকা দিয়ে হাতেখড়ি হলেও এটা যে তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ
করে নি তা তাঁর পরবর্তীকালের কাজকর্মের মধ্যেই প্রমাণিত। বরং বই বা পুস্তক
প্রকাশনার জগতে বা পত্রপত্রিকার অলঙ্করণেই তাঁর সত্যিকারের প্রতিভার স্বাক্ষর
রেখে গিয়েছেন। পুরোনো 'সন্দেশ'-এর যুগ থেকে এই সেদিন পর্যন্ত তিনি অজস্র
ছবি এঁকেছেন। এবং প্রত্যেকবারই তিনি নিজেকে পালটেছেন, কোনও কোনও
ক্ষেত্রে নিজেকেও অতিক্রম করে গেছেন।

রেখাচিত্রকেই অবলম্বন করেই তখনকার বেশী কাজকর্ম হত, কারণ মুদ্রণের
মান তখন ততটা উন্নত ছিল না। এই রেখারই নানাপ্রকার ব্যবহারে, তিনি সিদ্ধ-
হস্ত ছিলেন। কখনও বোল্ড ব্রাশ লাইনে, কখনও সূক্ষ্ম সাবলীল রেখার ব্যবহারে
তাঁর অঙ্কিত চিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠত। বিদেশী ইলাসট্রেশনের সঙ্গে নিবিড়
পরিচয় থাকায় সেইসব টেকনিক তিনি সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গিমায় প্রকাশ করতেন এবং
সেটাতে কখনও বিদেশী প্রভাবের ছাপ থাকত না। অথচ নতুনত্বের স্বাদ পাওয়া
যেত।

গ্রাফিক ডিজাইনে, মুদ্রণশিল্প সম্পর্কে সম্যক ধারণা যা তিনি বংশানুক্রমেই অর্জন করেছিলেন, আর এ বিষয়ে ভবিষ্যৎ জীবনে আরও পরিণত হয়েছিলেন বলেই পুস্তক প্রকাশনার জগতে তিনি তৎকালীন এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। এই বিষয়ে একটি নামের উল্লেখ না করলে খুবই অনুচিত ব্যাপার হবে। ৺দিলীপ গুপ্ত, তৎকালীন ডি. জে. কীমার কোম্পানির অন্যতম কর্ণধার, যিনি পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে যুগান্ত সৃষ্টিকারী 'সিগনেট প্রেসে'রও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, তিনিই সত্যজিৎকে বইএর অলঙ্করণের দিকে আকৃষ্ট করেন ও উৎসাহ দান করেন। যতদূর জানি তাঁরই উৎসাহে পুস্তক এবং প্রকাশনা জগতে প্রচ্ছদপট, অলঙ্করণ লে-আউট ও মুদ্রণ, সব মিলিয়ে সত্যজিতের প্রতিভা নতুনভাবে আবিষ্কৃত হতে থাকে এবং প্রতিদিনই তিনি নতুন থেকে নতুনতর হয়ে ওঠেন।

এই সময়েই তিনি পরপর কয়েকটি অসামান্য প্রচ্ছদপটের সৃষ্টি করেন। 'বনলতা সেন', 'দুরন্ত দুপুর', 'রূপসী বাংলা', 'আম আঁটির ভেঁপু', 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' প্রভৃতি যুগান্তকারী প্রচ্ছদ ঐ সময়েই রচিত। 'পরমপুরুষ' সেই আমলে আমাদের সকলকেই দারুণভাবে অভিভূত ও প্রলুব্ধ করেছিল। লেটারিং, বর্ণবিন্যাস ও ডিজাইনের বিশিষ্টতায় বইটির ভেতরের পরিচয় যেন বইএর মলাটেই প্রতিফলিত হয়েছিল। 'নামাবলী'র সরলীকৃত ডিজাইনের ব্যবহারে এক বিশেষ মাত্রার যোগ হয়েছিল বইটিতে, দিয়েছিল এক বিশেষ মর্যাদা। এসব ছাড়াও সেই সময়েই তিনি অনেক বই এবং পত্র-পত্রিকার অলঙ্করণও করতে থাকেন। তাঁর এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের যৌথ পরিচালনায় 'সন্দেশ' আবার প্রকাশিত হতে থাকে এবং সেখানেও তিনি আঁকতেন নিয়মিত এবং লিখতেনও।

ক্যালিগ্রাফি বা সুচারুলিখনের শিল্পেও সত্যজিৎ এক নতুন যুগের সূচনা করেন। বাংলা হরফ নিয়ে তিনি বরাবরই পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেন। পুরনো সংস্কৃত পুঁথির হরফকে বাংলা হরফে সঞ্চারিত করে তিনি বিশিষ্ট এক লেখার ধরণের সৃষ্টি করেন, যা তাঁর একান্তই নিজস্ব। ইংরেজী হরফ বা টাইপ নিয়েও তিনি ভাবতেন ; Rav-Roman হরফ ওঁর নিজস্ব সৃষ্টি।

শুধুমাত্র লেটারিং বা স্টাইলাইজড Script-এর প্রয়োগেই তিনি বহু পত্র-পত্রিকার প্রচ্ছদ এঁকেছেন। 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' হুমায়ুন কবীর সম্পাদিত এর এক উজ্জ্বল নিদর্শন। এর আগে বা সমসাময়িক কালে অন্নদা মুন্সী মহাশয় এই হস্তলিপি লিখনে যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। খালেদ চৌধুরী মহাশয়ও এই নিয়ে নিজস্ব ধারার সৃষ্টি করেছিলেন। তবে বিভিন্ন, স্বাদের বা নমুনার হস্ত-লিখনে সত্যজিৎ রায় সত্যিই অদ্বিতীয়। ওঁর পরিচালিত চলচ্চিত্রগুলির টাইটেল-গুলিতে এর নিদর্শনের ছড়াছড়ি। তাছাড়া সিনেমার পোস্টার ও হোর্ডিং-এর ডিজাইনের লে-আউট ও লোগোর ব্যবহারের নমুনা নিঃসন্দেহে এক বিপ্লবী ব্যতিক্রম।

পঞ্চাশের দশকেই তিনি 'দেশ' পত্রিকাতে অলঙ্করণের কাজ শুরু করেন তখন পত্রিকার প্রথম দিকে থাকত বিখ্যাত রসসাহিত্যিক 'পরশুরামে'র রচনা সত্যজিৎ তাঁর লেখার ছবি আঁকতেন। ১৯৫৩ সালে 'সরলাক্ষ হোম' নামে একটি লেখার অলঙ্করণ আমাকে ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ মুগ্ধ করেছিল। সেই ছবির সব জিনিষ মনে নেই। কিন্তু স্মৃতিতে ছবিটি আজও অম্লান। তখন থেকে সত্যজিতের আঁকা প্রতিটি ছবিই খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে শুরু করি। তাঁর ইলাসট্রেশনের দ্বারা অনুপ্রাণিতও হতে থাকি। নিজেদের মধ্যে আলোচনা, সমালোচনা করতে থাকি। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করি যে প্রতিবারই তিনি একটু অন্য ধরণের স্বাদ আনবার চেষ্টা করছেন ছবিতে। সে কথা অবশ্য পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

ওঁর ছবিতে যে জিনিসটা বিশেষভাবে আকর্ষণ করত—তা হল শুধুমাত্র রেখার মাধ্যমে চরিত্র সৃষ্টি। সে চরিত্র বিভিন্ন রকমের। আর চরিত্রের রকমফেরে রেখার ব্যবহারেরও হেরফের। অদ্ভুত অদ্ভুত সব চরিত্র সৃষ্টি করতেন তিনি আঁকার মাধ্যমে। চরিত্র সৃষ্টির এই বিশেষ দৃষ্টি পরবর্তী কালে তাঁর চলচ্চিত্রে তো বটেই, লেখাতেও অজস্র পাওয়া যায়।

সত্যজিৎ রায়ের আঁকা ছবির কম্পোজিশন একটি অবশ্য আলোচ্য বিষয়। ওঁর কম্পোজিশন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখতে বেশ সরল। অর্থাৎ সরল কম্পোজিশন করাটা যে কতটা কঠিন সেটা হাতেনাতে করতে গেলেই বোঝা যায়। কাছের এবং দূরের চরিত্র কোনটা কীভাবে প্রাধান্য পাবে সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে যিনি ইলাসট্রেশন করেন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর ওপরেই। তাছাড়া ছবিটাকে যদি মোটামুটি একটা আয়তক্ষেত্র হিসেবেই ধরে নেওয়া যায়, তবে সেই আয়তক্ষেত্রের কতটা জায়গা ছবির বিষয়বস্তু থাকবে আর ফাঁকা জায়গায় বা কতটা রাখতে হবে। আর কম্পোজিশন অর্থাৎ বিষয়বস্তুকে কিভাবে সাজানো হবে সেটাই ছবির প্রাণ। আর কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে সত্যজিৎ রায় অসাধারণ দৃষ্টিসম্পন্ন। ছোটবেলায় সত্যজিতের ছবি তোলার অভ্যেস ছিল ক্যামেরা দিয়ে। সুতরাং ঐখানেই সম্ভবতঃ তাঁর কম্পোজিশনের শিক্ষানবিশীর শুরু। পরে তো তাঁর ক্যামেরা কম্পোজিশন বা ফ্রেমিং-এর দক্ষতার ছবি নিজেই কথা বলত।

এখন, এই কম্পোজিশন আর রেখা প্রয়োগের যুগল বন্দী মিলেই সত্যিকারের ইলাসট্রেশন, যা লেখকের লেখাকে নির্ভর করেই আর একটি নেত্রগ্রাহ্য সৌন্দর্যের জন্ম দেয়, অথচ লেখার রসও ব্যাহত না হয়। অবশ্য ইলাসট্রেশনে যে সব সময়েই লিখিত বস্তুর অবিকল অনুবাদই হতে হবে এমন কোন কথা নেই। প্রত্যেক শিল্পীরই, শুধুমাত্র শিল্পী কেন প্রত্যেক পাঠকেরই, পড়তে পড়তে একটা কল্পনা বা কল্পিত দৃশ্য মনে বা হৃদয়ে প্রতিফলিত হতে থাকে। আমার ধারণা, সেই ছবি বিভিন্ন ব্যক্তির মনে বিভিন্ন রকম। ইলাসট্রেটারের বৈশিষ্ট্য সেখানেই, যেখানে তিনি অনেক পাঠকেরই কল্পনাকে তার বিন্যাস ভঙ্গীতে ফুটিয়ে তোলেন। সত্যজিৎ

রায় সেই ক্ষেত্রে আশাতিরিক্ত ভাবে সার্থক। পিতা ৺সুকুমার রায়ের কিছু লেখার সঙ্গে সত্যজিতের আঁকা যে ছবিগুলি স্থান পেয়েছে, সেগুলো খুবই মজার এবং মুন্সিয়ানার পরিচায়ক। তারপর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের লেখা ছোটদের বইএর জন্য সত্যজিৎ রায় অসামান্য কিছু ছবি এঁকেছেন, যা এই সব বইগুলোকে করে তুলেছে আরও আকর্ষণীয়। শুনেছি বিভূতিভূষণের 'আম আটির ভেঁপু' ইলাসট্রেশন করার সময় থেকেই তিনি 'পথের পাঁচালি'কে চলচ্চিত্রে রূপ দেওয়ার প্রেরণা পান। চলচ্চিত্রের ভাবনা-চিন্তা অবশ্য তার আগে থেকেই তাঁর ছিল।

তিনি নিজে যেমন ছবি আঁকতেন, সঙ্গে-সঙ্গে সমসাময়িক অন্যান্য যাঁরা আঁকছেন তাঁদের আঁকার দিকেও তাঁর কৌতূহল ও নজর ছিল বিস্ময়কর। ব্যক্তিগতভাবে কয়েকবার তার সান্নিধ্যে এসেছি ও ইলাসট্রেশন বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনাও হয়েছে অনেকটাই। সেই সব আলোচনার সময়ে জেনেছি যে তিনি পুরোনো এবং নতুন, সবার কাজের সঙ্গেই পরিচিত। কোনও কোনও শিল্পীর কাজের তিনি দীর্ঘ প্রশংসাও করেছেন আর কারও-কারও সমালোচনাও করেছেন। আগেকার শিল্পীদের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, প্রতুল বন্দ্যোপাধায়, শৈল চক্রবর্তী, কালিকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার, মাখন দত্তগুপ্ত, সমর ঘোষ প্রমুখ শিল্পীদের প্রত্যেকের কাজেরই তিনি যথোচিত মর্যাদা দিয়েছেন। বিশেষ করে সমর ঘোষ (যাঁর নাম আজ অনেকেরই অজানা) সম্বন্ধে ওঁর আগ্রহ অপরিসীম, এটা দেখেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, ড্রয়িং বিশেষ করে ফিগার ড্রয়িং-এ ওরকম Perfect হাত খুব একটা দেখেন নি। ওঁর পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীদের প্রত্যেকেরই কাজ সম্বন্ধে ধারণা ছিল পরিষ্কার।

ফিগার ড্রয়িং-এ সমর ঘোষের কথা প্রসঙ্গে আমি তাকে এ ব্যাপারে কিছু বলতে বলি। তিনি সবিনয়ে জানান, যে পাশ্চাত্য মতে যে ভাবে ফিগার ড্রয়িং শেখানোর প্রচলন, অর্থাৎ মডেল বসিয়ে ড্রয়িং-এর চর্চা বা অনুশীলন, সেটা তিনি সেভাবে করতে পারেন নি। কারণ শান্তিনিকেতনে ওভাবে কোনও শিক্ষাদানের প্রচলন তখন ছিল না। তবে প্রকৃতি এবং মানুষ দেখে স্কেচ করতে করতেই তিনি ড্রয়িং এর বিশদ ব্যাপারগুলি জানতে চেষ্টা করেছেন। তাছাড়া বিখ্যাত চিত্রকরদের ছবি দেখেও ড্রয়িং শিখতে চেষ্টা করেছেন। সেই সঙ্গে শান্তিনিকেতনের শিক্ষকদের শিক্ষা তো ছিলই।

ওঁর ইলাসট্রেশনে ড্রয়িং-এর এই সাবলীলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য উনি কীভাবে রপ্ত করলেন সেটাও এক বিস্ময়। নানা রকম উপায়ে এবং টেকনিকে তিনি সেই ড্রয়িং-এর রূপ দিয়েছেন। উড্‌কাটের, লিনোকাটের, এচিং-এর বা পেপার কাটিং-এর বা Screen Pasting করেও ইলাসট্রেশান করেছেন। সব সময়ই তিনি নিজেকেই ভেঙেছেন। আবার নিজেকেই গড়েছেন। ওঁর বাড়িতেই, সম্ভবতঃ ১৯৬৮ সালে

প্রথম Lettraset বা Screen set দেখি। আমার আগ্রহ দেখে বিদেশী অনেক Illustrator-দের আঁকাও আমায় দেখান, যা পূর্বে দেখি নি। আমাকে এইসব কাজ দেখিয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দেন এবং অনুপ্রাণিতও করেন। সেই সময় তিনি যথেষ্ট বিখ্যাত তো বটেই, ব্যস্তও ততধিক। তবুও ছবি আঁকা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে করতে তিনি সময়ের কথাও ভুলে যেতেন।

পরবর্তী কালে চিত্রশিল্পী সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য সৃষ্টিতেও প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করেন। নিয়মিতভাবেই তিনি লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর লেখার ছবিও তিনিই আঁকতেন নিয়মিত। সেই ছবিগুলিও গল্পের চরিত্র সমূহকে আরও জীবন্ত করে তুলেছে। তবে প্রথম দিককার ইলাসট্রেশনগুলিতে যে সৌন্দর্য্য ও সজীবতা তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন, শেষের দিকের ছবিগুলিতে সেই উজ্জ্বলতা অনেকটাই নিস্প্রভ। শারীরিক অসুস্থতা বা সময়ের অভাবেই হয়ত এটা হয়েছিল। 'দেশ' পত্রিকার পূজো সংখ্যার পরের দিকের অনেক রচনাতেই তিনি নিজে আর ছবি আঁকতে পারেন নি।

এই মহান প্রতিভাধর স্রষ্টা যিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবাধ বিচরণে স্বীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন ; সেখানে ছবি আঁকাতেও তিনি যে স্বকীয় সৃজনী শক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার রেখে গেছেন—সেই বিষয়ে সমালোচনা বা কোনও মতামত দেওয়ার স্পর্ধা আমার নেই। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমার ভাল-মন্দ লাগার বা তাঁর ছবি আঁকার পরিমণ্ডল এবং বিবর্তন বিষয়েই কিছুটা বলার চেষ্টা করেছি।

পরিশেষে এটুকুই বলতে চাই, চলচ্চিত্র নির্মাণে তিনি যে বিপ্লবী পরিবর্তন এনেছিলেন, তার বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছিল তাঁর ছবি আঁকায়, যেখানে পুরোনো এবং প্রথাসিদ্ধ সংস্কারের গণ্ডী ভেঙে অলঙ্করণের ক্ষেত্রেও তিনি নতুনত্বের সন্ধানী।

বাদল বসু

গ্রন্থ-চিত্রক সত্যজিৎ রায়

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে একজন লেখক হিসাবে সত্যজিৎ রায় আমার কাছে যতখানি বড ঠিক ততখানিই বড একজন বুক-ডিজাইনার বা গ্রন্থ-চিত্রক হিসেবে।

আমি বই জগতের মানুষ, অন্যান্য শিল্পকলা বিষয়ে আমার যতখানি আগ্রহ তার চেয়ে বেশি আগ্রহ বই প্রকাশনায়। একটা কাটা-ছেঁড়া পাণ্ডুলিপি থেকে কীভাবে আস্তে আস্তে সুন্দর একটা বই তৈরি হয়, সেটাই আমার কাছে সব চেয়ে প্রিয় শিল্পকলা।

আমার কর্মজীবন শুরু একটা ছাপাখানা থেকে। একদা বাংলা দেশের বিখ্যাত মুদ্রক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসেই আমার এ-বিষয়ে হাতেখড়ি। তৎকালীন মুদ্রণশিল্পে এই প্রেসের যথেষ্ট নামডাক ছিল এবং সত্যজিৎ রায়ের নামের সঙ্গে জড়িত সিগনেট প্রেসের বহু বই এখান থেকেই ছাপা হয়েছে।

তখন লেটার প্রেস মুদ্রণের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। এখনকার নব্য প্রকাশনার থেকে অনেক বেশি ভাবনাচিন্তা দেওয়া হতো একটা বই নির্মাণের জন্য। সেই সময়ে বাংলা প্রকাশনায় যাঁরাই এসেছিলেন তাঁদের প্রধান চেষ্টা ছিল একটা বইকে কীভাবে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করা যায়। বই প্রকাশনার ব্যবসা যে কেবলমাত্র অর্থ উপার্জনের জন্য নয়, সেটার একটা সামাজিক দায়িত্ব আছে, তা কখনও প্রত্যক্ষভাবে কখনও পরোক্ষভাবে কাজ করত, বর্তমান প্রকাশকদের মধ্যে যার কিঞ্চিৎ অভাব দেখা যায়। বছরে তখন এত বইও প্রকাশিত হতো না। বর্তমানের তুলনায় বলতে গেলে অনেক কম। কিন্তু গডে প্রতিটি বই-এর মানের দিক থেকে ছিল অনেক বেশি উন্নত। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, একটা সুন্দর বই তৈরীর জন্য কাগজ ছাপা এবং বাঁধাই যেমন দরকার, তেমনি দরকার একটা পরিচ্ছন্ন মার্জিত এবং রুচিকর ধারণা, যা বই প্রকাশের নন্দনতত্ত্ব বলা যেতে পারে।

আমার কর্মজীবনের শুরুতেই সত্যজিৎ রায়কে পেয়েছিলাম এই শিল্পের একজন পথপ্রদর্শক হিসেবে। একটা বই তার বিষয়বস্তু হিসেবে কী রকম হওয়া উচিত, তার আকৃতি, তার টাইপ, মলাট, নামপত্র এবং ভেতরের ছবি, সবই তাঁর করা বই থেকে একটু একটু করে শিখেছি। ছোটদের বই, প্রবন্ধের বই, গল্পের বই, উপন্যাস ক'তো সুন্দরভাবে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করা যেতে পারে তার নিদর্শন আছে 'ক্ষীরের পুতুল', 'খাইখাই', 'পাগলা দাশু', 'ভোঁদড় বাহাদুর', 'বহুরূপী', 'নালক',

'শকুন্তলা', 'দিনে তুপুরে', 'পদিপিসির বর্মিবাক্স', 'বুড়ো আংলা', 'প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা', 'ছোট্ট ছোট্ট গল্প', 'মাকু', 'বাদশাহী আংটি', 'সোনার কেল্লা' ইত্যাদি ছোটদের যে কোনও একটা বই হাতে নিলেই বুঝতে পারা যায় একটা বই ডিজাইনের ব্যাপারে উনি কতটা ভাবনা-চিন্তা করে গেছেন। আমার মনে হয় সব চেয়ে কঠিন বিষয় হল একটি ছোটদের বই তৈরী করা, এর উপরেই নির্ভর করে ভবিষ্যৎ পাঠকের রুচি এবং শিল্পবোধ। 'ক্ষীরের পুতুলে'র প্রথম সংস্করণে ভেতরের ছবি সব উনি এঁকেছিলেন। মলাটও উনি এঁকেছিলেন তবে অন্নদা মুন্সীর পরিকল্পনায়। বইটিতে প্রকাশকের কথার শেষে লেখা আছে: "বইকে উপযুক্ত চিত্রে শোভিত করাবার বাধা শুধু বৈষয়িক নয়, উপযুক্ত চিত্রকরের সাক্ষাৎ পাওয়াও চাই। স্বীকার করছি, এদিক থেকে শ্রীমান সত্যজিৎ রায়ের মতো একজন ভালো শিল্পীর অকৃপণ সাহায্য আমরা পেয়েছি। সত্যজিৎ স্বর্গীয় সুকুমার রায়ের ছেলে। বয়েস অল্প, কিন্তু এ বয়েসেই যে প্রতিভার আভাস আমরা পাচ্ছি তাতে এর ভবিষ্যৎ যে অত্যন্ত উজ্জ্বল এ আশা নিঃসন্দেহে করা যেতে পারে।"

আমি এ বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ দেখেছি। তাতে মুদ্রিত আছে তেরশো বাহান্ন সাল, প্রথম প্রকাশের সালটি আমার জানা নেই। যদি ধরা যায় আরও তু'তিন বছর আগে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল, তাহলে আন্দাজে একটা হিসেব ধরা যেতে পারে আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে বইটি প্রকাশিত হয়। বইটি রয়াল সাইজের বোর্ড বাঁধাই করা তিন রঙের প্রচ্ছদ। এবং ভেতরে তু'রঙে ছাপা। এই বইটির প্রতিটি ছবি বাংলা গ্রন্থ-চিত্রণের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। তুলির টানে আঁকা 'তুওরানী', 'সুওরানী', 'রাজার পালতোলা জাহাজের সারি', 'তুওরানীর বানর', 'ক্ষীরের বর', 'ষষ্ঠীঠাকরুণ', 'ষষ্ঠীতলার ছেলের রাজ্য' ইত্যাদি ছবিগুলি দেখার পর মনে হয় এমন আধুনিক বাঙালিয়ানার কাজ ইতিপূর্বে আর হয় নি। 'ক্ষীরের পুতুলে'র ছবি উনি যে রীতিতে এঁকেছেন আবার 'রাজকাহিনী'র ছবি আঁকার সময় একেবারে অন্য রীতিতে আঁকলেন, যাতে গল্পের সঙ্গে ছবির যোগ থাকে। সেখানে রাজস্থানী মিনিয়েচারের আদলে পুরো পাতা জুড়ে এক একটা ছবি। 'ক্ষীরের পুতুলে'র ছবিতে যেমন গ্রাম বাংলার মাটির ছোঁয়া অনুভব করা যায়, আবার 'রাজকাহিনী'র ছবিগুলো একেবারে ভিন্ন স্বাদের। এইভাবে বিষয়বস্তুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে বিভিন্ন স্টাইলে ছবি আঁকার উনি প্রথম পথিকৃৎ, বাংলা বই-এর জগতে এর আগে কোনও শিল্পী এ রকম দৃষ্টান্ত রাখেন নি।

আমরা সাধারণত বই-এর মলাট, তার ছবি এবং ছাপা বিষয়ে তেমন কোনও গুরুত্ব দিই না। আমার কাছে আশ্চর্য লাগে একটা নিম্নমানের কোনও ক্যানভাসে আঁকা ছবিকে যতটা মর্যাদা দিয়ে থাকি তার দশভাগের এক ভাগও একটা ভালো প্রচ্ছদ বা গ্রন্থ-চিত্রণের উপর নেই। অথচ আমাদের দেশে এক সময় রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখ মহান শিল্পীরাও বই-এর

মলাট, ইলাস্ট্রেশন করে গেছেন। সত্যজিৎ রায় তাঁদেরই উত্তরসূরি। তাঁর আঁকা কবিতার মলাট এবং তার নামপত্র বলতে গেলে বাংলা প্রকাশনার জগতে একটা রেনেশাঁ এনেছিল। যেমন সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'সংবর্ত', 'প্রতিধ্বনি', জীবনানন্দ দাসের 'রূপসী বাংলা', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'বনলতা সেন', অমিয় চক্রবর্তীর 'পারাপার', বিষ্ণু দের 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার', 'এলিয়টের কবিতা' ইত্যাদি। যার ফলে সমসাময়িক সময়ে তাঁর কাজের অনুপ্রেরণায় অনেক শিল্পী বেশ ভাল ভাল কাজ করেছেন কিন্তু সে কাজ তাঁর ভাবধারা থেকে মুক্ত হতে পারে নি। ঘুরেফিরে তাঁর ক্যালিগ্রাফি, তাঁর রঙের ব্যবহার, তাঁদের অজান্তেই এসে গেছে। 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' বই-এর মলাটের অনুকরণে পরপর কতো মলাট যে হয়েছে ইয়ত্তা নেই। এমন ভুরিভুরি দৃষ্টান্ত আমার কাছে আছে, যা তাঁর ছবির অনুকরণে আঁকা ছবি, মলাটের অনুকরণে আঁকা মলাট, ক্যালিগ্রাফির অনুকরণে ক্যালিগ্রাফি।

পঞ্চাশ থেকে ষাটের দশকে উনি যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য প্রচ্ছদপট এঁকেছিলেন তার মধ্যে যেমন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'অন্তরঙ্গ', 'বেদে', গোপাল চন্দ্র রায়ের 'শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্প', বার্ণাড শ'র 'সবস নাটক', অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শিল্পায়ন' বা 'আপন কথা', বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের 'স্মৃতির রেখা', 'আম আঁটির ভেঁপু' শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মকথা', ডক্টর সুবিমল বসুর 'রূপচিন্তা', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য', জিম করবেটের 'কুমায়ুনের মানুষখেকো বাঘ', লীলা মজুমদারের 'শ্রীমতি', 'জোনাকী' ইত্যাদি একের পর এক অসামান্য কাজ করে বাংলা প্রচ্ছদপট শিল্পকে তিনি যতটা সমৃদ্ধ করে গেছেন ততটা আর কোনও শিল্পী করতে পারেন নি।

অনেকের ধারণা যে শিল্পীরা বর্তমানে গ্রন্থ চিত্রণ বা প্রচ্ছদপট করেন তাঁরা উপযুক্ত অর্থ পান না বলে বর্তমান বাংলা প্রকাশনার এই দুরবস্থা। কথাটা আমার ততটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। এটা সম্পূর্ণ বোধ আর প্রতিভার ব্যাপার। যাঁর সেটা নেই তাঁকে প্রচুর অর্থ দিলেও তিনি সেই জায়গায় পৌঁছতে পারবেন না। হয়তো একট রঙচঙে চকলেটের বাক্সের মতো ভাবলেশহীন দক্ষতাসর্বস্ব ছবি বা মলাট আঁকতে পারেন, কিন্তু কখনই 'আম আঁটির ভেঁপু'-র মতো ছবি বা 'হাতে-খড়ি'র মতো ছবি আঁকা সম্ভব নয়, যেমন সম্ভব নয় 'সহজ পাঠে'র ছবি করা।

সত্যজিৎ রায় যে কতো বিভিন্ন রকম প্রচ্ছদ, ছবি এবং হরফ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন তা দেখলে অবিশ্বাস্য মনে হয়। শুধু 'সন্দেশ' পত্রিকার কথাই ধরা যাক। যেদিন থেকে তিনি আবার নতুন করে নিজের সম্পাদনায় শুরু করলেন, তখন থেকে একদম তাঁর শেষ জীবন পর্যন্ত সংখ্যাগুলো পরপর যদি পাতা উল্টে যাওয়া যায়, তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে বিভিন্ন গল্প উপন্যাসের সঙ্গে কতো বিচিত্র ধরণের কাজ, কতো অসংখ্য রকমের ক্যালিগ্রাফি। এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা এত ধরণের কাজ তাঁর সমসাময়িক কোনও শিল্পী করেন নি। সেই সঙ্গে 'সন্দেশে'র

কয়েক বছর পর থেকে যদি 'শারদীয় দেশ','আনন্দমেলা'র 'ফেলুদা' এবং 'প্রোফেসর শঙ্কু'র কাজগুলো পরপর দেখা যায়, যদি পরপর 'এক্ষণ' পত্রিকার প্রচ্ছদপট দেখা যায, তাহলে বুঝতে পারবেন বর্তমান ইলাস্ট্রেশন বা কভার ডিজাইনারদের উনি কতটা প্রভাবিত করে গেছেন। সামান্য তিনটে হরফ নিয়ে যে কত-রকমভাবে 'এক্ষণ' পত্রিকার প্রচ্ছদপট এঁকেছেন, দেখলে সত্যি অবাক হতে হয়।

চলচ্চিত্র পরিচালক হয়ে আসার পর তিনি বিজ্ঞাপন জগৎ থেকে সরে এসে-ছিলেন। নিজের ছবির বিজ্ঞাপন, পোস্টার এবং 'সন্দেশ' পত্রিকার ছবি এবং বিশেষ কোন পরিচিত ব্যক্তির অনুরোধে দু'একটা বই-এর প্রচ্ছদপট ছাড়া আর কোন কাজ করতেন না। আমার কাছে যেটা সব চেয়ে আশ্চর্য লাগে, সেটা হলো উনি যখন খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে গেছেন, তখনও পর্যন্ত 'সন্দেশ' পত্রিকার কোন নগণ্য লেখকের গল্পের ছবি উনি কতো নিষ্ঠার সঙ্গে, আন্তরিকতার সঙ্গে একের পর এক করে গেছেন। ওঁর মধ্যে কোনও রকম উন্নাসিকতা বা ছোটখাটো কাজকে উপেক্ষা করার মতো মনোভাব কখনও দেখি নি।

সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে আমার দীর্ঘ বছরের পরিচয়। বলতে গেলে প্রতি সপ্তাহেই আমি তাঁর বাড়ি যেতাম। শুধু যে বই প্রকাশনার কাজ নিয়েই যেতাম তা নয়, উনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন, গেলে খুশি হয়ে আমার সঙ্গে নানারকম গল্প করতেন। বাজারে নতুন কী বাংলা বই প্রকাশিত হল জানতে চাইতেন, তেমনি বই পাড়ার নানা রকম খোঁজখবর নিতেন। শেষের দিকে বলতে গেলে আমি তাঁর পারিবারিক বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম। তিনি নিজেও যেমন কথার নড়চড় করতেন না তেমনি অন্যের কাছেও সেটা প্রত্যাশা করতেন। আমাকে তিনি এ ব্যাপারে বেশ খানিকটা নির্ভর করতেন। তাঁর ফিল্মের প্রযোজনে যখনই কোন সাহায্য প্রয়োজন হয়েছে যেটা আমার পক্ষে সম্ভব, তখনই সেটা আমাকে বলতেন, যেমন ছবির নামপত্রের জন্য আর্টপুল বা কোন টুকিটাকি ছাপার ব্যাপারে প্রয়োজন হলে তিনি আমার উপর দায়িত্ব দিতেন।

আমার বেশ মনে আছে যখন তাঁর লেখা 'বিষয় চলচ্চিত্র' দ্বিতীয়বার ফোটো টাইপ সেটিং-এ নতুন কম্পোজ করে আবার ছাপা হল, তখন তিনি খুব সাগ্রহেই জানতে চাইতেন সেই আধুনিক কারিগরি বিদ্যার খুঁটিনাটি অনেক বিষয়। তিনি আমার কাছে ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন কীভাবে হচ্ছে নিজের চোখে দেখে আসার। অবশ্য তা আর শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠে নি। আমি আমার স্বল্প জ্ঞান নিয়ে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করতাম। তিনি স্থির চিত্তে একভাবে মনোযোগ সহকারে আমার কথাগুলো শুনতেন। তিনি যেমন সুবক্তা ছিলেন, তেমনি শ্রোতাও ছিলেন। যার ফলে তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময় আমি সব চেয়ে স্বাভাবিক বোধ করতাম। তাঁর বিষয়ে বলতে গেলে এ রকম অসংখ্য টুকরো টুকরো স্মৃতি মনে পড়ে যায়। যা নথি-বদ্ধ করলে আয়তনে লেখা অনেক বেড়ে যাবে। তবুও সংক্ষিপ্তাকারে কয়েকটি

ঘটনার কথা উল্লেখ করছি, যা শুনলে বুঝতে পারবেন যে তিনি বুক ডিজাইনের ব্যাপারে কতটা আগ্রহী এবং আধুনিক ছিলেন, নবীনদের কাজের প্রতি তাঁর যথেষ্ঠ আগ্রহ ছিল, যখনই কোনও ভালো মলাট দেখতেন তার প্রশংসা তিনি করতেন। যেমন একবার আমি নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প-সমগ্র উপহার দিতেই তিনি প্রচ্ছদপটটা দেখে বলেছিলেন, 'ভারী চমৎকার মলাট হয়েছে, শিল্পীকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন।' তিনি অন্যের ভাল কাজের প্রশংসা করতে কখনও কার্পণ্য করতেন না। আবার বিপরীত ঘটনাও ঘটেছে, 'যখন ছোট ছিলাম' বই-এর কাজ চলছে। বইতে বেশ কয়েকটা হাফটোন ছাপা আর্ট প্লেট থাকবে, তিনি সেইসব ছবি কোথায় কোথায় যাবে, কীভাবে যাবে সব আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে-ছিলেন। আমি তাঁর নির্দেশমতো সবকিছু এক শিল্পীকে দিযে করিয়ে নিয়ে একদিন সন্ধ্যেতে আবার গেলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই শিল্পী তাঁর ছকে দেওয়া নকশার মধ্যে ছবিটা আসছে না দেখে সুবিনয় রায়ের লম্বা দাঁড়ির নীচের দিকের কিছুটা অংশ বাদ দিযে তাঁর মাপ মতো ছবিটা আঁটিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি সব দেখে বললেন, 'না-না, এ ছবিটা এভাবে যাবে না, সম্পূর্ণ দাড়িসমেত ছবিটা থাকবে।' আমি আবার সেই আর্ট-ওযার্ক ফেরৎ এনে শিল্পীকে তাঁর কথা বললাম। শিল্পী অনেক চেষ্টার পর যেটা নতুন করে করলেন, তাতে সুবিনয় রায়ের দাড়ি এবারও রক্ষা পেল না। তিনি সে ছবি দেখে বললেন, 'একী আবারও দাড়ি কাটা পড়েছে।' আমি তখন শিল্পীর সমস্যাটা বললাম, 'শিল্পী বলছে আপনার মাপ মতো চওড়ায ছবি রাখতে গেলে লম্বা দাড়ি কিছুটা কাটা পড়বে।' তিনি সেই শুনে ভরাট গলায় হাসতে হাসতে বললেন, 'আপনার দাড়িকাটা শিল্পীকে বলবেন, অতো কঠিন মাপজোকের মধ্যে না গিয়ে ছবিটা চওড়ায় ছোট করে, লম্বায় যেন বাড়িয়ে দেয়, তাতে দাড়ির মর্যাদা অন্তত বজায় থাকবে।'

সম্পাদক সত্যজিৎ

নলিনী দাশ

সন্দেশ সম্পাদক সত্যজিৎ রায়

১৯৬১ সালে, মে মাসে, বৈশাখ ১৩৬৮-তে, সত্যজিৎ রায় বন্ধু কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে যুগ্ম সম্পাদক নিয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া 'সন্দেশ' পত্রিকা আবার নতুন করে প্রকাশ করলেন। তখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর।

সত্যজিতের মা সুপ্রভা রায়ের মনে একটা সুগভীর গোপন ইচ্ছা ছিল যে উপেন্দ্রকিশোর-সুকুমার-সুবিনয় রায়ের ঐতিহ্যবাহী 'সন্দেশ' আবার প্রকাশিত হোক। ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও নিকট আত্মীয় দু'এক জনের কাছে তিনি এ-কথা বলেছেন। কিন্তু, সম্ভবতঃ ছেলের মধ্যে তেমন আগ্রহ লক্ষ্য করেন নি তাই তাকে এ বিষয়ে অনুরোধ করেন নি। যখন 'সন্দেশ' আবার প্রকাশিত হল তখন সুপ্রভা আর ইহলোকে নেই।

সত্যজিৎ যে 'সন্দেশ' পত্রিকা আবার প্রকাশ করা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন একথা অবশ্য ঠিক নয়। নতুন পর্যায়ের 'সন্দেশে'র পঁচিশ বছর পূর্ণ হলে, রজত জয়ন্তী উৎসবে তিনি বলেছিলেন যে তাঁরও মনে হত যে 'সন্দেশ' আবার প্রকাশিত হলে খুব ভাল হয়। সেই কারণেই কোন এক রবিবার বন্ধুমহলে কথা প্রসঙ্গে যখন সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব করলেন যে 'সন্দেশ' আবার প্রকাশ করা হোক, সত্যজিৎ তাতে সাগ্রহে ও সানন্দে রাজি হয়ে গেলেন। তখন নিজেদের কোন কার্যালয় বা প্রকাশনা সংস্থা ছিল না। ছাপাখানা তো ছিলই না। ধর্মতলা স্ট্রিটে ছোট একটি অফিস ঘর ভাড়া করে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় তিন-চারটি সহকারী নিয়ে নিজের দায়িত্বে ও সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে আবার 'সন্দেশ' করলেন সত্যজিৎ।

বহু বছর আগে প্রথম পর্যায়ের 'সন্দেশ' বন্ধ হয়ে গেলেও অনেক বাঙালী পাঠকের মনে এই পত্রিকা সম্বন্ধে বিশেষ একটা মমতা থেকে গিয়েছিল। 'সন্দেশে'র রজত জয়ন্তীতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন যে, 'সন্দেশ' আবার প্রকাশিত হবে এই মর্মে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেবার সঙ্গে সঙ্গে রীতিমতন সাড়া পড়ে গিয়েছিল। গ্রাহক হবার জন্য এত বেশি সংখ্যক দরখাস্ত জমা পড়েছিল যে তখনই মনস্থির করে 'সন্দেশ' প্রকাশ করে ফেলা নিতান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত সত্যজিৎ বিশেষ কিছু লেখেন নি। ছোটদের জন্য ছড়া-গল্প তো একেবারেই লেখেন নি। 'সন্দেশ' সম্পাদনার কাজে হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গে যেন কোন মন্ত্রবলে তাঁর মনে সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণার রুদ্ধ উৎসমুখ খুলে

গিয়েছিল। প্রথম সংখ্যা থেকেই তিনি প্রতিমাসে 'সন্দেশে' লিখতে শুরু করলেন। একেবারে প্রথমে অবশ্য মৌলিক কিছু লেখেন নি। বিখ্যাত ইংরেজ লেখক লুই ক্যারল ও এডওয়ার্ড লিয়রের সরস কবিতার উপভোগ্য অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। শারদীয়া 'সন্দেশে' শুরু হল ব্যোমযাত্রীর ডায়রি, সৃষ্টি হলো অবিস্মরণীয় চরিত্র প্রোফেসর শঙ্কু'র। এরপরে লিখলেন অনবদ্য সব ছোট গল্প—বঙ্কুবাবুর বন্ধু, সেপ্টোপাসের খিদে, সদানন্দের খুদে জগৎ প্রভৃতি। আর থেমে থাকা নয়। সৃষ্টি হল নতুন নতুন চরিত্রের, ফেলুদা গোয়েন্দা, যে আজ সুবিখ্যাত, অদ্বিতীয় তারিণী খুড়ো। আরো কত কিছু লিখলেন ক্রমে—মোল্লা নাসিরুদ্দীনের গল্প, রূপকথা, বিখ্যাত ইংরেজি কল্প বিজ্ঞানের অনুবাদ। এইভাবে, চল্লিশ বছর বয়সে, 'সন্দেশ' সম্পাদক সত্যজিতের সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করলেন লেখক সত্যজিৎ রায়।

সত্যজিতের জন্ম হয়েছিল ১০০ নং গড়পার রোডের বাড়িতে, ১৯২১ খৃষ্টাব্দের দোসরা মে, এবং জীবনের প্রথম পাঁচ বছর তিনি সেই বাড়িতেই কাটিয়েছিলেন। এই বাড়িকে সে-যুগের বাংলা শিশু-সাহিত্যের পীঠস্থান বললেও অত্যুক্তি হবে না। বাড়ির সামনের দ্বিতল অংশে ছিল একতলায় ছাপাখানা ও অফিস এবং দোতলায় ব্লক তৈরি ও কম্পোজ করার স্টুডিও আর পিছনের দিকে ছিলো তিনতলা বাসগৃহ। সামনের দেয়ালে, অনেক উঁচুতে, বড় বড় ইংরেজি হরফে লেখা ছিল U Ray and Sons, Printers and Block Makers. সত্যজিতের ছোটবেলার অনেকটা সময় কেটেছে এই প্রেসে ও স্টুডিওতে। উল্টো হরফ বসিয়ে তার থেকে সোজা লেখা ছাপা হচ্ছে, পরপর তিনটে রঙ ছেপে বহুরঙা ছবি তৈরি হচ্ছে, সবই শিশু সত্যজিৎ, দেখেছেন মুগ্ধ বিস্ময়ে। এই বাড়ি থেকেই 'সন্দেশ' পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন তাঁর পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং পিতা সুকুমার ও পিতৃব্য সুবিনয় রায়। কিন্তু সে-সব কথা বোঝবার বয়স তখনও হয় নি শিশু সত্যজিতের। তিনি পিতামহ উপেন্দ্রকিশোরকে চোখে দেখেন নি, পিতা সুকুমারকে হারিয়েছেন মাত্র আড়াই বছর বয়সে।

অনন্য সাধারণ বহুমুখী প্রতিভা ছিল উপেন্দ্রকিশোরের; সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা ও মুদ্রণ শিল্পে তাঁর বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। একদিকে ভাবগম্ভীর ব্রহ্মসঙ্গীত, অপরদিকে ছোটদের জন্য সহজ, সরস গান রচনা করতেন, সহজ, সরস ভাষায় ছোটদের জন্য রামায়ণ, মহাভারত, পৌরাণিক কাহিনী, দেশবিদেশের রূপকথা, মৌলিক গল্প, ছড়া-কবিতা লিখেছিলেন। প্রামাণ্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ছোটদের জন্য লেখার কাজে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ।

সে যুগে আমাদের দেশে রঙিন হাফটোন ছবি ছাপা হত না। বিলেত থেকে বই আর যন্ত্রপাতি আনিয়ে, মৌলিক গবেষণার সাহায্যে উপেন্দ্রকিশোর হাফটোন রঙিন ছবি ছাপার যে পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন, সেটা নাকি পরে সে-যুগে ইংলণ্ডেও ব্যবহৃত হয়েছিল। তাঁর তৈরি ব্লকে ৭৫/৮০ বছর আগে ছাপা রঙিন

ছবিগুলির উৎকর্ষ দেখে আজও বিস্মিত হতে হয়। নিজে নকশা এঁকে গড়পার রোডের বাড়ি তৈরি করিয়ে উপেন্দ্রকিশোর তাঁর প্রকাশনা সংস্থার কাজ শুরু করলেন। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল ১৩২০ সালের বৈশাখে (মে ১৯১৩) ছোটদের জন্য 'সন্দেশ' পত্রিকা প্রকাশ। তখনকার দিনে এমন সর্বাঙ্গীন সুন্দর ছোটদের মাসিক পত্রের কথা কেউ কল্পনাও করেন নি।

'সন্দেশে'র প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর লিখেছিলেন যে, 'আমরা যে 'সন্দেশ' খাই তার দুটি গুণ, সেটা খেতে ভালো লাগে আর খেলে শরীরে বল হয়। তেমনি 'সন্দেশ' পত্রিকা পড়তে যদি ভালো লাগে আর কিছু জ্ঞান লাভ হয় তবেই তার নাম সার্থক হবে।' বাস্তবিকই সার্থক হয়েছিল 'সন্দেশ' পত্রিকার নামকরণ। ছোটবড় সকলেরই ভালো লেগেছিল আর 'সন্দেশ' পড়ে ছোটরা অনেক নতুন জিনিস জানতে পেরেছিল, শিখতে পেরেছিল, তাদের মানসিক বিকাশের সহায়তা হয়েছিল।

কি না থাকত সেদিনের 'সন্দেশে'। নানা ধরণের গল্প, পৌরাণিক কাহিনী, দেশ-বিদেশের রূপকথা-উপকথা, ছড়া, কবিতা, গান, ভ্রমণ কাহিনী, জীবনী, জীবজন্তুর কথা, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক আবিষ্কার, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ আরো কত কি! সমস্ত লেখার সঙ্গে অপূর্ব সুন্দর সব রঙিন, বা সাদা কালো ছবি। প্রবন্ধগুলিও গল্পের মতন চিত্তাকর্ষক।

একেবারে প্রথমে 'সন্দেশে'র প্রায় সব লেখাই উপেন্দ্রকিশোর নিজে লিখে-ছিলেন, কিন্তু কয়েকমাসের মধ্যেই কিছু বিশিষ্ট লেখক যোগ দিলেন। পরিবারের মধ্যেও বেশ কয়েকটি লেখক তৈরি হলেন।

উপেন্দ্রকিশোর মাত্র আড়াই বছর 'সন্দেশ' সম্পাদনা করেছিলেন। ১৩২২ সালের পৌষ মাসে তিনি চোখ বুজলেন। 'সন্দেশ' সম্পাদনা ও ইউ রায় এণ্ড সন্স পরিচালনার ভার নিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুকুমার রায়। সুযোগ্য সহকারী হলেন মধ্যম পুত্র সুবিনয় রায়।

সুকুমার রায় 'সন্দেশে'র সমস্ত ঐতিহ্য ও বিশেষত্ব বজায় রেখে একে আরো চিত্তাকর্ষক করে তুললেন। আরো বেশি সংখ্যক মৌলিক গল্প, স্কুলের গল্প, বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য প্রবন্ধ ছেপে তাকে আরো একটু বড় ছেলেমেয়েদের উপযোগী করলেন। তাঁর সুবিখ্যাত আবোল তাবোলের কবিতা আর পাগলা দাশুর গল্পগুলি প্রথমে 'সন্দেশে'ই প্রকাশিত হয়েছিল। সে যুগে ছোটদের উপযোগী জ্ঞান বিজ্ঞানের বই ছিল না। এই অভাব অনেকটা পূর্ণ করেছিল সুকুমার রায় সম্পাদিত 'সন্দেশ' পত্রিকা। প্রতি মাসেই রঙিন ও হাফটোন ছবি আর ফোটোগ্রাফসহ দু'একটি প্রবন্ধ থাকত—জীবজন্তু, গাছপালা আরো নানা প্রাকৃতিক বিষয়ে বলা হত। আমাদের শরীরের কথা, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিষয়ে প্রবন্ধ, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রভৃতি প্রতিমাসেই ছাপা হত। এর মধ্যে অনেকগুলি সুকুমার নিজে লিখতেন।

সরস বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন সুবিনয়। আর ছোটভাই সুবিমল ঐতিহাসিক কাহিনী লিখতেন। প্রতি লেখার সঙ্গে ফোটোগ্রাফ ও ছবি থাকত। আশ্চর্য চিত্তাকর্ষক আর বুদ্ধিদীপ্ত ধাঁধা আর প্রতিযোগিতা 'সন্দেশে' প্রকাশিত হত। সুকুমার ও সুবিনয় দুজনেই এইসব রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে উপেন্দ্রকিশোরের পরলোকগমনের পর থেকে ১৯২৩-এর ১০ই সেপ্টেম্বর তাঁর নিজের অকালমৃত্যুর অব্যবহিত আগে পর্যন্ত 'সন্দেশ' সম্পাদনা করেছিলেন সুকুমার রায়। রোগশয্যায় শুয়েও যে তিনি কত লিখতেন, আঁকতেন এবং সম্পাদনার অন্য কাজ করতেন সেটা ভাবলে অবাক হতে হয়। এই সময়টাকে আদি 'সন্দেশে'র স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের পরেও দু'তিন বছর তার উন্নত মান অক্ষুণ্ণ রেখে সুবিনয় রায়ের সম্পাদনায় 'সন্দেশ' চলেছিল। কিন্তু ব্যবসায়িক দেনার দায়ে 'ইউ রায় এণ্ড সন্স' প্রকাশনা সংস্থা বিক্রি হয়ে গেল, তাই 'সন্দেশ' প্রকাশও বন্ধ করে দিতে হল। যাঁরা এই ব্যবসাটি কিনলেন তাঁরা ১৩৩৮ সালের আশ্বিন মাসে (অক্টোবর ১৯৩১) সুবিনয় রায় এবং সুধাবিন্দু বিশ্বাসের যৌথ-সম্পাদনায় আবার 'সন্দেশ' প্রকাশ করে-ছিলেন। লেখাতে, ছবিতে, মূল দৃষ্টিভঙ্গি এবং আদর্শে 'সন্দেশে'র মান অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন সুবিনয় রায়। কিন্তু ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই প্রচেষ্টা সফল হয় নি। কিঞ্চিত ঠিক দু'বছর পরেই 'সন্দেশ' প্রকাশ আবার দ্বিতীয়বার বন্ধ হয়ে গেল। সেই হিসাবে সত্যজিৎ-সুভাষ সম্পাদিত 'সন্দেশ'কে তৃতীয় পর্যায় বলা উচিত। কিন্তু যেহেতু এই দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হয়েছিল প্রথম প্রকাশের অল্পদিন পরে এবং সেটি নিতান্তই স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল—১৯৬১ সালে প্রকাশিত 'সন্দেশ'কেই অনেকে দ্বিতীয় পর্যায় অথবা নতুন পর্যায় বলে থাকেন।

দ্বিতীয়বার 'সন্দেশ' প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাবার আটাশ বছর পরে ১৩৬৮ সালে (১৯৬১ খৃষ্টাব্দে) নতুন 'সন্দেশ' বের করলেন সত্যজিৎ রায় ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। 'সন্দেশে'র রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন যে, কোন পত্রিকা প্রকাশ ও পরিচালনা করতে হলে কি কি প্রয়োজন সে সম্বন্ধে তাঁদের কারোরই খুব পরিষ্কার ধারণা ছিল না। আয়-ব্যয়ের একটা খসড়া হিসাব তাঁরা করে নিয়েছিলেন, কিন্তু কাজে নেমে দেখা গেল যে তার মধ্যে আবদ্ধ থাকা সম্ভব হল না।

আয়-ব্যয় আর পরিচালনার ভার যুগ্ম সম্পাদক এবং ম্যানেজার অশোক ঘোষের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন সত্যজিৎ। তিনি নিজেও প্রায়ই 'অফিসে' যেতেন, যদিও নিয়মিত বসবার সময় পেতেন না। নিজের বাড়িতে বসেই তিনি 'সন্দেশে'র লেখা, ছাপা, মলাট, ছবি আর লে-আউট বিশেষ যত্নের সঙ্গে করতেন। ভাল কাগজে, সেরা প্রেসে 'সন্দেশ' ছাপা হত। অভিনব মলাট আর একটি রঙিন পূর্ণপৃষ্ঠা প্রথম ছবি কেবল নয়, নিজের এবং অন্যের লেখার সঙ্গে আরো অনেক

ছবিই আঁকতেন সত্যজিৎ। পরপর তিনবছর ভারত সরকারের কাছ থেকে ছাপা ও অঙ্গসজ্জার উৎকর্ষের জন্য প্রশংসাপত্র পেয়েছিল 'সন্দেশ'।

লেখা মনোনয়নেও সত্যজিতের বিশেষ ভূমিকা ছিল। প্রতি সংখ্যায় একটি-দুটি পুরোনো 'সন্দেশে'র লেখা দেওয়া হত। তখনও উপেন্দ্রকিশোর অথবা সুকুমারের লেখার কপিরাইটের মেয়াদ শেষ হয় নি। সিগনেট প্রেস প্রকাশিত কয়েকটি বই ছাড়া এঁদের কোনও লেখা পাওয়া যেত না। 'সন্দেশে'র পৃষ্ঠায় এঁদের লেখা তাই বিশেষ সমাদর পেত। সুখলতা রাও, পুণ্যলতা চক্রবর্তী, সুবিমল রায় আর লীলা মজুমদার নতুন 'সন্দেশে' লিখতেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, আশাপূর্ণা দেবী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত লেখকদের লেখা যেমন ছাপা হত, অপর দিকে শিবাণী রায়চৌধুরী, গৌরী চৌধুরী (পরে ধর্মপাল) প্রমুখ নতুন লেখকদের ভাল লেখাও ছাপা হত। এঁরা কেউ কেউ পরবর্তী জীবনে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এইভাবে নতুন-পুরোনো লেখা মিলে এই নতুন 'সন্দেশ' প্রথম সংখ্যা থেকেই উন্নত মানের হয়েছিল।

'সন্দেশে' দুটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ খোলা হয়েছিল। 'জীবন সর্দার' নাম নিয়ে সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর' শুরু করেন, যার সাহায্যে ছেলে-মেয়েরা কেবলমাত্র প্রকৃতি সম্বন্ধে পড়বে না, হাতে-কলমে পর্যবেক্ষণ করে জানবে, বুঝবে, শিখবে।

'হাত পাকাবার আসরে' তাদেব নিজেদের ভালো লেখা আর আঁকা ছবি ছাপা হবে। উৎসাহিত হয়ে তারা আরো ভাল লিখবে আর আঁকবে।

ধাঁধা আর প্রতিযোগিতাগুলি বিশেষ বিবেচনা করে তৈরি করা হত। বুদ্ধি-দীপ্ত আর চিত্তাকর্ষক ধাঁধার সমাধান করতে ছোটদের খুব ভাল লাগত, তারা অনেক মাথা খাটিয়ে সমাধান করত। সত্যজিতের আঁকা 'ভুল ছবি'র ভুলগুলি খুঁজে বের করতে যে তাদের কেবল মজাই লাগত তাই নয়, মনোযোগ আর পর্যবেক্ষণের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেত। লেখা আর আঁকার প্রতিযোগিতা নতুন ধরণের হত।

প্রথম থেকেই সত্যজিতের মনে ইচ্ছা ছিল যে 'সন্দেশ' দেখতে সুন্দর হোক, তার মধ্যে ভাল লেখা থাকুক তো বটেই। এখন রঙের যুগ, তিনি 'সন্দেশ'কে রঙিন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সীমিত অর্থের মধ্যে সেটা করা সম্ভবপর হয় নি। তবু দু'বছরের মধ্যেই বোঝা গেল যে লেখা, ছবি ও ছাপার মান যতই উঁচুদরের হোক না কেন, বাড়িভাড়া, কর্মীদের বেতন প্রভৃতি সব খরচ চালিয়ে, বাইরের প্রেসে ছাপিয়ে কোন অব্যবসায়িক ছোটদের পত্রিকা স্বাবলম্বী হতে পারে না। 'সন্দেশে'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত সকলে পরামর্শ করে তখন 'সুকুমার সাহিত্য সমবায় সমিতি' নামে সমবায় গঠন করলেন। আর তার শেয়ার বিক্রির টাকায় 'সন্দেশে'র ব্যয়ভার লাঘব করতে চাইলেন। সত্যজিৎ রায় হলেন এই সমবায় সমিতির সভাপতি আর লীলা মজুমদার সম্পাদিকা। সাময়িক সুবিধা হলেও বোঝা গেল যে এটা স্থায়ী

সমাধান নয়। তখন ধর্মতলা স্ট্রিটের ভাড়া করা অফিস ঘর ছেড়ে অশোকানন্দ দাশের বাড়িতে 'সন্দেশ' কার্যালয় স্থানান্তরিত করা হল। সামান্য বেতনে একটি-মাত্র পার্ট টাইম কর্মী নিয়োগ করে বাকি সব কাজ নিজেরা করা স্থির হল। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে সত্যজিতের যুগ্ম সম্পাদক হলেন এখন লীলা মজুমদার, আর প্রকাশক অশোকানন্দ দাস। নামী-দামী ছাপাখানা ছেড়ে সাধারণ প্রেসে 'সন্দেশ' ছাপানো স্থির হল। এই সিদ্ধান্ত সত্যজিতের মনের মতন না হলেও 'সন্দেশ'কে বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র উপায় জেনে তিনি এ সমস্তই মেনে নিলেন। পরবর্তীকালে কাগজের দাম অস্বাভাবিক রকম বেড়ে গেলে পর নিউজপ্রিণ্টে 'সন্দেশ' ছাপার সিদ্ধান্তও তেমন দুঃখিত মনে মেনে নিয়েছিলেন সত্যজিৎ।

'সন্দেশে'র জন্য আরো বেশি করে লিখতে লাগলেন সত্যজিৎ। নতুন নতুন মলাট, ছবি আর হেডপিস আঁকতে লাগলেন। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে শঙ্কুর কয়েকটি গল্প নিয়ে 'প্রোফেসর শঙ্কু' বইটি প্রকাশিত হল। 'সন্দেশে'র সীমিত গ্রাহক-পাঠকদের বাইরে পরিচয় হল লেখক সত্যজিতের। এই প্রথম বই-ই সে বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ কিশোর-গ্রন্থরূপে আকাদেমি পুরস্কার পেল ভারত সরকারের কাছে। ইতিমধ্যে ১৯৬৫-তেই 'সন্দেশে' আর এক নতুন চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন সত্যজিৎ, 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি' নামে একটি ছোট উপন্যাস লিখে তিনি সাড়া জাগিয়েছিলেন। পরের বছরেই বেরোল তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস 'বাদশাহী আংটি'। ইতিমধ্যে আনন্দ পাবলিশার্স ছোট গল্পগুলির বারোটি নিয়ে 'এক ডজন গল্প' ছেপেছেন, তারপরে প্রকাশ করেছেন 'বাদশাহী আংটি'। এইভাবে বৃহত্তর পাঠক সমাজের কাছে উপস্থিত হলেন সত্যজিৎ। ক্রমে ক্রমে তাঁর বইগুলি জনপ্রিয় লেখকের তালিকায় তাঁকে শীর্ষস্থানে বসিয়ে দিল।

বিখ্যাত লেখক হবার পরেও সত্যজিৎ রায়ের 'সন্দেশ' সম্পাদনার কাজ সমান উদ্যমে চলতে লাগল। ওঁর একটি-দুটি বাদে সমস্ত লেখাই তো আগে 'সন্দেশে' প্রকাশিত হত, পরে বই হয়ে বেরোত। নিজের ও অন্যের লেখার সঙ্গে চমৎকার সব ছবি আঁকতেন। প্রতি বছর নতুন মলাট তো আঁকতেনই। কিছুদিন বাদে-বাদেই বিভিন্ন বিভাগের নতুন হেডপিস আঁকতেন। হাতে-কলমে লে-আউট করার সময় না পেলে বিশদ নির্দেশ দিতেন, কোন টাইপে কোন লেখা ছাপা হবে, কিভাবে লে-আউট হবে। আগের মতনই প্রতি বছর চমকপ্রদ সব প্রতিযোগিতা তৈরী করতে লাগলেন।

ক্রমে 'সন্দেশে'র দাম বাড়িয়ে, ও বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে অর্থের জোগান বাড়ান হলেও, কাগজের দাম, ছাপার খরচ প্রভৃতি বহুগুণ বেড়ে যাওয়ার ফলে আর্থিক অবস্থার উন্নতি হল না। পত্রিকার চেহারা আরো সুদৃশ্য করতে না পেরে দুঃখিত হতেন সত্যজিৎ। আরো ভাল লেখা সংগ্রহ করে, আরো বেশি লিখে আর এঁকে 'সন্দেশ'কে চিত্তাকর্ষক করতে চেষ্টা করতেন।

'সন্দেশে'র রজত জয়ন্তীতে সত্যজিৎ বলেছেন যে আমাদের জোরটা হচ্ছে লেখায়, বাইরের চেহারায় নয়। গ্রাহক-গ্রাহিকারা যদি দেখে যে রঙচঙে কাগজের চেয়ে এই সাদাকালো পত্রিকার লেখার মান উঁচু, তাহলে তারা 'সন্দেশে'র দিকেই ঝুঁকবে।

অনেক বছর ধরে 'সন্দেশ' চালিয়েছেন তিনজন সম্পাদক। তাঁরা আলাদা জায়গায় থাকেন। কার্যালয়ে এসে বসবার সময় নেই সত্যজিৎ রায়ের অথবা লীলা মজুমদারের। তবু তাঁরা তিনজনে একথেকেই কাজ করেছেন। এটা সম্ভব হয়েছিল তিনজনের মধ্যে একটা পরিষ্কার বোঝাবুঝি থাকার ফলে।

নলিনী দাশের বাড়িতেই কার্যালয় থাকার ফলে তাঁকে সমস্ত লেখাই প্রাথমিক-ভাবে পড়তে হত। লেখাগুলি তালিকাভুক্ত করে তিনি মোটামুটি ভাল সমস্ত লেখাই পাঠাতেন লীলা মজুমদারের কাছে। লীলাদি সেসব লেখার গুণগত মান অনুসারে শ্রেণী বিভাগ করতেন, প্রয়োজনবোধে সম্পাদনা করতেন। কোনো লেখার মধ্যে যথেষ্ট উন্নতির সম্ভাবনা দেখলে তিনি লেখককে দিয়েই সেটা সংশোধন করাতে চেষ্টা করতেন। এর পরে আরো কড়া সমালোচকের দৃষ্টিতে সমস্ত লেখার চূড়ান্ত বিচার করতেন সত্যজিৎ। তার মানে তিনি যে কেবল কড়াভাবে লেখা ছাঁটাই করতেন তাই নয়, লীলাদির মতন তিনিও সম্ভাবনাপূর্ণ লেখার লেখককে নির্দেশ দিয়ে লেখার উন্নতি করাতেন। এইভাবে, এই দুই সম্পাদকের সাহায্যে অনেক অনভিজ্ঞ 'কাঁচা' লেখক পরে রীতিমতন 'পাকা' হযেছেন, কেউ কেউ আজ সুপ্রতিষ্ঠিত নামী লেখক। এঁরা এখনও অকপটভাবে স্বীকার করেন যে তাঁদের সাহিত্যিক জীবনে প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতিলাভে অনেকখানি সাহায্য করেছিল সত্যজিৎ রায়ের সমালোচনা ও মন্তব্য। সেখানেই লেখার মধ্যে সার্থকতার ইঙ্গিত পেয়েছেন, তাকেই তিনি বিশদ নির্দেশ দিয়ে সংশোধন করিয়েছেন। ছবির বেলাও তাই। অনেক তরুণ শিল্পীকে নির্দেশ দিয়ে আরো ভাল ছবি আঁকতে শিখিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়।

ছেলেমেয়েরা রোমাঞ্চকর কমিক স্ট্রিপ চায়। কিন্তু যে সব কমিক্স্ জমা পড়ে সেগুলি সম্পাদকদের পছন্দ হয় না। নলিনী দাশ একটা গল্প দিলেন, সেটা পছন্দ সই। প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় তার ছবি আঁকতে প্রস্তুত। কিন্তু কমিক স্ট্রিপ তৈরি সম্বন্ধে কারো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। নতুন একটা কমিক স্ট্রিপ করার সমান পরিশ্রম করে সত্যজিৎ পুরো গল্পটার ডায়ালগ সহ কমিক্স্এর খসড়া করে দিলেন, তবে প্রশান্ত আঁকতে পারলেন। 'টোটোর এডভেঞ্চার' নামে সেই কমিক স্ট্রিপ নলিনী দাশ ও প্রশান্তর নামে ছাপা হয়েছিল। সেটা খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

'সন্দেশে'র লেখা মনোনয়নের জন্য যেমন সত্যজিতের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হত, তেমনি কম্পোজ করা 'ম্যাটার' ছবি আঁকা আর লে-আউটের জন্য আবার

তাঁর কাছে যেত। অনেক সময়ে তিনি কাজ করতেন গভীর রাতে। নির্বাচন আর লে-আউট দুই কাজেই তিনি অন্য সম্পাদকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন টেলিফোনে অথবা চিঠি ও চিরকুট লিখে। প্রয়োজন হলে লেখা লীলা মজুমদারের কাছে ফেরত দিয়ে আবার আলোচনা করতেন। অত্যন্ত খুঁটিয়ে দেখে সমালোচনা করা হত। কোন লেখা ইণ্টারেস্টিং কিন্তু সঙ্গে আরো ফোটো চাই; আর একটা লেখায় উদাহরণের বড অভাব; তৃতীয় একটা লেখার বিশেষ অংশ দুর্বল অথবা অবিশ্বাস্য; কোনটা ভাল কিন্তু ছোটদের উপযোগী নয়। কিছুই সত্যজিতের নজর এড়িয়ে যেত না।

১৩৯১ সালে, ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দে, স্থির হল যে এরপর থেকে 'সন্দেশ' ছাপা হবে অফসেট প্রেসে। খুবই খুশি হলেন সত্যজিৎ। ব্লক তৈরির ঝামেলা এবং খরচ না থাকলে, যত ইচ্ছা ছবি আর ফোটো ব্যবহার করে মনের মতন লে-আউট করা যাবে। দুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময়ে হল তাঁর প্রথম হার্ট এট্যাক। তাঁকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে রাখা হল, দেখা করা নিষেধ, কথা বলা বারণ। সেই অবস্থায় তিনি নার্সিং হোমে শুয়ে শুয়ে নলিনী দাশকে চিরকুট লিখে পাঠালেন, 'নববর্ষ সংখ্যার লে-আউট কিন্তু আমি নিজে হাতে করব।' 'সন্দেশ' পত্রিকার প্রতি কতখানি ভালবাসা থাকলে তবে এমন সাংঘাতিক অসুস্থ অবস্থায় লে-আউটের কথা চিন্তা করা যায়, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

'সন্দেশে'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর ছোটদের জন্য সরস জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রবন্ধ লেখায় পথিকৃৎ। এই ধারাটি রক্ষা করেছিলেন তাঁর গুণী পুত্রেরা, সুকুমার ও সুবিনয়। কিন্তু নতুন পর্যায়ের 'সন্দেশ' প্রকাশ করবার সময় থেকেই অনুভব করা গিয়েছিল যে যথেষ্ট সংখ্যায় প্রবন্ধ ছাপা যাচ্ছে না। কারণ প্রামাণ্য তথ্যসমৃদ্ধ অথচ সহজ ও সরস প্রবন্ধ যথেষ্ট পাওযা যাচ্ছে না। সত্যজিৎ রায় নিজে অবশ্য কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সহজ করে লিখেছিলেন 'সিনেমার কথা'— ফিল্ম তৈরির কলাকৌশল। বিভিন্ন ছবি তোলার সময়কার নানা কৌতুককর অভিজ্ঞতার কথা কয়েকটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন। পরে সেগুলি 'একেই বলে শুটিং' নাম দিয়ে বই ছাপা হযেছিল।

১৯৮৪-তে অফসেটে 'সন্দেশ' ছাপা শুরু হবার পর সত্যজিৎ প্রামাণ্য বিদেশি বই থেকে ও পত্র-পত্রিকা থেকে তথ্য নিয়ে অনেক ফোটোগ্রাফসহ কয়েকটি চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাছাড়া বিচিত্র কতগুলি জীবজন্তুর কথা 'আশ্চর্য প্রাণী' নাম দিয়ে মাসে মাসে লিখেছিলেন—পাশজোডা ফোটোর সঙ্গে সামান্য-ক-লাইনে প্রাণীটির বিষয়ে কিছু লেখা থাকত।

এইভাবে সম্পাদক সত্যজিৎ তাঁর প্রাণপ্রিয় 'সন্দেশ' পত্রিকাকে প্রায় একত্রিশ বছর ধরে লেখায়, রেখায়, অঙ্গসজ্জায়, সব দিক দিয়ে ছোটদের সেরা মাসিকপত্র করে গডে তুলতে চেষ্টা করে গিয়েছিলেন।

অনুবাদক সত্যজিৎ

স্বরাজ সেনগুপ্ত

অনুবাদ-সাহিত্য : সত্যজিৎ রায়

আজো তবু অবিরাম প্রয়াণ চলেছে মানুষের :
শব্দের অঙ্গার থেকে স্ফুলিঙ্গের মতো ভাষাজ্ঞান
জ্ঞানের নিরবচ্ছিন্ন শক্তি খুঁজে তবু প্রেম
পাওয়া যায় কি না তার অক্লান্ত সন্ধানে !

—জীবনানন্দ

শব্দের জলন্ত অঙ্গার থেকে স্ফুলিঙ্গের মতো ভাব খোঁজার অবিরাম প্রেরণায় অনুবাদ সাহিত্য একটি ভিন্ন স্বাদের সাহিত্য জগৎ সৃষ্টি করে। সাহিত্যের জগৎ সম্পূর্ণভাবে বিশ্বজনের অন্তরের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হোক—অনুবাদ সাহিত্যের এই হলো প্রধান অঙ্গীকার। অন্তরের ঐশ্বর্য না থাকলে জীবনে জীবন যোগ করার স্বপ্ন অনেক দূরে থেকে যায়। আমরা অপরিচিত রয়ে যাবো। অপরিচিতের বেড়াজাল ভাঙতে হলে পরস্পরকে জানবার এবং জানাবার প্রয়োজন অনেক। পরস্পরকে জানতে এবং জানাতে হলে তাদের ভাষা, তাদের কৃষ্টি, তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে, প্রথমেই। বিশ্বাস করি, যে-কোনো ভাষা তার সাহিত্যের উপাদান দিয়েই অন্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পাবে। আর এই পরিচিতিটুকু আসার পরে প্রাথমিক পরিচয় পর্বই হবে আন্তরিক।

এদেশে অনুবাদ সাহিত্য অনেক দিন ধরেই চলছে। স্মরণীয় অনুবাদ-সাহিত্য স্রষ্টাদের মধ্যে সেকালে এবং একালে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে বুদ্ধদেব বসু পর্যন্ত অনেকেই আছেন। এঁদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু অনুবাদ-সাহিত্যে মৌলিক শিল্পপ্রতিভা ও কথানৈপুণ্যের চিরোজ্জ্বল স্পর্শ এঁকে রেখেছেন। অনুবাদক সত্যজিৎ রায় প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের 'তীর্থসলিল' আমাদের মনে পড়বেই। আমাদের কালেও কোনো কোনো সাময়িক পত্র-পত্রিকায় কিছু কিছু অনুবাদের কাজ হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এবং পরিকল্পনা নিয়ে বড়ো রকমের কাজ কিছু হয় নি। আমার মনে হয়েছে, বিক্ষিপ্তভাবে নয়, একটি সুসংহত পরিকল্পনা নিয়েই এই কাজ হোক। কারণ, আজকের পৃথিবীতে বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় আনতে না পারলে বিশ্বমানব চেতনার আদর্শই ক্ষুণ্ণ হবে। বিশ্ববোধ গড়ে উঠবে না। এক প্রাণ, এক সত্য এবং সহভাবনাই হলো বিশ্ববোধের মূল উৎস। শুধু ভারতের রাজ্যে রাজ্যেই নয়, ভারতের বাইরেও তো আরো দেশ আছে, তাদের সুসমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও

সাহিত্য সৃষ্টির ধারা সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। জানতে হবে বিশ্ববোধ, বিশ্বমৈত্রী এবং দেশে দেশে সহবোধ ও সহমর্মিতার প্রসার হওয়ার জন্যই। 'মুক্তধারা'র ধনঞ্জয় বৈরাগীর কথা তুলে বলা যেতে পারে, 'জগৎটা বাণীময় রে, তার যে দিকটাতে শোনা বন্ধ করবি, সেই দিক থেকেই মৃত্যুবান আসবে।' তাই পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সব দিকই খুলে রাখতে হবে। খুলে রাখতে হবে এই জন্যই যে, আমাদের মনে হয়, গোটা মানব-সমাজের মধ্যে এক অন্তর্নিহিত ঐক্য আছে এবং তার সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ভাণ্ডার বুঝি এক ও অবিভাজ্য।

কোনো বৃহৎ পরিকল্পনা নিয়ে সত্যজিৎ রায় অনুবাদ-কর্মে মনোযোগী হন নি। এর কারণ আমরা জানি। তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণেই তাঁর সৃষ্টি-প্রতিভা ও নৈপুণ্যের বৃহদাংশ বিনিয়োগে আনন্দ পেয়েছেন। ছবি এঁকেছেন, গল্প-উপন্যাস লিখেছেন, শিশুসাহিত্য—ছড়া, রূপকথা, উপকথার জগতেও শিশুদের নিয়ে গেছেন। বিজ্ঞানের সঙ্গে রহস্যময়তাকে মিশিয়ে তিনি এক ভিন্ন রসের স্বাদ আমাদের দিয়েছেন। এত সব নির্মাণ-ব্যস্ততার মধ্যে অনুবাদ তাঁর বেশি সময় কেড়ে নিতে পারে নি। তবু যে তিনি আগ্রহের সঙ্গে দু'একটি অচেনা জগতের দুয়ার খুলে দিয়েছেন, তার মূল্যও কম নয়। হোক না সে ছড়া ও শিশুপাঠ্য গল্পের জগৎ—এ জগৎটাও তো এই বাংলার মাটিতে এসে আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছে। দূরাগত বাতাসের মৃদু স্পর্শ তো আমরা পেয়েছি।

আমরা জানি এদেশে অনুবাদের কাজ এত দিনেও ঠিকভাবে পরিকল্পনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে না পারার কারণ আছে। একটা বড়ো কারণ এর প্রয়োগগত সমস্যা। যে ভাষা থেকে অনুবাদ হচ্ছে সেই মূল ভাষার সঙ্গে সুন্দর বোঝাপড়া না থাকলে অনুবাদ স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। আবার যে ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে সেই ভাষাতেও অনায়াস দখল থাকা দরকার। শুধু আক্ষরিক অনুবাদ, অনুবাদই নয়। আবার অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যে—সে ক্ল্যাসিক এপিকই হোক অথবা ছেলে-ভোলানো রাইমই হোক—মূল রচনার সুর না বাজলে মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তন্তুগুলি সজীব হবে কেমন করে? যে কোনো সৃষ্টিধর্মী রচনার ক্ষেত্রেই বোধ হয় একথা খাটে। তবে সবদিক খতিয়ে মনে হতে পারে, কবিতা বা ছড়ার অনুবাদ অত্যন্ত দুরূহ কাজ। অনুবাদকে সাহিত্যমূল্য দেওয়ার জন্য ফরাসী কবি মালার্মে প্রস্তাব করেছিলেন, অনুবাদ সাহিত্যে যুগ্ম অনুবাদকের সাহায্য নেওয়া উচিত। প্রথমজন আক্ষরিক অনুবাদ করবেন, দ্বিতীয়জন তার সাহিত্যিক রূপ দেবেন। এতে, তাঁর মতে, সৃষ্টিধর্মী রচনাগুলি অনুবাদেও সহজে রসোত্তীর্ণ হতে পারে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একেবারে প্রথম দিকে অর্থাৎ উনিশ শতকে অনুবাদের উপরে অত্যন্ত জোর দেওয়া হয়েছিলো। সে জোরটা কিন্তু এখন আর দেওয়া হয় না। অথচ ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনুবাদ যে এক ও অন্যতম বাহক একথা স্মরণযোগ্য। এই প্রসঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের কৃতিত্ব

স্মরণ করতে হয়। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ও ইংরেজির সেরা সেরা সাহিত্য বাংলায় রূপান্তরিত করে বাংলা গদ্যসাহিত্যকে শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন। অনুবাদ-সাহিত্য সৃষ্টির এই ঐতিহ্যের ধারা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের যুগ ধরে প্রবাহিত হয়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসুর যুগে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু তারপর? তারপর এই ধারাটি যে শুকিয়ে এসেছে, তা স্বীকার করতেই হবে।

জানি, এখন সময়ের পরিবর্তন হয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বোধ-বুদ্ধি চেতনারও পরিবর্তন হয়েছে। বাংলা সাহিত্য অনেক এগিয়ে গেলেও অনেক অন্ধকার এখনও আছে। অনুবাদ-সাহিত্য এই অন্ধকারে আলো জ্বালাতে পারে। সস্তা ও অহম্-সর্বস্ব সাহিত্যের নাগপাশ থেকে বাংলা-সাহিত্যের প্রগতির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী সাহিত্যের নানা বর্ণের ফুল চয়ন করে বাঙালি পাঠকের মনে রীতিমত আন্দোলনের মননশীলতা তৈরি করা—এই আন্দোলন ভাষার, সুরুচি-সাহিত্যের, আত্মদর্শন ও বিশ্বদর্শনের। সাহিত্য যদি সমাজের আয়না হয়, তবে সেই আয়নাতে বিধ্বস্ত আমাদের মুখের পরিবর্তে এক সম্পূর্ণ ও সুন্দর পৃথিবীর মুখ প্রতিবিম্বিত করতে পারে অনুবাদ-সাহিত্য।

একথা স্বীকার করতে দুঃখ নেই, সত্যজিৎ রায় এমন আন্দোলনের মননশীলতা গড়তে পারেন নি। কিন্তু তিনি তো প্রধানত ভিন্ন এক জগতের মানুষ, ভিন্ন এক নতুন জগতের স্রষ্টা। তিনি তো তাঁর জগতের বাইরে এসে দাঁড়িয়েও অনুবাদকর্মে নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে কলম ধরেছেন, সফলও হয়েছেন। কিন্তু আমাদের কালে যাঁরা শুধু লেখালেখির জগতেই আছেন? তাঁরা? তাঁরা কি করছেন? যে যাঁর বাঁধাধরা ক্ষুদ্র জগতের মধ্যেই আটকে আছেন। তাঁদের বিশ্ববোধ এত দরিদ্র যে বিশ্ব-সাহিত্যের জগতের দিকেই চোখ ফেরাতে সাহস পান না। কেউ কেউ তো পাঠককে চমকে দিতে বিদেশী গল্প-কবিতার অনুবাদ বা ভাবানুবাদ করে—নাম ধাম বদলে দিয়ে—নিজেদের নামে চালিয়ে দিতেও পেরেছেন। তাতে তাঁরা পরিচিত হয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই দূরের বিদেশী জগৎ অপরিচিতই থেকে গেছে।

২

প্যাবলো নেরুদা তাঁর নিজের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করতে গিয়ে বলেছিলেন—'The translation must render, replicate its original faithfully, and yet create a new, authentic rhythm and idiom, the process is one of metamorphosis and transmigration at the same time.' প্রশ্নহীন অভিমত। সুতরাং অনুবাদের মানরক্ষা নিঃসন্দেহে সহজ

কাজ নয়। রসোত্তীর্ণ সাহিত্য সৃষ্টির ভাষান্তর সৃষ্টির মূল রূপরীতিকে কতটা অক্ষত রাখতে পেরেছে, তা'ও বিচারের বিষয়। পৃথিবীর যে কোনো ভাষারই এমন কতকগুলি বিশিষ্ট ধ্বনি ও স্পন্দন থাকে যেখানে সে স্ব-মহিমার অধিকারী, স্ব-রূপে উজ্জ্বল। অন্য একটি ভাষা এই ধ্বনি ও স্পন্দন আত্মস্থ করে নিতে পারে কি না সন্দেহ আছে। শব্দ সম্পদের তারতম্যও অনুবাদের ক্ষেত্রে একটা বড়ো সমস্যা। যে-ভাষার শব্দ-সম্পদ যত বেশি সে তত সহজে ভাবপ্রকাশের পথ খুঁজে পায়। অপরপক্ষে, শব্দ ভাণ্ডারের দীনতা ভাষা ও সাহিত্যকে পঙ্গু করে রাখে, বাড়তে দেয় না। এর ফল এমন হতে পারে যে, অনুবাদ শুধু ভাষার জোরে মূল রচনাকে ছাড়িয়ে গেছে, আবার ভাষার দীনতায় মূলের কাছাকাছিও পেঁাছোতে পারছে না। অনুবাদ যখন যথার্থ সৃষ্টি হয়ে ওঠে, তখন তা ভাষার গুণেই হয়।

একথা একবারও বলতে চাই না যে, দরিদ্র ভাষায় সুসমৃদ্ধ সাহিত্যর অনুবাদ করা অনুচিত অথবা তেমন ভাষায় রচিত সাহিত্যকে শ্রেষ্ঠ ভাষায় রূপান্তরিত করা পণ্ডশ্রম। বরং বলবো, অনুবাদের ক্ষেত্রে ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদ মুছে ফেলতে পারলেই একটি বিশ্বসাহিত্য সংহতি গড়ে উঠতে পারে। নানা ভাষার সৃষ্টিলোকের দুয়ারগুলি খুলে রাখতেই হবে। আগেই বলা হয়েছে, অনুবাদ এই দুয়ারগুলি খুলে রাখে।

অনুবাদের ক্ষেত্রে আরও একটা বড়ো সমস্যা আছে ; সে বিষয়ে অনুবাদকেরা সর্বদা সচেতন থাকেন না। যে-সাহিত্য তাঁরা অনুবাদ করছেন তার একটা সমাজ আছে—তার বাস্তব পটভূমি। এই সমাজটাকে ভালো করে জানতে না পারলে, তার আচার-আচরণ, বিধিবিধান, জীবন-জীবিকার সঙ্গে পরিচিত হতে না পারলে অনুবাদ শুধু ভাষান্তর হবে ; তাতে প্রাণ সঞ্চারিত হবে না, সে কিছুতেই সৃষ্টি হয়ে উঠবে না। ইংরেজি অথবা জার্মান, আরবী অথবা ফারসী, ওড়িয়া অথবা তামিল কোনো সাহিত্যেরই অনুবাদকর্মের মূলধন শুধু ভাষাজ্ঞান নয়, শুধু এই ভাষাগুলি জানলেই চলবে না—এই সব ভাষা-ভাষী জাতির জীবনের একেবারে ভেতরের কথা জেনে নিতে হবে। তা না পারলে, অনুবাদ বিকলাঙ্গ ও শিথিল হবে।

সমস্যা আরো আছে, অনেক সমস্যা। পৃথিবীর নানা দেশ শুধু ভৌগোলিক দূরত্বে নয়, আরো নানা ভাবে আমাদের অপরিচিত। এসব দেশের সাধারণ মানুষের চালচলন, আদবকায়দা, হিংসা প্রেম বিদ্বেষ, হাসি কৌতুক রসিকতা, প্রভৃতি সবই আমাদের অচেনা অজানা। সুতরাং এ-সব দেশের জনজীবন যখন সাহিত্যের আঙিনায় এসে দাঁড়ায়, সে-সব সাহিত্যের অনুবাদ যদি শুধু ভাষা বদল হয়, তাহলে আর যাই হোক তা সৃষ্টির মর্যাদা পায় না। বাংলা ভাষায় অনুবাদ কর্মে এমন 'অনাসৃষ্টি'র আবর্জনা বিপুল পরিমান।

৩

অনুবাদ-কর্মে ক্ষুদ্রায়তনে সীমাবদ্ধ থেকেও সত্যজিৎ রায় অনাসৃষ্টির আবর্জনা বাড়িয়ে তোলেন নি। এক্ষেত্রেও যে তিনি শিল্প ও শিল্পীর মান রক্ষা করেছেন—একথাটা নিশ্চয় মান্য। তাছাড়া অনুবাদ-কর্মেও তিনি এমন এক একটা জগৎ বেছে নিয়েছেন যেখানে তিনি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারেন। যে-সব সমস্যার কথা বলেছি, সেগুলি সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন বলেই বিশ্বসাহিত্যের কোনো ক্ল্যাসিক্যাল শাখার অনুবাদ-কর্মে তিনি উৎসাহ পান নি। তিনি আর্থার কনান ডয়েল-এর রহস্যঘন অরণ্যে, আর্থার সি. ক্লার্কের অচেনা গ্রহলোকে, রে ব্র্যাডবেরির দূরাকাশে আমাদের নিয়ে এসেছেন। তাঁদের এক একটি রোমাঞ্চকর গল্পের বাংলা রূপান্তরে সত্যজিৎ রায় নিপুণ যাদুকরের মতো আমাদের অবাক করে দিতে পেরেছেন। মনেই হয় না, আমরা অনুবাদ পড়ছি, মৌলিক সৃষ্টি বলেই মনে হয়। নামধাম বদলে নিলে 'ব্রেজিলের কালো বাঘ ও অন্যান্য' সংকলনের গল্পগুলিকে তাঁর নিজের মৌলিক সৃষ্টি 'প্রোফেসার শঙ্কু', 'বাদশাহী আংটি', 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল', 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি', 'রয়াল বেঙ্গল রহস্য' প্রভৃতি থেকে বোধ হয় পৃথক করে দেখা যায় না। এই সব গল্পের অনুবাদে তিনি বাংলা গদ্যের অন্তর্লীন শক্তিকে এমন নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন যে ইংরেজিভাষার বহিরাবরণ খসে পড়েছে, বাংলা গদ্যের একটা জলজলে রূপ মূল লেখকদের তুলনায় সত্যজিৎ রায়কেই উজ্জ্বলতর করে তোলে। 'ব্রেজিলের কালো বাঘ' গল্পের আরম্ভেই সত্যজিৎ রায় নিছক অনুবাদক থাকেন না, বাংলা গদ্যের একজন নিপুণ রূপকার রূপেই দেখা দেন।

"মেজাজটা বনেদী, প্রত্যাশা অসীম, অভিজাত বংশের রক্ত বইছে ধমনীতে, অথচ পকেটে পয়সা নেই, রোজগারের কোন রাস্তা নেই—একজন যুবকের পক্ষে এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে?" এই পর্যন্ত পড়েই একজন পাঠক, কনান ডয়েল-এর গল্পটি যাঁর পড়াও আছে, কনান ডয়েলকে ভুলে যাবেন, সত্যজিৎ রায়ের অনুবাদ-কুশলতায়। গল্পটি যার পড়া নেই তেমন একজন পাঠক তো ভাবতেই পারেন, গল্পটি সত্যজিৎ রায়েরই লেখা। কনান ডয়েলের 'ইহুদীর কবচ' গল্পের প্রোফেসর অ্যাণ্ড্রিয়াস এবং সত্যজিৎ রায়ের নিজের প্রোফেসর শঙ্কুর মধ্যে পার্থক্য শুধু নামে ও ধামে—ভাবে ও স্বভাবে তাঁরা তো একটিই চরিত্র। এটা সম্ভব হয়েছে শুধু দুটি চরিত্রের গুণগত সাদৃশ্যে নয়, তাঁদের রূপগত সাদৃশ্যেও। এই রূপগত সাদৃশ্য নির্মাণের প্রধান মাধ্যম ভাষা। সত্যজিৎ রায় এই ভাষাটিকেই এমন অনায়াসে আয়ত্ত করেছেন যে প্রোফেসর অ্যাণ্ড্রিয়াসকে আর অবাঙালি বলে মনেই হয় না।

আর্থার সি. ক্লার্ক এবং রে ব্র্যাডবেরি এদেশের সাধারণ পাঠক সমাজে সুপরিচিত নন। সত্যজিৎ রায় এঁদের দুটি গল্পকেও বাংলা-রূপান্তরে আমাদের

উপহার দিয়েছেন। আর্থার সি. ক্লার্ক-এর গল্প 'ঈশ্বরের ন' লক্ষকোটি নাম' সত্যজিৎ রায়ের ভাষায় মূলের চেয়েও অনেক বেশি প্রাঞ্জল ও সাবলীল। এখানেও তাঁর ঋজু ও ধারালো গদ্য অনুবাদের মান শুধু রক্ষা করে নি, মান বাড়িয়ে দিয়েছে।

"হিমালয়ের হঠাৎ-রাত্রি এখনই তাদের গ্রাস করবে। তবে সৌভাগ্যক্রমে রাস্তা ভালো, আর দু'জনের কাছেই রয়েছে টর্চ। একমাত্র যদি না শীত হঠাৎ বেড়ে গিয়ে অস্বস্তির কোনো কারণ ঘটায়, এ ছাড়া কোনো চিন্তা নেই। মাথার উপরে মেঘমুক্ত আকাশে অগণিত অতি পরিচিত নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে।" এখানে 'হঠাৎ-রাত্রি' এবং 'অতি পরিচিত নক্ষত্র'—মাত্র এই দু'টি প্রকাশশৈলীই আমাদের চমকিত করতে পারে। কিছুটা মনোযোগী হলেই এমন অনেক দৃষ্টান্ত সত্যজিৎ রায়ের এই অনুবাদ-গল্পটিতে আমরা পেয়ে যাবো। এমন অজস্র ভাষা-নৈপুণ্যের দৃষ্টান্তেই তাঁর মৌলিকতা প্রমাণিত।

রে ব্র্যাডবেরির 'মঙ্গলই স্বর্গ' গল্পের আলাপের ভাষাই শুধু সত্যজিৎ রায় বাংলায় রূপান্তরিত করেন নি, কথা বলার ভঙ্গিটিকেও তিনি বাংলা-ভাবাপন্ন করে তুলতে পেরেছেন। অনুবাদ-কর্মে এই ভঙ্গিটিই একান্ত কাম্য। এটি না থাকলে অনুবাদ যথার্থ সৃষ্টি হয়ে ওঠে না। একটি উদাহরণ—

'কোথায় যাচ্ছ দাদা?'
'কী বললে?'
'এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছ?'
'জল খেতে যাচ্ছিলাম।'
'কিন্তু তোমার তো তেষ্টা পায় নি।'
'হ্যাঁ, পেয়েছে।'
'আমি জানি পায় নি।'

কথা বলার ভঙ্গিটিকে সত্যজিৎ রায় ইংরেজির মতো করে প্রকাশ করেন নি, আমাদের চেনা জানা বাংলাভঙ্গিতেই রূপান্তরিত করেছেন।

৪

'তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম' সংকলনের প্রায় সব রচনাই প্রথমে 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সত্যজিৎ রায় নিজেই বলেছেন—"ননসেন্স রচনার আক্ষরিক অনুবাদ করতে গেলে অনেক সময়ই মূলের হাস্যরস বজায় থাকে না। তাই কয়েকটি অনুবাদের ক্ষেত্রে আমাকে অল্পাধিক স্বাধীনতা নিতে হয়েছে। লিয়রের লিমেরিকগুলিকে সরাসরি অনুবাদ না করে লিয়রেরই আঁকা ছবিগুলি অনুসরণ করে নতুন লিমেরিক রচনা করা হয়েছে।"

সত্যার্থেই এগুলি নতুন লিমেরিক। কারণ, সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' যেমন অনুবাদ করা দুঃসাধ্য, লিয়রের লিমেরিক আর ক্যারলের ননসেন্সও তাই। সত্যজিৎ রায়ও আক্ষরিক অনুবাদ করতে না গিয়ে লিয়র, ক্যারল অথবা টেনিয়েলের ছড়া ও ছবির আজগুবি দুনিয়াকেই তাঁর নিজের শব্দে ও ছন্দে তুলে এনেছেন শিশু কিশোর যুবক বৃদ্ধ বাঙালি পাঠকদের কাছে। এখানে আর একটি কথা না বললেই হয় না, সত্যজিৎ রায়ের ছবি ও স্কেচগুলিও এক অর্থে ভাবানুবাদ। কনান ডয়েল, আর্থার সি ক্লার্ক এবং রে ব্র্যাডবেরির গল্পগুলির সঙ্গে তাঁর নিজের আঁক ছবিগুলি কি শুধু সাদাকালো রঙ নয়, রূপান্তর প্রক্রিয়ার এরা অপরিহার্য উপকরণ অথবা প্রকরণ। সত্যজিৎ রায় সঙ্গত কারণেই লিয়রের লিমেরিকগুলিতে লিয়রেরই আঁকা ছবিগুলিকে অনুবাদের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। তাঁর বিস্ময়কর নৈপুণ্য এখানে যে তিনি এই ছবিগুলিকেই নিখুঁতভাবে অনুসরণ করেছেন তাঁর শব্দ প্রয়োগে, ছন্দ নির্মাণে এবং অন্যান্য প্রকরণ বিনিয়োগে।

লিয়রের লিমেরিকের অথবা ল্যুইস ক্যারলের ছড়ার যে কোনো অংশ পড়ে শব্দ-প্রয়োগের আশ্চর্য ব্যঞ্জনায় আমরা নিশ্চয় চমকিত হই। লিয়রের লিমেরিকের একটি অংশ :

বাইশ বছর পরে
যখন এসে ফিরল তারা ঘরে,
সবাই তাদের দেখতে এসে কয়
'এই টুকুনি মানুষগুলো এত্ত বড়ো কেমন করে হয়?'

ল্যুইস ক্যারলের ছড়ার একটি অংশ :

নাসিকের সাহেবের
বাহারের নাসিকা
বাঁশি হয়ে বাজে সেটা
লোকে বলে বাঁশিকা।

প্রথম অংশের 'এই টুকুনি' ও 'এত্ত' এবং দ্বিতীয় অংশের 'বাঁশিকা' এই তিনটি মাত্র শব্দই (এমন আরো অজস্র শব্দের কৌতুক আছে সত্যজিৎ রায়ের বাংলা রূপান্তরে) স্রষ্টা সত্যজিৎ রায়ের মৌলিক মেজাজটিকে বুঝতে সাহায্য করে। সন্দেহ নেই, 'বাঁশিকা' শব্দটি সত্যজিৎ রায়ের নিজেরই সৃষ্টি। আবার বলি, সত্যজিৎ রায় লিয়র অথবা ক্যারলের লিমেরিক ও ছড়ার অনুবাদ করেন নি। তিনি নিজেই বারবার 'অবলম্বনে' শব্দটি ব্যবহার করে স্পষ্ট ভাষায় এগুলির আক্ষরিক অনুবাদের প্রয়াস যে ব্যর্থ হতে বাধ্য, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমরা যখন পড়ি,

দাদা, পষ্ট চোখে দেখছি হাড়গিলেটা
ফড়ফড়িয়ে আলোর পাশে ধায়,

আবার চেয়ে দেখছি আরে এ যে
চাপ পড়েছে ডাকের টিকিটটায় !
(দাদা, যাও-না তুমি নিচে,
ছাদের 'পরে বাদলা ছাটে
ভিজছ কেন মিছে ?)

তখন আমরাও স্পষ্ট চোখে দেখি, এতো সত্যজিৎ রায়ের নিজের রচনা, নিজের অসামান্য ছড়া বানাবার দক্ষতা।

দৃষ্টান্তের সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ নেই। 'তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম' সংকলনের প্রত্যেকটি লিমেরিক, ছড়া ও গল্প দূরের জগৎ থেকে এলেও এরা যে বাংলা সাহিত্য ও বাঙালির স্ব-সম্পদ হয়ে উঠেছে সে কৃতিত্ব সত্যজিৎ রায়ের।

৫

'মোল্লা নাসীরুদ্দীনের গল্প' সত্যার্থে অনুবাদ নয়, এগুলি সত্যজিৎ রায়ের চয়ন। নাসীরুদ্দীনের জন্ম, অনুমান করা হয় তুরস্ক দেশে। তাঁর গল্পগুলি ঠিক কোন সময়ে তিনি লিখেছিলেন, তা আমাদের সঠিকভাবে জানাও নেই। প্রায় হাজার বছর ধরে পৃথিবীর নানা দেশের লোকের মুখে মুখে তাঁর অসংখ্য গল্প ছড়িয়ে পড়েছে। এগুলির মধ্যে কোনো একটা সময়ের, কোনো একটা সমাজের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার ছবি যেমন আছে, তেমনি আছে সরস ব্যঙ্গকৌতুক ও পরিহাসের বিচিত্র রসধারা। সত্যজিৎ রায় নিজেও এগুলিকে তাঁর অনুবাদ-কর্ম বলে দাবী করেন নি। কিন্তু মুখে মুখে পৃথিবীময় ছড়ানো গল্পগুলিকে তিনি যে ভাবে বাংলায় রূপ দিয়েছেন, তাকে যদি আমরা 'translation' না বলে transmigration বলি তাহলে পাবলো নেরুদার মতে এগুলিও এক শ্রেণীর অনুবাদ-সাহিত্যই। এ নিয়ে বিস্তর তর্ক-বিতর্ক চলতেই পারে। আমরা তার মধ্যে আর যেতে চাইছি না।

আমরা শুধু দেখতে পারি এই 'transmigration'-এর মাধ্যম রূপে সত্যজিৎ রায়ের ভাষারীতি ও রচনাশৈলীর অসাধারণ দক্ষতা। যাঁরা 'মোল্লা নাসীরুদ্দীনের গল্প' পড়েন নি, তাঁদের সামনে গোটা বইটাই তুলে ধরতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু তা যখন সম্ভব নয়, মাত্র, একটি অংশই তাঁদের সামনে রাখছি :

'একদিন খুব খিদের মুখে বেগুন ভাজা খেয়ে ভারী খুশি হয়ে রাজা নাসীরুদ্দীনকে বললেন, 'বেগুনের মতো এমন সুস্বাদু খাদ্য আর আছে কি ?' '

'বেগুনের জবাব নেই', বললে নাসীরুদ্দীন। রাজা হুকুম দিলেন, 'এবার থেকে রোজ বেগুন খাব।' এখানে একই সঙ্গে আছে ব্যঙ্গকৌতুক ও পরিহাস। সবচেয়ে বড়ো কথা—ভাষার আশ্চর্য তীক্ষ্ণতা। আর অনায়াসে আমরা সত্যজিৎ রায়ের

প্রধান মেজাজটিকেও এখানে ধরতে পারি। তাঁর এই মেজাজের পরিচয় পেয়েছি 'গুপী গাইন, বাঘা বাইন' অথবা 'হীরক রাজার দেশে'র মতো চলচ্চিত্র-নির্মাণেও। আমাদের অত্যন্ত চেনা চলচ্চিত্র-নির্মাতা সত্যজিৎ রায়কে এখানেও আমরা চিনে ফেলি।

সত্যজিৎ রায় নামটি উচ্চারণ করলেই যে ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব আমাদের সামনে এসে দাঁড়ান তাঁকে আমরা অনেক বেশি করে চিনি তাঁর সমাজ ও জীবনের চলমান 'ছবি' সৃষ্টিতে, তাঁর কাগজের পাতায় এবং অসংখ্য প্রচ্ছদে আঁকা স্থির ছবি ও স্কেচে, তাঁর নিজের বিপুল পরিমাণ গল্প-উপন্যাস সৃষ্টিতে। কিন্তু সেই ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বকে তাঁর অনুবাদ-কর্মেও আমরা হারিয়ে ফেলি না, না খুঁজেই স্পষ্ট দেখতে পাই।

সত্যজিৎ রায় : তথ্যপঞ্জি

[বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্রকার ও লেখক সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। তাঁর জীবিতকালেই তাকে নিয়ে সবচেয়ে বেশী আলোচনা প্রকাশিত। মৃত্যুর পরও প্রকাশ পেয়েছে তাঁকে নিয়ে নানা বিশেষ সংখ্যা—যার অনেকটাই দায়সারা। এ নিয়ে ব্যাপক একটি পঞ্জির কাজ চলছে 'সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্র পত্রিকা পঞ্জির' গ্রন্থের জন্য। তা থেকে নির্বাচন করে এই পঞ্জি করা হলো। এখানে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে এই তালিকা করা হলো। ফিল্ম সোসাইটির পত্র-পত্রিকা, লিটল ম্যাগাজিন, বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকা থেকে এই পঞ্জি করা হয়েছে। বলাই বাহুল্য অসম্পূর্ণ। ইংরাজি রচনাও প্রচুর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। পত্রিকার পাশে স্থানের নাম সংক্ষেপে দেওয়া আছে। যথা ন—নদীয়া, ঢা/বাং—ঢাকা বাংলাদেশ, আ—আমেরিকা, পু-আ, গ্র-আ অর্থে পুস্তক আলোচনা বোঝাবে। সময়ের স্বল্পতা ও অত্যন্ত দ্রুততায় তালিকা বর্ণানুক্রমিক করা যায় নি। অনেক লেখাই অগ্রন্থিত রইল। উৎসাহী পাঠককে লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র (১৮/এম ট্যামার লেন, কলকাতা-৯) এই সব প্রবন্ধের পাঠক হতে অনুরোধ জানাই ।]

অন্নদাশঙ্কর রায় 'সত্যজিৎ প্রয়াণ' নন্দন ২৮/৭ জুলাই '৯২

অনিল চট্টোপাধ্যায় 'আমাকে রাশপ্রিন্ট দেখাতেন' আলোকপাত ৭ বর্ষ ৩ সংখ্যা মে '৯২

— 'পরিচালকের অভিনেতা' প্রতিক্ষণ ৬/২০ এপ্রিল '৮৯

অনুনয় চট্টোপাধ্যায় 'জনঅরণ্য এসটাবলিশমেণ্টের পক্ষে নয় বিপক্ষে' চিত্রভাষ ১১ বর্ষ ২ সংখ্যা '৭৬

অনুপ ঘোষাল 'ভারতরত্ন সত্যজিৎ' সাপ্তাহিক বর্তমান ৪ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা মার্চ '৯২

অশোক মিত্র 'অল্প কথায় গল্পে' কোরক সাহিত্য পত্রিকা মে '৯২

অনীশ দেব 'প্রোফেসর শঙ্কু' আনন্দমেলা ১৮ বর্ষ ৩ সংখ্যা ১৩ মে '৯২

অশোক দাশগুপ্ত 'ফেলুদা' আজকাল ২৪ এপ্রিল '৯২

অশোক মুখোপাধ্যায় 'আধুনিক বাংলা নাটকেও সত্যজিৎ রায়' আনন্দলোক ১৮ বর্ষ ৯ সংখ্যা মে '৯২

অপর্ণা সেন 'সত্যজিতের অস্কার' আনন্দলোক ১৮ বর্ষ ১ সংখ্যা জানুয়ারি '৯২

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় 'সত্যজিৎ রায়ের হাড়ের মধ্যে রয়েছে সিনেমা' প্রবাহ (মু) সেপ্টেম্বর '৮০

— " চলচ্চিত্র পত্র (বাং) এপ্রিল '৮০

—'পুনশ্চ সত্যজিৎ রায় এবং প্রতিদ্বন্দ্বী' লেখা ও রেখা ১৬ বর্ষ ১ সংখ্যা সেপ্টেম্বর '৭১

—'আন্তন চেখভ ও সত্যজিৎ রায়' অকপট (ব) ১ বর্ষ ১ সংখ্যা অক্টোবর '৮৫

—'সত্যজিৎ চলচ্চিত্রে ডিটেল' নন্দন ২৮ বর্ষ ৭ সংখ্যা জুলাই '৯২

—'দুর্গার মৃত্যু সিকোয়েন্স : একটি বিশ্লেষণ' বর্ণমালা ৩ বর্ষ ২ সংখ্যা মে '৭৯

—'অপু ত্রয়ীর এপিক বৈশিষ্ট্য' লুক গ্রু (বাং) ১ বর্ষ ১ সংখ্যা জানুয়ারি '৮২

—'সত্যজিৎ চলচ্চিত্র : রবীন্দ্র সাহিত্যভিত্তিক' চিত্রবীক্ষণ ১২ বর্ষ ৮ সংখ্যা মে '৭৯ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক প্রকাশ

—'সীমাবদ্ধ (১৯৭০-৭১)' পটভূমি (ব) অক্টোবর '৭৫

—'পিকু : একটি বিশ্লেষণ' প্রতিভাস (ব) অক্টোবর '৮২

—'পরশপাথর' খড়দা সিনেক্লাব স্মারক ১ বর্ষপূর্তি '৭৯

—'সত্যজিৎ রায়ের তথ্যচিত্র রবীন্দ্রনাথ' পটভূমি '৮৬

—'জলসাঘর-এর মহিম চরিত্র প্রসঙ্গে' চিত্রবীক্ষণ ১২ বর্ষ ১২ সংখ্যা সেপ্টেম্বর '৭৯

—'অরণ্যের দিনরাত্রি' চিত্রভাষ ১২-১৩ বর্ষ অক্টো '৭৭—মার্চ '৭৮

—'পথের পাঁচালী, পঁচিশ বছর পরে' „ ১৫ বর্ষ ২-৪ সংখ্যা এপ্রিল-ডিসেম্বর '৮০

—'হীরক রাজার দেশে' বর্ণমালা ৫ বর্ষ ১ সংখ্যা এপ্রিল-জুন '৮১

—'চলচ্চিত্রের সাংগীতিক গঠন এবং সত্যজিৎ রা।' চিত্রবীক্ষণ ১২ বর্ষ ৪ সংখ্যা জানুয়ারি '৭৯

—'সত্যজিৎ ঋত্বিক এবং সত্যজিৎ' নন্দন ৩০ বর্ষ ৪-৫ সংখ্যা সেপ্টেম্বর '৯২

—'চিত্রনাট্যে স্বাধীনতা, সত্যজিৎ রায়' দেশ ৫৯/২৭ মে '৯১

অরুণকুমার ঘোষ 'হীরক রাজার দেশে' চিত্রকথা ২ বর্ষ ২ সংখ্যা জানুয়ারি মার্চ '৮১

অমিতাভ দাশগুপ্ত 'অন্য সত্যজিৎ অনেক সত্যজিৎ' নন্দন ২৮/৭ জুলাই '৯২

অরুণকুমার রায় 'সত্যজিৎ চলচ্চিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য' বর্ণমালা ৩ বর্ষ ২ সংখ্যা মে '৭৯

—'হীরক রাজার দেশে : শিল্পীর দায়বদ্ধতা' „ ৫ বর্ষ ১ সংখ্যা এপ্রিল জুন '৮১

—'রাজনৈতিক চলচ্চিত্র ও আমরা' সাহিত্যচিন্তা ৮ বর্ষ ২ সংখ্যা মে '৭৯

অশোক সেন 'সত্যজিৎ রায়ের পিকু ও সদগতি' আন্তরিক (আ) ২ বর্ষ ২ সংখ্যা এপ্রিল '৮২

আশাপূর্ণা দেবী 'দেশ বিদেশের মাণিক' চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ ১৫ বর্ষ জুন '৯২

আশিস সান্যাল 'সত্যজিৎ রায় সঙ্গ ও প্রসঙ্গ' " " "

ইরাবান বসুরায় 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী : একটি ভ্রান্তিবিলাস' মুভি মনতাজ ২২ ফেব্রুয়ারি '৭৯

—'সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা' কোরক সাহিত্য পত্রিকা মে-আগষ্ট '৯২
—'চলচ্চিত্র বিষয়ক রচনায় তিন পরিচালক' মুভি মনতাজ ২৫ জানুয়ারি '৮২
—'পথের পাঁচালী পঁচিশ বছর পরে' চিত্রভাষ ১৫/২-৪ এপ্রিল-ডিসেম্বর '৮০
উৎপল দত্ত 'সত্যজিৎ রায় কি ভারতীয় রেনেসাঁসের ফসল' নন্দন ২৮/৭ জুলাই '৯২
উৎপলেন্দু চক্রবর্তী 'অস্কার প্রতিক্রিয়া' বিশেষ প্রতিবেদন ১৭ জানুয়ারি '৯১
—'সত্যজিৎ রায়ের পিকু' চলচ্চিন্তা '৮৩
—'সত্যজিৎ রায় ও তাঁর আবহসঙ্গীত' চিত্রচিন্তা ১ বর্ষ ১ সংখ্যা এপ্রিল-জুন '৮৮
—'সত্যজিতের সঙ্গীত মানস' আনন্দলোক ১৮ বর্ষ ৯ সংখ্যা মে '৯২
উজ্জ্বল চক্রবর্তী 'সত্যজিতের চিত্রনাট্যের প্রথম ১৫ মিনিট এবং গণশত্রু' নহবত (উ ২৪) ২৬ বর্ষ '৮৯
—'পিকুর মতো বড়দের ছবি বার্গম্যানও তোলেনি' আলোকপাত ৫/২ মে '৯২
—'নগর জীবনের শব্দ সত্যজিতের ছবিতে' মুভি মনতাজ ৩১ জানুয়ারি '৯০
ঋত্বিক ঘটক 'একমাত্র সত্যজিৎ রায়' সিনে টেকনিক মাচ '৯২
— " নন্দন ২৮/৭ জুলাই '৯২
— " রক্তকরবী ১ বর্ষ ৪ সংখ্যা মে '৯২
— " রৌরব (মু) ২০ আগস্ট '৮০ ফেব্রু '৮১
— " চলচ্চিত্র পত্র এপ্রিল '৮০
—'মূল নইয়ের উদার ভবঘুরে যাত্রীর সুর বাজে না' (পু মু) কোরক মে-আগষ্ট '৯২
—'ভারতবর্ষে ছবি মাধ্যমটিকে বোঝে, তিনি হচ্ছেন সত্যজিৎ রায়' সিনে টেকনিক মার্চ '৭২
—'পথের পাঁচালী' চিত্রভাষ ১৫ বর্ষ ২-৪ সংখ্যা এপ্রিল ডিসেম্বর '৮০
কণা বসুমিশ্র 'ছোটদের সঙ্গে সত্যজিৎ রায়' চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ ১৫ বর্ষ জুন '৯২
কল্পতরু সেনগুপ্ত 'সত্যজিৎ রায় এবং স্বাধীনতা পত্রিকা' নন্দন ২৮/৭ জুলাই '৯২
করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় 'পথের পাঁচালীর পঁচিশ বছর পরে' চিত্রভাষ ১৫ বর্ষ ২-৪ সংখ্যা এপ্রিল ডিসেম্বর '৮০
—'সত্যজিতের আগন্তুক' নন্দন ২৮/৭ জুলাই '৯২
—'পথের পাঁচালী থেকে মুক্তি নেই' এষণা ৩ বর্ষ ২ সংখ্যা জানুয়ারি '৮৭
কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী 'সত্যজিৎ ছোটদের মনকে ধনী করে দিয়েছেন' সাপ্তাহিক বর্তমান ৪/৫০ মে '৯২
কমলেন্দু সরকার 'সত্যজিৎ রায়, অপুর ট্রিলজি এবং ঘরে ও বাইরে' " '৯২
—'সত্যজিৎ রায় : তথ্যপঞ্জি' আনন্দলোক ১৮/৯ মে '৯২
কল্পতরু সেনগুপ্ত 'পথের পাঁচালী পঁচিশ বছর পরে' চিত্রভাষ ১৫ বর্ষ ২-৪ সংখ্যা এপ্রিল-ডিসেম্বর '৮০
কল্যাণাশিস দাশগুপ্ত 'সত্যজিৎ রায়' নহবত ২৬ বর্ষ সেপ্টেম্বর '৮৯

কিরণময় রাহা 'পথের পাঁচালী, সেইসময়' কল্লনির্ঝর ১ বর্ষ ২ সংখ্যা জুলাই '৮০
—'শতরঞ্জ কী খিলাড়ী সমালোচনা প্রসঙ্গে' মুভি মনতাজ ১৭ এপ্রিল '৭৬
—'সত্যজিৎ রায়ের ছবি জনঅরণ্য' মুভি মনতাজ ১৭ এপ্রিল '৭৬
—'আওয়ার ফিল্মস দেযার ফিল্মস, বিষয় চলচ্চিত্র' এক্ষণ ১২ বর্ষ (পু, আ) ৩-৪ সংখ্যা অক্টোবর '৮৬
কিন্নর রায় 'বন্দনা অথবা স্তুতির বাইরে' কোরক সাহিত্য পত্রিকা মে আগষ্ট '৯২
ক্ষেত্র গুপ্ত 'বাংলা সাহিত্যে সত্যজিৎ এবং ফেলুদা' নন্দন ২৮/৭ জুলাই '৯২
গৌতম ঘোষ 'সত্যজিৎ স্মরণে' নন্দন ৩০ বর্ষ ৪-৫ সংখ্যা সেপ্টেম্বর '৯২
—'জনপ্রিয় ফর্মুলা ব্যবহার করেন নি' আনন্দলোক ১৮ বর্ষ ৯ সংখ্যা মে '৯২
চিদানন্দ দাশগুপ্ত 'সত্যজিৎ ও রবীন্দ্রনাথ' ধ্রুপদী (বাং) ৫ আগস্ট '৮৫
—'ভারতীয় চলচ্চিত্র এবং সত্যজিৎ রায়ের শিল্পকর্ম' আনন্দলোক ১৮ বর্ষ ৯ মে '৯২
—'পথের পাঁচালীর পঁচিশ বছর আগে' চিত্রভাষ ১৫ বর্ষ ২-৪ সংখ্যা এপ্রিল ডিসেম্বর '৮০
—'পথের পাঁচালী ও তারপর' চতুরঙ্গ ৫৩ বর্ষ ১ সংখ্যা মে '৯২
জ্যোতির্ময় দত্ত 'সত্যজিৎ রায-এর ঘরে বাইরে' কলকাতা দুহাজার ২বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা জানুয়ারি '৮৫
—'সত্যজিৎ রায, বাঙালী সমাজ ও রবীন্দ্রনাথ' কলকাতা '৭০
—'অঙ্গীকারের সময়' আজকাল ২৪ এপ্রিল '৯২
তপন সিংহ 'সত্যজিতের অস্কার' আনন্দলোক ১৮ বর্ষ ১ সংখ্যা জানুয়ারি '৯২
—'ভারতরত্ন সত্যজিৎ' সাপ্তাহিক বর্তমান ৪ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ২৮ মার্চ '৯২
— " ঘরে ও বাইরে '৯২
দিনকর কৌশিক 'শান্তিনিকেতন ও কলাভবনের দিনগুলি' আনন্দলোক ১৮ বর্ষ ৯ সংখ্যা মে '৯২
দিলীপ মুখোপাধ্যায় 'সিদ্ধার্থ ও শহর কলকাতা' আন্তর্জাতিক আঙ্গিক (ক) ১ বর্ষ ১ সংখ্যা '৭১
—'আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের মৃত্যু দৃশ্য ও সত্যজিৎ রায়' এবং নৈকট্য (ক) ১ বর্ষ ৩ সংখ্যা '৭০
—'সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রে ডিটেইল প্রসঙ্গে' সিনে টেকনিক ২ মার্চ '৭২
—'অপু ট্রিলজি একটি অনন্য মূল্যায়ন' আন্তর্জাতিক আঙ্গিক ফেব্রুয়ারি-মে '৭৩
—'অশনি সংকেত' আন্তর্জাতিক আঙ্গিক মার্চ '৭৩
—'মিডলম্যান' মুভি মনতাজ এপ্রিল '৭৬
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সত্যজিৎ ফিরে তাকান' চলচ্চিত্রপত্র এপ্রিল '৮০
দীপেন্দু চক্রবর্তী 'ঘরে বাইরে একটি লক্ষ্যভ্রষ্ট ছবি' চিত্রভাষ ২০ বর্ষ ১-২ সংখ্যা জানুয়ারি জুন '৮৫

—'দুটি ছবি, দুটি মতবাদ, প্রতিদ্বন্দ্বী ও ইণ্টারভিউ' পত্রপুট ১ বর্ষ ১ সংখ্যা ডিসেম্বর '৭০
—'সঙ্গীতেও যিনি পথ প্রদর্শক' কোরক সাহিত্য পত্রিকা মে আগষ্ট '৯২
—'সত্যজিতের সীমাবদ্ধ এবং সত্যজিতের সীমাহীন ফাঁকি' মুভি মনতাজ ১০ ফেব্রুয়ারি '৭২
—'জলসাঘর বেশ থিয়েট্রিকাল, সত্যজিৎ ধারার ব্যতিক্রম' এক্ষণ ১ বর্ষ ২ সংখ্যা ডিসেম্বর '৭৯
—'হীরক রাজার দেশে : সত্যজিতের রাজনৈতিক রূপক' চিত্রভাষ ১৬ বর্ষ ১-২ সংখ্যা '৮১
দেবাশিস মুখোপাধ্যায় 'সত্যজিৎ রায়ের জীবনপঞ্জি' নহবত ২৬ বর্ষ সেপ্টেম্বর '৮৯
—'নানা রঙে ৭১ বছর' আজকাল ২৪ এপ্রিল '৯২
—'গুপী গাইন বাঘা বাইন প্রাসঙ্গিক তথ্য' এক্ষণ ১৮ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা সেপ্টেম্বর '৮২
—'রায়পুরে সদ্‌গতি দেখানোই হয নি' টেলিভিশন সেপ্টেম্বর '৮৮
—'সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সত্যজিৎ প্রসঙ্গ' এক্ষণ ১৮/১-২ সেপ্টেম্বর '৮৭
—গণশত্রু প্রাসঙ্গিক তথ্য' এক্ষণ ১৯ বর্ষ ১-২ সংখ্যা সেপ্টেম্বর '৯০
—'চলচ্চিত্রে বাক্সবদল' এক্ষণ ১৮ বর্ষ ১-২ সংখ্যা সেপ্টেম্বর '৮৭
—'শাখা প্রশাখা প্রসঙ্গে তথ্য' এক্ষণ ১৯ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা সেপ্টেম্বর '৯১
—'সত্যজিৎ রায় প্রাসঙ্গিক তথ্য' এক্ষণ ” ”
—'জলসাঘর প্রসঙ্গ' এক্ষণ ১৮ বর্ষ ৫-৬ সংখ্যা সেপ্টেম্বর '৮৯
—'ঘরে বাইরে : ছবি তোলার নেপথ্য কাহিনী' এক্ষণ ১৭ বর্ষ ১-২ সংখ্যা জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি '৮৫
—'জীবনপঞ্জী' কোরক সাহিত্য পত্রিকা মে আগস্ট '৯২
দেবীপদ ভট্টাচার্য 'সমকাল ও সত্যজিৎ রায়' অনুষ্টুপ ১৫ বর্ষ ২ সংখ্যা '৮১
ধ্রুব গুপ্ত 'অভিযান ও সমাজবাদী বাস্তবতা' পরিচয় '৬২
—'ঐ প্রসঙ্গে চিঠি ও লেখকের উত্তর' ” '৬২
—'সমালোচক সত্যজিৎ' প্রতিক্ষণ মে '৯২
—'একটি ছোট বই, সত্যজিৎ ও ঘরে বাইরে' সমতট (ক) ৬২ অক্টোবর ডিসেম্বর '৮৪
—'সত্যজিৎ : চলচ্চিত্র ও সঙ্গীত' দেশ ৫৯ বর্ষ ২২ সংখ্যা ২৮ মার্চ '৯২
—'পিকু ও সদ্‌গতি' সমতট ৫১ জানুয়ারি মার্চ '৮২
—'ঘরে বাইরে, দু'চার কথা' চিত্রভাষ ২০ বর্ষ ১-২ সংখ্যা জানুয়ারি-জুন '৮৫
—'ধর্মীয় আচার ও তিনটি ছবি' দ্রষ্টব্য ১৬ বর্ষ ১ সংখ্যা জুলাই '৮৫
—'সত্যজিৎ রায়ের চারুলতা' পরিচয় ৩৩ বর্ষ ১১ সংখ্যা জুন '৬৪
—'কাঞ্চনজঙ্ঘা নিয়ে দু-চার কথা' পশ্চিমবঙ্গ ২৬ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা ১৭ ও ২৪ জুলাই '৯২

—'সত্যজিৎ চলচ্চিত্রে নারী' নন্দন ২৮/৭ জুলাই '৯২
নলিনী দাশ 'সত্যজিৎ রায়ের ছেলেবেলা' নহবত ২৬ বর্ষ '৮৯
—'আমার মানিক' রৈবতক ৫/৩ মে '৯১
—'সত্যজিৎ রায় : সম্পাদক ও লেখক' বিশেষ প্রতিবেদন ১৭ জানুয়ারি '৯২
—'ভারতরত্ন সত্যজিৎ' সাপ্তাহিক বর্তমান ৪ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ২৮ মার্চ '৯২
—'জানতাম ও অসাধারণ হবে' ঘরে ও বাইরে '৯২
নবনীতা দেবসেন 'পাইরো…' চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ '৭৯
নবীনানন্দ সেন 'সত্যজিৎ ঋত্বিক মৃণাল এবং চরমপন্থীরা' সিনে গিল্ড বুলেটিন (হা) ১ বর্ষ ২ সংখ্যা অক্টোবর '৮৩
নারায়ণ চৌধুরী 'ঘরে বাইরে প্রসঙ্গে' পটভূমি অক্টোবর '৮৫
নিত্যপ্রিয় ঘোষ 'ঘরে বাইরের বিধবা বিমলা' চিত্রভাষ ২০ বর্ষ ১-২ সংখ্যা জানুয়ারি জুন '৮৫
—'জনঅরণ্য বা সত্যজিৎ রায়ের অর্ডার সাপ্লাই' মুভি মনতাজ এপ্রিল '৭৬
—'সদগতি' মুভি মনতাজ ২৬ ডিসেম্বর '৮২
—'চলচ্চিত্র উপন্যাস এবং চলচ্চিত্র' চলচ্চিন্তা জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি '৮৫
—'সিপাহী অ্যাডভান্স' মুভি মনতাজ ২২ ফেব্রুয়ারি '৭৯
নির্মল ধর 'টেকনিকের আমি কি জানি' চিত্রভাষ ২০ বর্ষ ১-২ সংখ্যা জানুয়ারি জুন '৮৫
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 'সত্যজিতের অলটার ইগো' চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ '৭৯
—'সত্যজিৎ সব বয়সের লেখক' দেশ ৫৯ বর্ষ ২২সংখ্যা ২৮ মার্চ '৯২
পল্লব সেনগুপ্ত 'সত্যজিতের রবীন্দ্র-অন্বেষা' পশ্চিমবঙ্গ ২৬ বর্ষ ৩ ও ৪ সংখ্যা ১৭ ও ২৪ জুলাই '৯২
পার্থ বসু 'গড়পার থেকে শান্তিনিকেতন' আনন্দলোক ১৮ বর্ষ ৯ সংখ্যা মে '৯২
পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় 'সত্যজিৎ রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী' সাহিত্য পত্র ১৬ বর্ষ ৩ সংখ্যা মে '৭১
—'মহৎ উত্তরণে' বর্ণমালা ৫ বর্ষ ১ সংখ্যা এপ্রিল-জুন '৮১
—'ঘরে বাইরে : সমকালীন চাপ' চিত্রভাষ ২০ বর্ষ ১-২ সংখ্যা জানুয়ারি-জুন '৮৫
—'চলচ্চিত্র সমাজ ও সত্যজিৎ রায়' (পু অ) বর্ণমালা ৫ বর্ষ ২ সংখ্যা জুন '৮১
—'সত্যজিৎ রায়ের বিশ্ববীক্ষা ও জনঅরণ্য' দৃশ্য ২০ জানুয়ারি '৭৭
—'সত্যজিৎ রায়ের বিশ্ববীক্ষা' বর্ণমালা ৩ বর্ষ ২ সংখ্যা মে '৭৯
পিনাকী ভাদুড়ী 'সত্যজিৎ রায়ের গল্প' বিভাব ৪ বর্ষ ১ সংখ্যা ফেব্রুয়ারি '৮৪
প্রলয় শূর 'সত্যজিতের ছবি ও তার সংলাপ' সিনে টেকনিক ২ মার্চ '৭২
—'চলচ্চিত্রে কালের কণ্ঠস্বর' মুভি মনতাজ ১৪ জুলাই '৭৪

—'জয়বাবা ফেলুনাথ' চলচ্চিন্তা ৭ বর্ষ ১১-১২ সংখ্যা নভেম্বর-ডিসেম্বর '৭৮
—'রবীন উডের চোখে অপু ট্রিলজি' মুভি মনতাজ ২৫ জানুয়ারি '৮২
—'সত্যজিৎ রায়ের জনঅরণ্য' " এপ্রিল '৭৬
প্রফুল্ল রায় 'সত্যজিৎ রায় এবং ফেলুদা' চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ '৭৯
পূর্ণেন্দু পত্রী 'ফেলুদার জয় হোক' চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ '৭৯
—'ঘরে বাইরে : রবীন্দ্রনাথের, সত্যজিতের' কোরক সাহিত্য পত্রিকা মে-আগস্ট '৯২
—'সত্যজিৎ রায়ের রেখাচিত্র' নন্দন ০৮/৭ জুলাই '৯২
—'সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে' প্রতিক্ষণ মে '৯২
বাদল বসু 'বেস্ট সেলার' দেশ ৫০ বর্ষ ২১ সংখ্যা ২৮ মার্চ '৯২
বিভাস চক্রবর্তী 'টেলিফিল্মের ক্ষেত্রেও এক নতুন ঘরানার প্রবর্তন' আনন্দলোক ১৮ বর্ষ ৯ সংখ্যা মে '৯২
—'শিবরামের বদলে সদগতি' টেলিভিশন ৫ বর্ষ ২ সংখ্যা মে '৯২
বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত 'সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে একটি লেখার খসড়া' নন্দন সেপ্টেম্বর অক্টোবর '৯২
মানস মজুমদার 'প্রসঙ্গ পিকুর ডায়েরী ও অন্যান্য' কোরক সাহিত্য পত্রিকা মে আগস্ট '৯২
মৃণাল সেন 'অস্কার ও সত্যজিৎ রায়' প্রতিক্ষণ জানুয়ারি '৯২
—'পথের পাঁচালী' চিত্রভাষ ১৫ বর্ষ ২-৪ সংখ্যা এপ্রিল-ডিসেম্বর '৮০
—'সত্যজিৎ ও অপরাজিত' আনন্দলোক ১৮ বর্ষ ৯ সংখ্যা মে '৯২
রঘুনাথ গোস্বামী 'গ্রাফিক শিল্পী সত্যজিৎ রায়' দেশ ৫৯ বর্ষ ২২ সংখ্যা মার্চ '৯২
রাধাপ্রসাদ গুপ্ত 'সত্যজিৎ রায় আর কিছু পুরনো দিনের কথা' দেশ ৫৯/২৭ মে '৯২
—'সেই কফি হাউসের দিনগুলি ও সত্যজিৎ রায়' নহবত ২৬ বর্ষ '৮৯
রজত রায় 'সরকারী অধিগ্রহণ সম্পর্কিত কয়েকটি দলিল' মুভি মনতাজ ২২ ফেব্রু '৭৯
—'রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার ও সত্যজিৎ রায়' মাসিক অর্শনি ৩ বর্ষ ১ সংখ্যা মে '৭৮
—ধর্মীয় সংস্কার ও সত্যজিৎমানস' বর্ণমালা ৩ বর্ষ ২ সংখ্যা মে '৭৯
রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 'শতরঞ্চ এবং কোনো ঐতিহাসিকের আক্রোশ' মুভি মনতাজ ২২ ফেব্রু '৭৯
—'সত্যজিতের ছবির নারীরা' আনন্দলোক ১৮ বর্ষ ৯ সংখ্যা মে '৯২
রাম হালদার 'সত্যজিৎ রায় ও প্রসঙ্গ ফিল্ম সোসাইটি' যুবমানস মে '৯২
লীলা মজুমদার 'এত বড় হাঁ তারস্বরে চেঁচাচ্ছে' বিশেষ প্রতিবেদন ১৭ জানুয়ারি '৯২
শক্তি চট্টোপাধ্যায় 'সত্যজিৎ রায় প্রসঙ্গে' সিনে টেকনিক ২ মার্চ '৭২

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় 'চলচ্চিত্র সমাজ ও সত্যজিৎ রায়' (পু. আ.) চিত্রভাষ ১৬ বর্ষ ১-২ সংখ্যা '৮১
—'গ্রেট মাস্টার্স সত্যজিৎ রায়' টেলিভিশন ৫ বর্ষ ২ সংখ্যা মে '৯২
—'পিকু' চলচ্চিন্তা জুলাই ডিসেম্বর '৮৩
—'স্বলিখিত কাহিনী ও চিত্রনাট্যে সত্যজিৎ অসাধারণ' প্রেক্ষণ ১/২ ডিসেম্বর '৭৯
—'কাঞ্চনজঙ্ঘা আবার দেখার পর' কথাগল্পছবি ৪ ডিসেম্বর '৮০
—'সত্তর দশকের সত্যজিৎ' পরশুরাম ১ বর্ষ ১ সংখ্যা জানুয়ারি '৮১
শ্যাম বেনেগাল 'আমার দৃষ্টিতে সত্যজিৎ রায়' দেশ ৫৯ বর্ষ ২২ সংখ্যা মার্চ '৯২
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় 'বড আনাসহীন তবু সরলতা' নহবত ২৬ বর্ষ '৮৯
সরোজমোহন মিত্র 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী' চিত্রভাষ অক্টোবর '৭৮ মার্চ '৭৯
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কলমের গল্পে সত্যজিৎ রায়' দেশ ৫৯ বর্ষ ২২ সংখ্যা ২৮ মার্চ '৯২
—'অগ্নিতত্ত্ব' দৃশ্য (উ-২৪) ২৮ এপ্রিল '৮৫
সমরেশ বসু 'নষ্টনীড ও চারুলতা' মুভি মনতাজ ১০ ফেব্রুয়ারি '৭২
সন্দীপ দত্ত 'বিষয় সত্যজিৎ রায় : পত্রিকাপঞ্জি' কোরক সাহিত্য পত্রিকা মে আগস্ট '৯২
সাগরময় ঘোষ 'সত্যজিতের ফেলু মিত্তির' সিনে টেকনিক ২ মার্চ '৭২
সুধীর চক্রবর্তী 'সত্যজিৎ রায় : সংগীত ও সংগীত বীক্ষা' পশ্চিমবঙ্গ ২৬ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা ১৭/২৪ জুলাই '৯২
সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'বড় কাছের মানুষ' সাপ্তাহিক বর্তমান ৪ বর্ষ ৫০ সংখ্যা মে '৯২
সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় 'মানিক অন্তরের মানুষ ছিল' আনন্দলোক ১৮ বর্ষ ৯ সংখ্যা মে '৯২
সিদ্ধার্থ ঘোষ 'সত্যজিৎ রায় ও সায়েন্স ফিকশন' পশ্চিমবঙ্গ ২৬ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা জুলাই '৯২
সুনেত্রা ঘটক 'নানা চোখে সেই শিশুটি' (সংকলন) দেশ ৫৯ বর্ষ ২২ সংখ্যা ২৮ মার্চ '৯২
সুনীল দাস 'সত্যজিৎ রায় : সাহিত্যের ঋণশোধ' সিনে টেকনিক ২ মার্চ '৭২
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'সত্যজিৎ রায় প্রসঙ্গে' " "
—'সত্যজিৎ : শহুরে অপু' সানন্দা ৬ বর্ষ ২১ সংখ্যা মে '৯২
—'প্রিয় ফেলুদা' চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ '৭৯
—'প্রিয় লেখক সত্যজিৎ রায়' নহবত ২৬ বর্ষ '৮৯
সুধী প্রধান 'পথের পাঁচালী' প্রতিভাস ১ মার্চ '৮২
সুকৃতি লহরী 'সত্যজিতের সন্দেশ, সন্দেশের সত্যজিৎ' কোরক সাহিত্য পত্রিকা মে আগস্ট '৯২

সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায় 'সত্যজিতের চলচ্চিত্রে যুক্তিবাদ' পশ্চিমবঙ্গ ২৬ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা জুলাই '৯২

সেবাব্রত গুপ্ত 'পরিচালক সত্যজিৎ রায়' নহবত ২৬ বর্ষ '৮৯

সোমেশ্বর ভৌমিক 'পথের পাঁচালী' চিত্রভাষ ১৫ বর্ষ ২-৪ সংখ্যা এপ্রিল-ডিসেম্বর '৮০

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 'প্রিয় লেখক সত্যজিৎ রায়' নহবত ২৬ বর্ষ '৮৯

সৌমেন্দু রায় ধ্রুব গুপ্ত গৌতম ঘোষ 'ঘরে বাইরে সম্পর্কিত আলোচনাচক্র' চিত্রভাষ ২০ বর্ষ ১-২ সংখ্যা জানুয়ারি জুন '৮৫

২) বিদেশী পরিচালকের চোখে সত্যজিৎ রায় এবং সাক্ষাৎকার

আন্দ্রে ভাইদা সাক্ষাৎকার চিত্রবীক্ষণ ১৭ বর্ষ ১-২ সংখ্যা অক্টো-নভে '৮৩

দেবী এবং ট্রান্সকালচারাল মনস্তত্ত্ব—ডালিয়া ডেভিডসন, ড. বারবারা স্টোলার মিলার, ড. ডেভিড ইশেক্টার, ড. রুথ মোণ্টন, ড বার্ট্রাম শ্যাকনার অনু পবিত্রবল্লব—আন্তর্জাতিক আঙ্গিক জানু-মার্চ '৭৪

গাস্ত রোবেজ 'সত্যজিৎ রায়, চলচ্চিত্রে মানবতাবাদ' অনুবাদ পবিত্রবল্লভ এক ৬ জুলাই '৮৮

—'নিষ্ঠা আর শৃঙ্খলা' দেশ ৫৯ বর্ষ ২২ সংখ্যা ২৮ মার্চ '৯২

ইলিয়া স্থকভ 'হতবাক সমালোচক' ঘরোয়া ২৬ '৭২

ওয়াজদার সঙ্গে সত্যজিৎ " "

জর্জ শাদুল 'নেপথ্যের আমি : সংগ্রাম ও প্রতিষ্ঠা " " "

নিষ্ঠা আর শৃঙ্খলা/গাস্তঁরোবেজ দেশ ৫৯/২২ মার্চ '৯২

'সত্যজিৎকে ভালবেসে' আলোকপাত মে '৯২

এইচ গ্রে 'সিনেমাটিক' " "

রবিন উড 'পথের পাঁচালী' শিল্পসপ্তম বর্ষা '৮০

পল গ্রিম 'গভীর মানসিকতা' ঘরোয়া ২৬ মে '৭২

ভিলিস পাওয়েল 'অমল বিন্যাস' " "

আর্চার উইনস্টন 'অপূর্ব ছবি : ভিন্ন-রুচি' " "

এডওয়ার্ড হ্যারিসন 'ওফেলিয়া : দেবী' " "

রবার্ট হকিন্স 'অপুর প্রত্যাখ্যান' " "

প্যাট্রিসিয়া বেকার " " "

পেনিলোপ জিলিয়াট " " "

চার্লস হিগাম 'নির্বাক যুগের দুঃসাহস' " "

জন রালেল 'চিত্রকল্প দিনরাত্রি খোয়াই ও একটি নিঃসঙ্গ তালগাছ' "

—'পথের পাঁচালী' শিল্পসপ্তম ২ বর্ষ '৮০
পেনিলোপ হাউসটোন 'সত্যজিৎ একটি ঐতিহ্য' ঘরোয়া ২৬ মে '৭২
জে লেডা 'সত্যজিতের ছবি' " " "
ফরাসী সমালোচকের চোখে চারুলতা—এক্ষণ ১৫ বর্ষ ৫-৬ সংখ্যা সেপ্টে '৮২
বিদেশী পরিচালকের চোখে সত্যজিৎ রায়ের শিশুচিত্র—চিত্রভাষ অক্টো-ডিসে '৭৯
ডেরেক ম্যালকম 'সত্যজিতের প্রতিদ্বন্দ্বী' আরো ১ বর্ষ ২ সংখ্যা '৭৩
জোসেফান ড্যানিয়েল 'সত্যজিৎ রায়' (সাক্ষাৎকার) চিত্রবীক্ষণ
১২ বর্ষ ৮ সংখ্যা মে '৭৯

পল ভি বেকলি 'অপুর সংসার, সারল্যের প্রতারণা' ঘরোয়া ২৬ মে '৭২
মারি সিটন 'সত্যজিৎ রায়ের অভিযান' 'পথের পাঁচালী' " "
ফিল স্ট্র্যাসবাগ 'চলচ্চিত্রে ভ্রুকুটি : দেবী' " "
ফিলিপ স্ট্রিক 'ছবি করি নিজের খুশিতে' " "
পিটার গ্রেহাম, এরিক শর্টার 'চারুলতা প্রসঙ্গে' " "
জন রোজেলি 'চলচ্চিত্রের কবি' " "
ডগলাস ম্যাকভে 'সত্যজিৎ কি এ্যামেচার' " "
মারি সিটন 'সত্যজিৎকে ছোট করে দেখা' " "
এইচ গ্রে 'সিনেমাটিক' " "
লিণ্ডসে অ্যাণ্ডারসনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার " "
মিকেল সেমেঁৎ 'সত্যজিৎ রায়ের জগৎ' " "

৩) বিবিধ (সম্পাদকীয়, সংবাদ, পঞ্জি, অসাক্ষরিত রচনা ইত্যাদি)

ঘরে বাইরে উপন্যাসের দেশীয় বিচার—চিত্রভাষ ২০ বর্ষ ১-২ সংখ্যা জানু-জুন '৮৫
ঘরে বাইরে দেশী পত্র-পত্রিকায় " " "
ঘরে বাইরে বিদেশী " " " "
ঘরে বাইরে উপন্যাস ও চলচ্চিত্র সম্পর্কে কিছু তথ্য— " "
পরশ পাথর তথ্য ও সমালোচনা—খড়দা সিনে ক্লাব ১ বর্ষ পূর্তি স্মারক '৭৯
পথের পাঁচালী প্রকাশনের ইতিহাস—চিত্রভাষ ১৫ বর্ষ ২-৪ সংখ্যা
এপ্রিল-ডিসে '৮০

পথের পাঁচালী : পরিচয়লিপি— " "
পত্রপত্রিকা সংকলিত—শিল্পসপ্তম বর্ষা '৮০
সত্যজিৎ রায়ের মূল রচনাংশ 'পথের পাঁচালী' চিত্রভাষ ১৫ বর্ষ ২-৪ সংখ্যা
এপ্রিল-ডিসে '৮০

পত্রিকার আলোচনা— „ „ „
সত্যজিতের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি বি. প্রতিবেদন ১৭ জানু '৯২
সত্যজিতের সেরা স্বীকৃতি অস্কার „ „
পথের পাঁচালীর আগে চলচ্চিত্রের প্রতি বঞ্চনার কথা—সিনে টেকনিক '৮৬'৮৭
পথের পাঁচালী ছবির পর বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প নিয়ে অভিনেতা অভিনেত্রীদের

মতামত „ „
পথের পাঁচালী নির্মাণের ইতিকথা „ „
শ্রীমাথুর সত্যজিৎ রায়কে বঞ্চিত করেছিলেন „ „
লণ্ডনের কার্জন থিয়েটারে পথের পাঁচালীর প্রিণ্ট „ „
গোল্ডেন লায়ন অফ সেণ্ট মার্ক সত্যজিৎ রায় অনেক পরে দেখেছেন „
সত্যজিৎ রায়ের মতে সেন্সারের ভাবধারা অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে „ „
পথের পাঁচালীর পরিচয়লিপি—চলচ্চিত্রপত্র এপ্রিল '৮০
„ পুরস্কার তালিকা— „ „
আমাদের নিয়ে কাজ করেছেন : করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, উমা সেন (দাশগুপ্ত), রবি ঘোষ, প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, তপেন চট্টোপাধ্যায় ও কুশল চক্রবর্তী দেশ ৫৯ বর্ষ ২২ সংখ্যা মার্চ '৯২

৪) চিত্রনাট্য পঞ্জি

১। 'প্রতিদ্বন্দ্বী' (চিত্রনাট্যাংশ) চলচ্চিত্র '৭০
২। 'কাপুরুষ' এক্ষণ ৩ বর্ষ ৫-৬ সংখ্যা সেপ্টেম্বর '৬৫
৩। 'শাখাপ্রশাখা' (সূচনাংশ) এক্ষণ ৪ বর্ষ ৫-৬ সংখ্যা „ '৬৬
৪। „ „ ১৯ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা সেপ্টেম্বর '৯১
৫। 'অরণ্যের দিনরাত্রি' এক্ষণ ৭ বর্ষ ৪ সংখ্যা অক্টোবর '৭০
৬। 'অশনি সংকেত' এক্ষণ ১০ বর্ষ ৬ সংখ্যা সেপ্টেম্বর '৭৩
৭। 'সীমাবদ্ধ' (চিত্রনাট্যাংশ) ঘরোয়া মে '৭২
৮। 'জনঅরণ্য' এক্ষণ ১২ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা সেপ্টেম্বর '৭৬
৯। 'Satarang ke Khilari' এক্ষণ ১৩ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা জুন '৭৮
১০। 'জয়বাবা ফেলুনাথ' (অংশ),, প্রসঙ্গ চলচ্চিত্র সেপ্টেম্বর '৭৯
১১। „ „ চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ '৭৯
১২। 'সোনার কেল্লা' „ „ „
১৩। 'টু' (বঙ্গানুবাদ : যাজ্ঞসেনী দত্ত) সিনেমা ভাবনা ফেব্রুয়ারি মার্চ '৮৭

১৪। 'পরশপাথর' বারোমাস ৫ বর্ষ ১-৩ সংখ্যা সেপ্টেম্বর '৮২
১৫। 'S.dgati' এক্ষণ ১৫ বর্ষ ১-৩ সংখ্যা জুন '৮২
১৬। 'সদগতি' টেলিভিশন ৫ বর্ষ ২ সংখ্যা মে '৯২
১৭। 'পিকু' এক্ষণ ১৪ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা সেপ্টেম্বর '৮০
১৮। 'দেবী' এক্ষণ ১৫ বর্ষ ১-২ সংখ্যা „ '৮১
১৯। 'চারুলতা' এক্ষণ ১৫ বর্ষ ৫-৬ সংখ্যা „ '৮২
২০। 'ফটিকচাঁদ' এক্ষণ ১৬ বর্ষ ১-২ সংখ্যা মে '৮৩
২১। 'পথের পাঁচালী' এক্ষণ ১৬ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা সেপ্টেম্বর '৮৩
২২। 'ঘরে বাইরে' এক্ষণ ১৭ বর্ষ ১-২ সংখ্যা জানুয়ারী মার্চ '৮৩'৮৪
২৩। 'অপরাজিত' এক্ষণ ১৬ বর্ষ ৬ সংখ্যা সেপ্টেম্বর '৮৪
২৪। 'হীরক রাজার দেশে' এক্ষণ ১৪ বর্ষ ৫ সংখ্যা জানুয়ারী মার্চ '৮০'৮১
২৫। 'মহানগর' এক্ষণ ১৭ বর্ষ ৬ সংখ্যা সেপ্টেম্বর '৮৬
২৬। 'বাক্সবদল' এক্ষণ ১৮ বর্ষ ১-২ সংখ্যা সেপ্টেম্বর '৮৭
২৭। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' এক্ষণ ১৮ বর্ষ ৩-৫ সংখ্যা সেপ্টেম্বর '৮৮
২৮। 'Pikoo' (English) Cinewave June '81
২৯। 'দেবী' পশ্চিমবঙ্গ ২৬ বর্ষ ৩-৪ ১৭ ও ২৪ জুলাই '৯২
৩০। 'পথের পাঁচালী' (প্রথম চিত্রনাট্য) সংগ্রহ পূর্ণেন্দু পত্রী সকাল সেপ্টেম্বর '৯২
৩১। 'জলসাঘর' এক্ষণ ১৮ বর্ষ ৫-৬ সংখ্যা সেপ্টেম্বর '৮৯
৩২। 'গণশত্রু' এক্ষণ ১৯ বর্ষ ১-২ সংখ্যা „ '৯০
৩৩। 'Nayak' Montage No 5/6 July 66
৩৪। 'স্টুডিও' টেলিভিশন ৫/২ মে '৯২
৩৫। 'জুডি' „ „ „

৫) সত্যজিৎ রায় এর চলচ্চিত্র সম্পর্কিত রচনাপঞ্জি (নির্বাচিত)

'কলকাতায় রেনোয়া' চলচ্চিত্র প্রথম পর্যায় সেপ্টে '৫০
'বাস্তবের পথে চলচ্চিত্র' „ „ „
'অশনি সঙ্কেত প্রসঙ্গে' চিত্রবীক্ষণ ৬ বর্ষ ১১-১২ সংখ্যা আগস্ট-সেপ্টে '৭৩
'পুনার সমাবর্তনে' চলচ্চিন্তা অক্টো-নভে '৭৪
'চলচ্চিত্রের রচনা আঙ্গিক ভাষা' ও ভঙ্গি চলচ্চিত্রের ভাষা „ '৭৯
'ছবিতে গান' চলচ্চিত্র চিন্তা (বাং) এপ্রিল '৮১
'পথের পাঁচালী : নেপথ্য কথা' চলচ্চিত্র পত্র (বাং) এপ্রিল '৮০
'ভারতে সত্যিকারের রাজনৈতিক ছবি করা অসম্ভব' চিত্রকল্প ২৮ জুলাই '৮২

'When I make films' R. C. S. বুলেটিন সেপ্টে '৮২
'চিত্রনাট্য' চিত্রবীক্ষণ ১৭ বর্ষ ১-২ সংখ্যা অক্টো '৮৩
'পথের পাঁচালীর পঁচিশ বছর' চিত্রবীক্ষণ ১৭ বর্ষ ৪ সংখ্যা '৮৪
'দৃষ্টি সৃষ্টি সত্তা' এফ ৪ সেপ্টে '৮৭
'ঘরে বাইরে প্রসঙ্গে' বারোমাস ৬ বর্ষ ২ সংখ্যা মার্চ-এপ্রিল '৮৫
'ছবি ও গান' পরিচয় ৪৬ বর্ষ ১-৩ সংখ্যা অক্টো '৭৬
'চিত্রনাট্য' শিল্পসপ্তম ২ বর্ষ '৮০
'আমার সংগীত চেতনা' চিত্রলোক ৩ সেপ্টে '৮৭
'ছবিতে অভিনয়' চিত্রচিন্তা ১ বর্ষ ২ সংখ্যা এপ্রিল-জুন '৮৮
'পথের পাঁচালী চিত্রনাট্য প্রসঙ্গে' এক্ষণ ১৬ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা সেপ্টে '৮৩
'অপরাজিত „...' „ ১৬ বর্ষ ৬ সংখ্যা সেপ্টে '৮৪
'জলসাঘর পরিচালকের কথা' „ ১৮ বর্ষ ৫-৬ সংখ্যা সেপ্টে '৮৯
'জনফোর্ড সত্যজিৎ রায়' আস্ত আঙ্গিক ডিসেম্বর '৭৪
'গণশত্রু প্রসঙ্গে পরিচালকের কথা' „ ১৯ বর্ষ ১-২ সংখ্যা সেপ্টে '৯০
'মহানগর চিত্রনাট্য প্রসঙ্গে' „ ১৭ বর্ষ ৬ সংখ্যা সেপ্টে '৮৬
'গুপী গাইন বাঘা বাইন প্রসঙ্গে' ১৮ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা সেপ্টে '৮৮
'অলস বেলা' তথ্যকেন্দ্র ১ বর্ষ ১ সংখ্যা মে '৮১

৬) সত্যজিৎ রায় বিশেষ সংখ্যা

Montage Bombay vol 5/6 July '66
কলকাতা ২ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা ২ মে '৭০
সিনে টেকনিক, কলকাতা, ২ মার্চ '৭২
ঘরোয়া, কলকাতা, ২৬ '৭১
মুভি মনতাজ, কলকাতা, ১৭ জনঅরণ্য সংখ্যা এপ্রিল '৭৬
চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ, কলকাতা 'ফেলুদা' সংখ্যা '৭৯
খড়দা সিনে ক্লাব, উ : ২৪পরগণা ১ বর্ষ পূর্তি স্মারক '৭৯
মুভি মনতাজ, ২২ শতরঞ্জ কে খিলাড়ী সংখ্যা ফেব্রুয়ারি '৭৯
বর্ণমালা, ৩ বর্ষ ২ সংখ্যা, সত্যজিৎ রায় সংখ্যা, মে '৭৯
চিত্রভাষ, কলকাতা, ১৫ বর্ষ ২-৪ সংখ্যা পথের পাঁচালী ২৫ বর্ষ পূর্তি এপ্রিল ডিসেম্বর '৮০
বর্ণমালা, কলকাতা ৫ বর্ষ ১ সংখ্যা হীরক রাজার দেশে সংখ্যা এপ্রিল জুন '৮১
প্রসঙ্গ-চলচ্চিত্র, হাওড়া ৪ সংখ্যা অক্টোবর '৮৪
চিত্রধ্বনি, হুগলী, ৬ ঘরে বাইরে সংখ্যা ডিসেম্বর '৮৫

চিত্রভাষ, কলকাতা, ২০ বর্ষ ১-২ সংখ্যা জানুয়ারি-জুন '৮৫
উত্তর, কলকাতা, ৭ ঘরে বাইরে সংখ্যা ডিসেম্বর '৮৫
চিত্রধ্বনি, ৭ সেপ্টেম্বর '৮৫
সিনে টেকনিক, পথের পাঁচালী ৩ বর্ষ সংখ্যা ৮৬-৮৭
নহবত-উত্তর ২৪ পরগণা ২৬ বর্ষ '৮৯
Screen Bombay Vol X L I No 28-20 March '92
বিশেষ প্রতিবেদন, কলকাতা ১৭ জানুয়ারি '৯২
The Illustrated weekly, Vol CXII/12 March 21-27 '92
দেশ, ২ মে '৯২
আনন্দলোক, ৪ মে '৯২
সানন্দা, ৬ বর্ষ ২১ সংখ্যা ১৫ মে '৯২
রক্তকরবী, জুন জুলাই '৯২
প্রসব (নদীয়া) ১৯ এপ্রিল '৯২
Illustrated Calcutta
কোরক সাহিত্য পত্রিকা মে আগস্ট '৯২
চিল্ড্রেন্স ডিটেকটিভ জুন '৯২
উত্তর দেশে (স্যুইডেন) মে '৯২
উত্তরাপথ „ মে '৯২
শঙ্খ (আমেরিকা) মে '৯২
সুসাথী মেদিনীপুর মে '৯২
পদ্মাগঙ্গা কলকাতা ১ বর্ষ ৯ সংখ্যা জুলাই '৯২
শিশুমেলা কলকাতা আগস্ট '৯২
রৈবতক কলকাতা ৫ বর্ষ ৩ সংখ্যা ফেব্রুয়ারি '৯২
আলোকপাত মে '৯২
মনোরমা মে '৯২
সাপ্তাহিক বর্তমান ৪ বর্ষ ৫০ সংখ্যা মে '৯২
ক্রন্দসী উত্তর ২৪ পরগণা ৬/১ এপ্রিল জুন '৯২
তকমিনা মেদিনীপুর ৬/১ মার্চ-এপ্রিল '৯২
আজকের বোধন (বর্ধমান) জুলাই '৯২
শিল্পসপ্তম বর্ষা '৮০
লুক থ্রু (বাংলাদেশ) ১/১ ২০ জুন '৮২

৭) সংযোজন

অমিতাভ ভট্টাচার্য 'চলচ্চিত্রের ভাষা', দ্বান্দিক (ব) ৫ সেপ্টেম্বর '৮৬
অমল রায় 'সত্যজিৎ রায় ও আমাদের থিয়েটার' পদ্মাগঙ্গা (ক) ১/৯ জুলাই '৯২
অশোক কুমার চক্রবর্তী 'পথের পাঁচালি শুধু ভারতে নয়, এ এক আন্তর্জাতিক দলিল'
অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় 'ভাসমান রঙীন মেঘ : কাঞ্চনজঙ্ঘা' পটভূমি (আ) জানুয়ারি মার্চ '৮৪
—'সত্যজিৎ চলচ্চিত্রের আলোচনা আজকের প্রেক্ষাপটে' রক্তকরবী ২/১জুলাই '৯২
অশোক ভট্টাচার্য 'ঘরে বাইরে—রবীন্দ্রনাথ থেকে সত্যজিৎ রায়' এষণা (ব) সেপ্টেম্বর '৮৯
অনিন্দ্য ভুক্ত 'বাংলা সিনেমা ও সত্যজিৎ রায়' আলিঙ্গন (হু)
অনির্বাণ বসু 'মানুষ মানিকদা' সন্দেশ আগষ্ট '৯২
অনিল আচার্য 'সম্পাদকীয়' অনুষ্টুপ ২৬ বর্ষ ৩ সংখ্যা এপ্রিল '৯২
অরবিন্দ পোদ্দার 'সত্যজিৎ রায় একটি অবক্ষয়ের সমীক্ষা' লেখা ও রেখা ১৫ বর্ষ ১ সংখ্যা জুলাই সেপ্টেম্বর '৭০
অনুপ ঘোষাল 'সত্যজিতের সঙ্গীত বিশ্বজনের বিস্ময়' রবিবাসরীয় আজকাল ২৯ মার্চ '৯২
ইরাবান বসুরায় 'বিষয় রাজনৈতিক চলচ্চিত্র' অনুষ্টুপ ১১ বর্ষ ২ সংখ্যা '৭৮
অরুণ দত্তগুপ্ত 'ভারতীয় চলচ্চিত্রে সঙ্গীত' উত্তরসূরী ৯ বর্ষ ২ সংখ্যা জানুয়ারি মার্চ '৬২
অচিন্ত্য রায়চৌধুরী 'সত্যজিৎ স্মরণে' কফিহাউস ৪ বর্ষ ১ সংখ্যা মে '৯২
অরুণ চৌধুরী 'কাপুরুষ মহাপুরুষ এবং অন্যান্য' মহেঞ্জোদাড়ো (হা) ৩ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা নভেম্বর মার্চ '৬৪
অমিতাভ চৌধুরী 'এই হচ্ছেন গুণগ্রাহী সত্যজিৎ রায়' সকাল ১ মে '৯২
অশোক সেন 'মুদ্রণ শিল্পী সত্যজিৎ রায়' ওভারল্যাণ্ড ২৪ এপ্রিল '৯২
অভিজিৎ মুস্তাফী 'ঘরে বাইরে ও নারীমুক্তি' পরমা ৭ বিকৃতি এফ ২ মার্চ '৮৬
অরূপরতন বসু 'বনলতা সেনের প্রচ্ছদ ও সত্যজিৎ রায়' রক্তকরবী ২/১ জুন জুলাই '৯২
অশোক মিত্র 'রসিক মানুষ মানিকদা' সন্দেশ আগস্ট '৯২
অশোক বেরা 'আমাদের মানিক বাবু' সন্দেশ „
অনিরীণা ঘোষ সত্যজিৎ „ „
অনির্বান বসু 'মানুষ মাণিকদা' „ „
অচ্যুত মণ্ডল 'প্রতীকের সত্যজিৎ প্রতিনিয়তের আমরা' প্রতিক্ষণ ৬ বর্ষ ২০ এপ্রিল '৮৯

অসীম কুমার মিত্র 'তূলিকাকে সত্যজিৎ' (হিন্দী) সংকল্প Vol. VI No 1 এপ্রিল জুন '৯২

আশিস বর্মণ 'প্রসঙ্গ সত্যজিৎ রায়' প্রতিক্ষণ ৬ বর্ষ ২০ সংখ্যা এপ্রিল '৮৯

আশিসকুমার মুখোপাধ্যায় 'সন্দেশ সম্পাদক সত্যজিৎ' আননায়ুধ (বা) ৭ বর্ষ ৮ সংখ্যা ১০ মে '৯২

ইন্দিরা আর মুপ্পিল 'অদ্বিতীয় কলাকার এবং সাহিত্যকার' সংকল্প Vol. VI No 1 এপ্রিল জুন '৯২

কল্যাণ সেন 'চলচ্চিত্র বাঙালীপনা সত্যজিৎ ঋত্বিক' চিত্রকথা ৪ বর্ষ ১০-১১ সংখ্যা '৮৩

কিন্নর রায় 'জলতলে মৃন্ময় মুখ' রক্তকরবী ২/১ জুন জুলাই '৯২

কল্যাণী কার্লেকার 'ছেলেমানুষ সত্যজিৎ' সন্দেশ আগস্ট '৯২

গৌরী ধর্মপাল 'গুপী গায়েন' " "

চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'ফেলুদা চলে গেলেন' পদ্মাগঙ্গা ১ বর্ষ ৯ সংখ্যা জুলাই '৯২

চিদানন্দ দাশগুপ্ত 'পথের পাঁচালী' রক্তকরবী ২/১ জুন জুলাই '৯২

জয়দেব বসু 'পঞ্চক না মহাপঞ্চক' প্রতিক্ষণ ৬ বর্ষ ২০ এপ্রিল '৮৯

জীবন সর্দার 'আমাদের সম্পাদক মশাই' সন্দেশ আগস্ট '৯২

জ্যোতির্ময় দত্ত 'সাক্ষাৎকার' রবিবাসরীয় আজকাল ২৯ মার্চ '৯২

তপেন চট্টোপাধ্যায় 'নতুন সন্দেশের প্রথম দিকের কথা' সন্দেশ আগস্ট '৯২

তুষারকান্তি দাস 'তিনি স্রষ্টা' আপনজন ১১ বর্ষ ১ সংখ্যা ৬ মে '৯২

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু 'ফেলুদার স্রষ্টা' চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ ১৫ বর্ষ জুন '৯২

দিলীপ বসু 'আমেরিকায় তৈরী হচ্ছে দুর্ধর্ষ আর্কাইভস' আজকাল ২৯ মার্চ '৯২

দেবপ্রতিম চক্রবর্তী 'সৃষ্টির মধ্যে বেঁচে থাকবেন' শিশুমেলা আগস্ট '৯২

দীপেন রায় 'সম্পাদকীয়' কবিতা সীমান্ত ১৩ মে জুন '৯২

দীপেন্দু চক্রবর্তী 'মহারাজ তোমারে সেলাম' অনুষ্টুপ ২৬ বর্ষ ৩ সংখ্যা এপ্রিল '৯২

দেবাশিস মুখোপাধ্যায় 'প্রসঙ্গ সত্যজিৎ' (গ্র-আ) সিনে সেলুলয়েড ১ বর্ষ ১ সংখ্যা ডিসেম্বর '৮২

—'পল নিউম্যানকে হারিয়ে দিল অপু, হেপবার্ণ' আজকাল ২১ মার্চ '৯২

দিলীপকুমার রায় 'ষাট বছরের বন্ধু' সন্দেশ আগস্ট '৯২

দেবীপদ ভট্টাচার্য 'সত্যজিৎ রায় : মানুষ ও শিল্পী' অনুষ্টুপ ২৮/৩ এপ্রিল '৯২

ধীমান দাশগুপ্ত 'ওই পাঁচদিকে ডাল ছড়িয়েছে তরুবর' মুভি মনতাজ এপ্রিল '৯২

ধীরেশ চৌধুরী 'সত্যজিৎ বীক্ষণ' আপনজন ১১ বর্ষ ১৬ সংখ্যা মে '৯২

নিশীথরঞ্জন রায় 'সত্যজিৎ রায় : একটি নেপথ্য কাহিনী' চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ ১৫ বর্ষ জুন '৯২

নবেন্দু ঘোষ 'সত্যজিৎ রায়' মেঘ ১ বর্ষ ৪ সংখ্যা জুলাই '৯২

নবেন্দু চট্টোপাধ্যায় 'না থাকা শূন্য তার কাছে তবু আহত' বর্তমান ২৪ এপ্রিল '৯২
নীলাক্ষ গুপ্ত 'ডি কে এবং সত্যজিৎ চিত্রশৈলীর এক সমন্বয়' চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ ১৫ বর্ষ জুন '৯২
নলিনী দাস 'উপেন্দ্র-সুকুমার-সত্যজিৎ : এক ধারাবাহিক শিল্পরেখা' চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ ১৫ জুন '৯২
পূষণ গুপ্ত 'শঙ্কু' আজকাল ২৪ এপ্রিল '৯২
পূর্ণেন্দু পত্রী 'যার হাতে বদলেছে প্রচ্ছদ প্রতিকৃতি অলঙ্করণ' " "
প্রলয় চট্টোপাধ্যায় 'শিশু কিশোরের সত্যজিৎ সাহিত্যিক' আপনজন ১১/১ বর্ষ৩ মে '৯২
পিনাকী রঞ্জন গুহ 'কলম ও তুলির সত্যজিৎ' বর্তমান ২৪ এপ্রিল '৯২
পল্লব মিত্র 'অন্য এক সত্যজিৎ' চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ ১৫ বর্ষ জুন '৯২
প্রীতিভূষণ চাকী 'হীরে মাণিক সত্যজিৎ' সন্দেশ আগস্ট '৯২
পরা দে 'পরিচালক সত্যজিৎ রায়' চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ ১৫ বর্ষ জুন '৯২
পূর্ণেন্দু পত্রী 'যার হাতের ছোঁয়ায়' " " "
পরিতোষ সেন 'সত্যজিতের শিল্প ঐতিহ্যের অন্তর্গত' " "
পার্থসারথি সেনগুপ্ত 'সময় ও সত্যজিৎ' প্রতিক্ষণ ৬ বর্ষ ২০ সংখ্যা ১৭ এপ্রিল '৮৯
পার্থপ্রতিম চৌধুরী 'একটি থমথমে দুপুরের নির্জন মলাট (পিকু)' সিনে সেলুলয়েড ২/১-২ জানু মার্চ '৮৪
মুখোপাধ্যায় 'সত্যজিতের কলকাতা প্রসূন সমবেত' নাট্যপ্রয়াস ৫ জুন '৯২
প্রলয় শূর 'হৃদয়ের লেন্স' চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ ১৫ বর্ষ জুন '৯২
—'সত্যজিৎ রায়ের শাখাপ্রশাখা' মুভি মনতাজ এপ্রিল '৯২
পার্থ বসু 'একা এবং একক' আনন্দবাজার পত্রিকা ক্রোড়পত্র মে '৯১
বসুধিতি সরকার 'জটায়ু ছিল রীতিমত রোগা' শিশুমেলা '৯২
বাণী রায় 'শ্রদ্ধা ও স্মরণ' চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ ১৫ বর্ষ জুন '৯২
বিমল কর 'অসামান্য সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্ব' " "
বংশীচন্দ্র গুপ্ত 'সত্যজিৎ রায়ের ছবির শিল্পনির্দেশনা' রক্তকরবী ২/১ জুন জুলাই '৯২
বাসব দাশগুপ্ত 'সত্যজিৎ সময় : কিছু কথা' " " "
মঞ্জুষ দাশগুপ্ত 'কবি সত্যজিৎ' চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ ১৫ বর্ষ জুন '৯২
মৃণাল চক্রবর্তী 'একান্তই ব্যক্তিগত' প্রতিক্ষণ ৬ বর্ষ ২০ সংখ্যা ১৭ এপ্রিল '৮৯
মৃণাল সেন 'কলকাতার চলচ্চিত্র নির্মাতা' অন্যমনে ২ বর্ষ ৩ সংখ্যা অক্টোবর '৭০
—'অপুর অন্তহীন যাত্রাপথ' রক্তকরবী ২/১ জুন জুলাই '৯২
—'অস্কার ও সত্যজিৎ রায়' প্রতিক্ষণ জানুয়ারি '৯২
মৃণাল চট্টোপাধ্যায় 'সত্যজিৎ স্মরণে' প্রগতি ২৬ বর্ষ ১১-১২ সংখ্যা জুন '৯২
মঞ্জিল সেন 'আমাদের মানিকদা' সন্দেশ আগস্ট '৯২

মুকুল চট্টোপাধ্যায় 'কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন' জিরাফ ৪১ মে '৯২
রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 'দেখা দিক একবার' আনন্দবাজার ক্রোড় পত্র মে '৯১
রবিশঙ্কর : 'প্রাণের মানুষ' আজকাল ২৪ এপ্রিল '৯২
রত্না চক্রবর্তী 'আলেকজান্দার সত্যজিৎ রায় ও তার চিত্রকল্প' আপনজন ১১/১ ৬ মে '৯২
রেবন্ত গোস্বামী 'একটি লুকোনো মানিক' সন্দেশ আগস্ট '৯২
রাম হালদার 'সত্যজিৎ কিছুস্মৃতি' অনুষ্টুপ ২৬/৩ এপ্রিল '৯২
রতন ভট্টাচার্য 'সত্যজিৎ' সন্দেশ আগস্ট '৯২
রাণা চট্টোপাধ্যায় 'সত্যজিৎ রায় বিংশশতকের শেষ আন্তর্জাতিক বাঙালী' জিগীষা ৩৩ মে '৯২
রবিশংকর বল 'সত্যজিৎ সম্পর্কে কিছু নাস্তিক ভাবনা' রক্তকরবী ২/১ জুন-জুলাই '৯২
রেবা বন্দ্যোপাধ্যায় 'সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে কিছু নারীচরিত্র' আপনজন ১১/১৬ মে '৯২
লীলা মজুমদার 'সন্দেশের ভবিষ্যৎ' চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ ১৫ বর্ষ জুন '৯২
—'সত্যজিৎ' সন্দেশ আগস্ট '৯২
শশীশেখর রায় 'সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা একটি নির্গঠনিক বিশ্লেষণ' পদাতিক '৮৮
শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় 'সত্যজিৎ রায় পাঠপঠন শিক্ষার মূল্যমান' চিত্রকথা এপ্রিল সেপ্টেম্বর '৯১
—'মুখোমুখি বসিবার সত্যজিৎ রায়' প্রতিক্ষণ ৬ বর্ষ ২০ সংখ্যা এপ্রিল '৮৯
শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় 'শাখা প্রশাখা : নিহিত সমাজ চেতনা' রক্তকরবী ২/১ জুন জুলাই '৯২
শৈবাল চক্রবর্তী 'মানিকদা' সন্দেশ আগস্ট '৯২
শংকর 'সত্যজিৎ এক বিস্ময়' চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ ১৫ বর্ষ জুন '৯২
শ্যাম বেনেগাল 'রায়কে নিয়ে একটি নির্ণায়ক ছবি' (অনু) রক্তকরবী ২/১ জুন-জুলাই '৯২
শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায় 'সত্যজিৎ সন্নিধানে' আপনজন ১১/১ ৬ মে '৯২
শিশিরকুমার মজুমদার 'আপনজনের কথায়' সন্দেশ আগস্ট '৯২
শ্যামলী মহাপাত্র 'সম্পাদকীয়' পদ্মাগঙ্গা ১/৯ জুলাই '৯২
শ্রীদর্শক 'সত্যজিৎ রায়' অক্ষর (আসাম) ২ বর্ষ ২ সংখ্যা এপ্রিল '৯২
শোভন সোম 'চিত্রকর সত্যজিৎ রায়' অনুষ্টুপ ২৬ বর্ষ ৪ সংখ্যা জুন '৯২
শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায় 'সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে মানবতাবাদ' রক্তকরবী ২/১ জুলাই '৯২
শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় 'সত্যজিৎ রায় ও অভিনয়' " " "
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় 'প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎকার' সন্দেশ আগস্ট '৯২

সুধীর চট্টোপাধ্যায় 'সত্যজিৎ রায়' সন্দেশ আগস্ট '৯২
সন্দীপ রায় 'খবরটা প্রথম শুনি নভেম্বরে বাবাকে জানায় নি' আজকাল ২৯ মার্চ '৯২
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় 'মুছে গেল সিঁদুর' " "
সতু ভট্টাচার্য 'সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে দু এক কথা' আপনজন ১১/১ ৬ মে '৯২
সলিল লাহিড়ী 'স্বর্ণহৃদয় সত্যজিৎ' সন্দেশ আগস্ট '৯২
সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় 'সত্যজিতের নায়িকারা' পদ্মাগঙ্গা ১/৯ জুলাই '৯২
সূর্য সেনগুপ্ত 'কাছের সত্যজিৎ দূরের সত্যজিৎ' " "
সমীর কুমার মজুমদার 'চারপুরুষ' মেঘ (ম) ১/৪ জুলাই '৯২
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'পথের পাঁচালী' শিশুমেলা '৯২
—'সত্যজিতের ছবি আজও জীবন্ত' চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ ১৫ বর্ষ জুন '৯২
সোমা চট্টোপাধ্যায় 'আমার সত্যজিৎ রায়' মেঘ ১/৪ জুলাই '৯২
স্বাগতা গুপ্ত 'আমার চোখে ফেলুদাকেই বেশি ভাল লাগে' শিশুমেলা '৯২
সোমেশ চট্টোপাধ্যায় 'আগন্তুক ?' অনুষ্টুপ ২৬ বর্ষ ৪ সংখ্যা জুন '৯২
সেবাব্রত গুপ্ত 'নতুন করে বারবার' আজকাল ২৪ এপ্রিল '৯২
সুষমা দত্ত 'এত মজার সিনেমা আর কে বানাবেন' শিশুমেলা '৯২
সৌগত পুরকায়স্থ 'সত্যজিৎ রায় একটি নির্মোহ বিচার প্রচেষ্টা, আপাতভাবে' অক্ষর ২/২ এপ্রিল '৯২
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় 'ফেলুদা বনাম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়' চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ ১৫ বর্ষ জুন '৯২
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 'শাখা প্রশাখা' " " "
সুব্রত নিয়োগী 'সত্যজিতের ছোটগল্প' " " "
সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'পথের পাঁচালী কিংবা চারুলতা' শ্রেষ্ঠছবি " "
সন্তোষ দত্ত 'জটায়ুর হিমালয় দর্শন' " " "
সমরজিৎ কর 'সত্যজিৎ রায়ের কল্পবিজ্ঞান' " " "
সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায় 'আমি তপসে বলছি' " " "
সুনির্মল বন্দ্যোপাধ্যায় 'নিছক উচ্ছ্বাস নয়' শঙ্খ (আমে) ৭/৩ এপ্রিল '৯২
স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় 'সত্যজিতের সংগীত ও জনঅরণ্য প্রসঙ্গ' লোকভারতী ৩ বর্ষ ১ সংখ্যা জানুয়ারি মার্চ '৭৭
সোমেন ঘোষ 'শাখা প্রশাখা : অবনত জীবনের ছবি' মুভিমনতাজ এপ্রিল '৯২
সতীনাথ দত্ত 'রেনোয়ার দেশে শাখা প্রশাখা' " "
'সম্পাদকীয়' জাগরী ৩৭ বর্ষ জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি '৯২
'সম্পাদকীয়' কৌরব (বি) ৬২ মে '৯২
—প্রতিক্ষণ জানুয়ারি '৮২

সতীনাথ চট্টোপাধ্যায় 'যেতে হয় তাই যাওয়া' ওভারল্যাণ্ড ২৪ এপ্রিল '৯২
'সম্পাদকীয়' বাঙালী সত্যজিৎ বিশ্বজিৎ " "
সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় 'দিন যে হলো অবসান' রক্তকরবী ২/১ জুন জুলাই '৯২
সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'গোড়ার কথা' সন্দেশ আগস্ট '৯২
সুধীর চক্রবর্তী 'সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গীত চিন্তা, একটি দিক' সমবেত নাট্যপ্রয়াস জুন '৯২

—সন্দীপ দত্ত

গ্রন্থভুক্ত লেখকদের সংক্ষিপ্ত-পরিচিতি

অনিল চট্টোপাধ্যায় : প্রখ্যাত অভিনেতা। বিভিন্ন সমাজসেবামূলক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত।

অলোক রায় : ১৯৩৬-এ কলকাতায় জন্ম। বাংলায় এম-এ, পি এইচ ডি. উত্তরবঙ্গ, যাদবপুর ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। ১৯৭৫ সাল থেকে স্কটিশচার্চ কলেজে বাংলার বিভাগীয় প্রধান। যতীন্দ্রমোহন : কবি ও কাব্য, প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ধূর্জটিপ্রসাদ, আলেকজাণ্ডার ডাফ্‌ ও অনুগামী কয়েকজন, বাঙালী কবির কাব্যচিন্তা : উনিশ শতক, কথাসাহিত্য-জিজ্ঞাসা প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। সম্পাদনা করেছেন—Nineteenth Century Studies, Counter Point.

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার : ১৯৩৬-এ কলকাতায় জন্ম। বাংলায় এম.এ, পি.এইচ. ডি। বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা করেছেন এবং কিছুদিন সেখানকার রেজিস্ট্রার ছিলেন। ১৯৮৬-'৮৮তে এশিয়াটিক সোসাইটির গবেষণা-পরিচালক ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক ছিলেন। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। বর্তমানে সেখানকার অধ্যাপক। বাংলা ছন্দের ক্রমবিকাশ, বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব, রবীন্দ্র অন্বেষা, রবীন্দ্রোত্তর কাল, রবীন্দ্র সঙ্গ, এ-মণিহার, সাহিত্যের রূপ-রীতি, নবীনরাজা, করতলে নীলকান্তমণি, রামমোহন রায় : বিচিত্র ব্যক্তিত্ব, রবীন্দ্রনাথ : সৃষ্টির উজ্জ্বল স্রোতে প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। সম্পাদিত গ্রন্থ : বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা ও সীতার বনবাস, তারাশঙ্কর : দেশ কাল সাহিত্য, আত্মকথা, রাতের তারা দিনের রবি।

কিশোর চট্টোপাধ্যায় : ১৯৩৮-এ কলকাতায় জন্ম। ইংরেজীতে অনার্স। বর্তমানে I. T. C.-তে কর্মরত। তাঁর লেখা গ্রন্থসমূহ : Paranoid Dictionary —a spoof on non-verbal communication, Broken Fingers a book of poems, A cartoon strip in Indian Express—Comma—n—Chi.

ক্ষেত্র গুপ্ত : ১৯৩০-এ বরিশালের পিরোজপুরে জন্ম। বাংলায় এম.এ (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম), পি এইচ.ডি, ডি লিট্‌। ১৯৫৪-'৬৫তে চারুচন্দ্র কলেজ ও সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। ১৯৬৫ থেকে রবীন্দ্রভারতীর 'বিদ্যাসাগর' অধ্যাপক। সাত বছর বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন। ১৯৮৬-'৮৭তে U. G. C. কর্তৃক 'National Lecturer' মনোনীত। সমালোচনামূলক ও মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যা

৫৬—সত্যজিতের সাহিত্য, রবীন্দ্রগল্প অন্য রবীন্দ্রনাথ, ছোটোগল্পের সমাজতত্ত্ব ও রবীন্দ্রনাথ, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (১-২ খণ্ড), বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : শিল্পরীতি, সংযোগের সন্ধান—লোকসংস্কৃতি, Structures and variations. Novels of Tagore.—প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

গৌতম ঘোষ : ১৯৫০-এ কলকাতায় জন্ম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। যেসব ছবি পরিচালনা করেছেন : মাভূমি, দখল, পার, এক ঘাট কি কাহানি, অন্তর্জলী যাত্রা, পদ্মা নদীর মাঝি। এবং তথ্যচিত্রগুলির মধ্যে আছে **New Earth, Hungry Autum, Chains of Bondage, Land of Sand dunes, Bismillah Khan. Utpal Dutta, Mohor.**

দীপঙ্কর সেন : ১৯৩২-এ কলকাতায় জন্ম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। প্রিন্টিং-এ ডিপ্লোমা, যাদবপুরের Regional Institute of printing technology-র Composing বিভাগের প্রধান। প্রকাশিত গ্রন্থ : মুদ্রণ পরিচয়, মুদ্রণ শিল্প মুদ্রণ চর্চা এবং য়ুরোপীয় সংগীতের কাহিনী।

দেবীপদ ভট্টাচার্য : ১৯৩১-এ কলকাতায় জন্ম। ইংরাজীতে এম. এ. শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যাপক। আলবেয়ার কামুর 'Le peste' মারী ভোলতেয়ার-এর কাঁদীদ, ও অঁরি বের্গস্ঁ-এর 'Le rire' গ্রন্থ তিনটির বাংলায় অনুবাদ করেছেন।

ধ্রুব গুপ্ত : ১৯৩৬-এ কলকাতায় জন্ম। ইতিহাসে এম.এ. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক। আফ্রিকার গল্প (অনুবাদ), দক্ষিণ আফ্রিকা, পাশ্চম আফ্রিকার ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

নবীনানন্দ সেন : ১৯৫৪-তে খড়দহে জন্ম। অর্থনীতিতে এম. এ.। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস্ ম্যানেজমেণ্ট বিভাগের রীডার।

নলিনী দাশ : ১৯১৬-তে কলকাতায় জন্ম। দর্শনে এম. এ (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম)। বেথুন কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপিকা ও পরে অধ্যাক্ষা ছিলেন। বর্তমানে 'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদক। হাস্য ও রহস্যের গল্প, রঙ্গনগড়ের রহস্য, গোয়েন্দা গণ্ডালু, রানী রূপমতীর রহস্য, অলৌকিক বুদ্ধমূর্তির রহস্য—প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

পল্লব সেনগুপ্ত : ১৯৪০-এ কলকাতায় জন্ম। বাংলায় এম. এ. পি এইচ. ডি। রবীন্দ্রভারতীর অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ : হেনরী ডিরোজিও : কবি ও প্রাবন্ধিক, ডিরোজিও-র কবিতা, ঝড়ের পাখি : কবি ডিরোজিও, বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজী উপন্যাস, উনিশ শতকের ইংরেজী সাহিত্যে বিপ্লবী ভারতের চিত্রকল্প, লোকপুরাণ ও লোকসংস্কৃতি, রেড ইণ্ডিয়ান রূপকথা, পূজা-পার্বণের উৎসকথা। সম্পাদিত গ্রন্থ : বি আংকার রাজা—তরু দত্ত ও শেকসপীয়র চতুঃশত বর্ষপূর্তি স্মারকগ্রন্থ।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় : ১৯৪০-এ নৈহাটির কাঁটালপাড়ায় জন্ম। ইতিহাসে এম.এ। নৈহাটি মহেন্দ্র উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। বর্তমানে নৈহাটির ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক। উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব, বিষ্ণু দে : কালে কালোত্তরে (সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে), সমরেশ বসু : সময়ের চিহ্ন, অন্তর্বয়ন : কথাসাহিত্য, উপন্যাস রাজনৈতিক, চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ত্ব, উপন্যাস রাজনৈতিক : বিভূতিভূষণ—প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

বাদল বসু : বিশিষ্ট প্রকাশনা 'আনন্দ পাবলিশার্সে'র কর্ণধার।

বিজিত ঘোষ : ১৯৬২-তে উত্তর ২৪-পরগণার হিঙ্গলগঞ্জে জন্ম। বাংলায় এম.এ. (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম)। এম-ফিল (প্রথম শ্রেণী)। টাকি সরকারী কলেজে দমদম মতিঝিল স্কুলে, মতিঝিল কমার্সকলেজে ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। বর্তমানে শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যাপক।

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় : ১৯৪২-এ পূর্ববঙ্গে জন্ম। বাংলায় এম এ, পি-এইচ.ডি, ডি লিট। শ্যামাপ্রসাদ কলেজে, কোচবিহার সরকারী কলেজে, চন্দননগর সরকারী কলেজে, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার। প্রকাশিত গ্রন্থ : সাহিত্য-বিবেক, রবীন্দ্র-নন্দনতত্ত্ব, দর্পণে প্রতিবিম্ব, সাহিত্যের মাত্রা : দ্বান্দ্বিক সূত্র এবং সাহিত্য বিচার : তত্ত্ব ও প্রয়োগ।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত : ১৯৪৬-এ পুরুলিয়ার আনারায় জন্ম। অর্থনীতিতে এম-এ, ১৯৬৮-১৯৭৬ পর্যন্ত অধ্যাপনা করেছেন। যে সব ছবি পরিচালনা করেছেন : দূরত্ব, নিম অন্নপূর্ণা, গৃহযুদ্ধ, ফেরা, বাঘবাহাদুর, তাহাদের কথা—প্রভৃতি। প্রকাশিত গ্রন্থ : গভীর এরিয়েলে, কফিন কিংবা স্যুটকেস, হিমযুগ, ছাতাকাহিনী, রোবটের গান, শ্রেষ্ঠ কবিতা এবং আমেরিকা, আমেরিকা।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : ১৯৩৮-এ সিলেটে (শ্রীহট্ট) জন্ম। তুলনামূলক-সাহিত্যে এম-এ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক। সম্পাদিত গ্রন্থ : স্পেনের গৃহযুদ্ধ : পঞ্চাশ বছর পরে, হানস অ্যাণ্ডারসনের জীবনী, জুলভের্ণ অমনিবাস, ভেদ বিভেদ (১ম-২য়), আধুনিক ভারতীয় গল্প (১-৩) ইত্যাদি। অনূদিত গ্রন্থ : আলেহো কার্পেন্তিয়ের-এর রচনা সংগ্রহ, লাতিন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ বিদ্রোহী কবিতার সংগ্রহ, এই স্বপ্ন ! এই গন্তব্য !

মানস মজুমদার : ১৯৪৪-এ বীরভূমের মল্লারপুরে জন্ম। এম-এ-পি-এইচ-ডি। শান্তাময়ী স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত, শান্তিরাণী বসু রায়চৌধুরী, সুরেন্দ্র-নলিনী ও কৃষ্ণকুমার দত্ত রৌপ্যপদক প্রাপ্ত। জঙ্গিপুর কলেজ, স্কটিশ চার্চ কলেজ, চন্দননগর কলেজ, গোয়েঙ্কা কলেজ, অফ কমার্স এ্যাণ্ড বিজনেস্ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও কল্যাণী

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের রীডার। প্রকাশিত গ্রন্থ : নাট্যকার তারাশঙ্কর, অক্ষয়কুমার বড়াল ও বাংলা সাহিত্য, লোক ঐতিহ্যের দর্পণে (প্রথম খণ্ড), বাংলা কাব্য কবিতার কুললক্ষণ।

সন্দীপ সরকার : শিল্পী ও প্রাবন্ধিক।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : ১৯২৬-এ বর্ধমানের বাঘনাপাড়া গ্রামে জন্ম। বাংলায় এম-এ। নৈহাটির ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রিয়প্রসঙ্গ, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, কবিতার কালান্তর, আলো আঁধারের সেতু : রবীন্দ্র চিত্রকল্প, উত্তর প্রসঙ্গ, প্রসঙ্গ অনুষঙ্গ, চিড়িতন রুইতন এবং উপন্যাস : বিকিকিনির হাট, তিন তাসের খেলা, কুয়াশার রঙ, নীলরাখী ও গোলাপ হয়ে উঠবে।

সুধীর মৈত্র : ১৯৩১-এ কলকাতায় জন্ম। ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের স্নাতক। ঐ কলেজেই অধ্যাপনা করেছেন কয়েকবছর। ১৯৬১-তে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় ইলাশট্রেটর ও ফিগার আর্টিস্ট হিসেবে আর্ট অ্যাণ্ড পাবলিসিটি বিভাগে যোগদান। পরে ঐ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হয়ে অবসর গ্রহণ। এছাড়া আনন্দবাজার ও দেশ পত্রিকায় 'সিনিয়র' ইলাশট্রেটর হিসেবে কাজ করেছেন প্রায় চল্লিশ বছর। তাঁর আঁকা বহু বিখ্যাত বই-এর অসাধারণ প্রচ্ছদপট ও অলঙ্করণ এখনও পাঠকদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। রমাপদ চৌধুরীর সঙ্গে ছড়ার বই ভূতগুলো সব গেল কোথায়-এ তাঁর কাজ এক অনন্য সৃষ্টি।

সুভাষ চৌধুরী : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় : ১৯৩৫-এ কৃষ্ণনগরে জন্ম। বাংলা অনার্স পাশ করে এম.এ পড়াকালীন আকাশবাণীতে ঘোষকের চাকরী। প্রখ্যাত অভিনেতা, নাট্যকার ও নাট্য-পরিচালকই কেবল নন, নিয়মিত কাব্যচর্চাও করে থাকেন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : জল প্রপাতের ধারে দাঁড়াবো বলে, ব্যক্তিগত নক্ষত্রমালা, শব্দরা আমার বাগানে, পড়ে আছে চন্দনের চিতা এবং হায় চিরজল।

স্বরাজ সেনগুপ্ত : ১৯৩০-এ বরিশালে জন্ম। এম-এ-পি-এইচ-ডি, ডি, লিট। জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎ সিং কলেজে, দুর্গাপুর সরকারি কলেজে, চন্দননগর সরকারি কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। বর্তমানে প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ : বাংলা সাহিত্য, মানবতন্ত্রী দৃষ্টি, মডারন্ সাইন্স, ম্যান এণ্ড হিজ ইমাজিনেশন, সক্রেটিসের বিষপান, ময়নারমন ও স্বপ্নগন্ধ নামের তিনটি একাঙ্ক।